কালের যাত্রার ধ্বনি

অনিলা দেবী

রাজা পাবলিকেশনস্
পুস্তক প্রকাশক
১০ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

কলকাতা শহর, উনিশ শো আটচল্লিশ সাল। বিলম্বিত বসন্ত।

এক যুগ বাদে হঠাৎ নলিনাক্ষের সঙ্গে দেখা। ছুটির দিন বলেই আজ সকালে কলেজ স্ট্রীটে কাপড়ের দোকানে শাড়ী কিনতে ঢুকেছিল ললিতা। নলিনাক্ষও এসেছিল শাড়ী কিনতে—ওর বউয়ের জন্য নিশ্চয়ই। বিয়ে করেছে অনেক দিন আগেই। খবরটা জানলেও কোনো যোগাযোগ ছিল না ওর সঙ্গে। ও-ও রাখে নি।

ললিতাকে দেখে কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো নলিনাক্ষ—আরে তুমি ?—

কেনাকাটা তখন সারা হয়ে গেছে। ললিতাকে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেল নলিনাক্ষ। দু'জনে গাড়ীতে এসে বসলো। আশ্চর্য ব্যাপার, গাড়ীও কিনে ফেলেছে নলিনাক্ষ এর মধ্যে ! অবস্থাটা এমন তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে ফেললো কি করে ?

অবস্থা খারাপ ছিল বলেই না ললিতার বাবা—। আই. এ. পাস করে আপিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি করছিল নলিনাক্ষ। চাকরি না করে ওর উপায় ছিল না। ঘরে বিধবা মা, ছোট ছোট তিন-চারটে ভাই-বোন—সব দায়িত্বই তো ছিল ওর ঘাড়ে।···অবস্থা ভূপেশেরও ভালো ছিল না। কিন্তু পেটে বিদ্যে ছিল। ঐ বিদ্যে দেখেই তো—।

নলিনাক্ষ নিজেই ড্রাইভ্ করছিল। ওর পাশের সীটেই ললিতা। গাড়ী ড্রাইভ্ করতে করতেই নলিনাক্ষ বললে—আমার সমস্ত উন্নতির মূলে কিন্তু তুমি—

ললিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।—কি রকম ?

—তুমি প্রত্যাখ্যান করলে বলেই না এমন জেদ চাপলো—বড়লোক হতেই হবে, যে করেই হ'ক—হয়েও গেলাম। লাগসই অমন একটা

ব্যবসার হদিস পেয়ে গেলাম বলেই তো···। নলিনাক্ষ বাহাত্বরীর হাসি হাসল। একটু থেমে বললো—মানুষের জীবনটাই একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট্—কোন কিছুরই স্থিরতা নেই এ যুগে।

নলিনাক্ষও শেষ পর্যন্ত দার্শনিক হয়ে উঠল। ললিতা নিজের মনে হাসলো—কোন কথা বললো না।

নলিনাক্ষই আবার কথা পাড়লো। বললে—ছেলেমেয়ে কটি?

—দু'টি।

—মাত্র?···ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তো।

ললিতার রাগ ধরে গেল কথার ধরন দেখে।

হুস্ করে গাড়ীটা এসে থামলো বাড়ীর দোরগোড়ায়। নলিনাক্ষের বাড়ী!

ভেতরে ঢুকে অবাক বউ-এর চেহারা দেখে! এমন সুন্দরী বউ ও জোটালো কোত্থেকে? তবে একেবারেই স্মার্ট্ নয়, সেকেলে মেয়েদের মতই লাজুক। ঘোমটা টানার রেওয়াজটা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে। দু'চার কথার পরেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল—চায়ের জোগাড় করতে নিঃসন্দেহ।

ললিতাকে একলা পেয়ে নলিনাক্ষ ফিস্ ফিস্ করে বললে—দেখলে তো? একেবারে গোবেচারা—সাতচড়ে রা করে না। গরীবের মেয়ে, ও আমাকে কখনো ঠকাবে না।···বছর বছর ছেলে বিয়োতেও আপত্তি নেই।

কি গুণের কথা!···বছর বছর আজকাল কোনো মেয়ে ছেলে বিয়োতে রাজী হয়? দায়ে না পড়লে কোনো মেয়েই হয় না। কিছু হয়ে বসলে ডাক্তারের সাহায্য নিলেই তো চুকে যায়।···ললিতা একবার নিয়েছিল বই কি! ভূপেশকে না জানিয়েই ডাক্তারের কাছে চলে গেছল, মাত্র মাস দুয়েকের ব্যাপার। ভূপেশ তখনও ঠিক আন্দাজ করতে পারে নি। পরে অবশ্য টের পেয়ে গেছল—।

চা-খাবার নিয়ে নলিনাক্ষের বউ ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে চারচারটে

বাচ্চা নতুন লোক দেখে ছুটে এসেছে নলিনাক্ষের সন্তান, নলিনাক্ষই পরিচয় দিলো। চার ছেলের মা—বউকে দেখলে বোঝাই যায় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ললিতা তাকিয়ে থাকে বউটির দিকে। গর্ভবতী আবার! অথচ দিব্যি হাসি-খুশি!

—চা-যে জল হয়ে গেল।—ললিতাকে লক্ষ্য করে নলিনাক্ষ বলে উঠলো।

ললিতা চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল। খাবার স্পর্শও করল না। বললে—এসব কেন?···আমি খুব বাঁধা-ধরা নিয়মে থাকি।—ভদ্রতার খাতিরে তু'এক চুমুক চা খেয়েই উঠে পড়ল। বললে—আর দেরী করা চলবে না—বাড়ীতে চিন্তা করবেন।

চিন্তা কেউ করবে না, একথা ললিতা জানে ভালো করেই, তবু বলতে হল কথাটা।

নলিনাক্ষও আর আপত্তি করলে না। ওকে নিয়ে গাড়ীতে এসে উঠলো।

আসার আগে বউটি খুশির মুখ করে বললে—আর একদিন আসবেন কিন্তু।

আসতে বয়ে গেছে ললিতার। বন্ধুত্ব করার আর লোক নেই ওর।

গাড়ীতে অবশ্য নলিনাক্ষের পাশেই বসতে হল। ভদ্রতা বলে তো একটা কথা আছে।

ললিতা চুপ করেই ছিল।

নলিনাক্ষ বললে—কেমন লাগলো বউকে?

—ভালো।···দেখতে খুবই তো সুন্দর।

কথাটা কি বিশ্বাস করলে না নলিনাক্ষ? ঘাড় ফিরিয়ে ললিতার মুখটা একবার দেখে নিয়ে বললে—তোমার চেয়ে নয় নিশ্চয়ই।

ললিতার রাগ হয়ে গেল। এসব কথার অর্থ? সুন্দরী বউ নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসার করছো—

—কি যে ভালো লাগছে।—নলিনাক্ষ বললে ললিতার দিকে

চেয়ে। তোমাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি।

—প্রখর স্মরণশক্তি!

—ঠাট্টা করছো?

—তাছাড়া কি করতে পারি বল?…এতকাল বাদে পুরানো ভালোবাসার কথা তুলে কাঁদতে বসবো?

নলিনাক্ষের কি অভিমান হল? বললে—তুমি কোনদিনই আমাকে ভালোবাসতে না।…তা না হলে এমন করে ভুলে যেতে পারে কেউ?

—ভুলে সবাই যায়—তুমিও কি যাও নি?

নলিনাক্ষ চুপ করে গেল—আর কথা বললো না। একহাতে ষ্টীয়ারিং অন্য হাতটা ললিতার হাতের উপর রাখলো নলিনাক্ষ।

ললিতা সরিয়ে নিলো না হাতটা। সত্যি কথা বলতে কি, ভালোই লাগলো স্পর্শটুকু—অনেককালের চেনা একখানি মুখ দেখলে যেমন ভালো লাগে মানুষের!

বাড়ীর দোরগোড়ায় ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা কেমন বিরূপ হয়ে উঠলো ওর উপর। না, সাহসটা বড় বেড়ে উঠেছে ওর। দুটো পয়সা হয়েছে বলেই কি—? জাল-জুয়াচুরি করে টাকা করেছে, তার আবার এত গর্ব!

চৈত্রের রাত। বসন্তের আকাশেও এত মেঘ জমা হয়ে ছিলো! চাপ চাপ ভূসা মেঘ। বাতাসে আর্দ্রতা থাকলেও বৃষ্টি নেই। জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে।

ভূপেশের চোখে তবু ঘুম নেই। মেজাজটাই বিগড়ে আছে। কাছে আসা দূরে থাক, শুতে এসে ললিতা আজ একটি কথা পর্যন্ত বলেনি ওর সঙ্গে!…ছেলে-মেয়ে বড় হবার পর থেকেই অবশ্য ও আগের মতো আর কাছে আসতে চায় না। কোন রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেই শাসন করে। বলে—আজ বাদে কাল ছেলে-মেয়ের বিয়ে হবে—

হ্যাঁ, ছেলে-মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে বইকি! সমীর আর মানসী—পিঠাপিঠি ভাই-বোন। বাড়ন্ত গড়ন দু'টিরই—স্বাস্থ্য ভালো হলে যা হয়। অল্প বয়সের সন্তান, স্বাস্থ্য ভালো তো হবেই।···কিন্তু ওরা তো আর বাপ-মায়ের ঘরে শুতে আসছে না! আলাদা ঘরেই শোয়। তবে এতো সঙ্কোচ কিসের?···ছেলে-মেয়ে বড় হয়েছে বলে কি নিজেদের জীবন বরবাদ করে দিতে হবে?···আসল কথা, ভূপেশের কাছে আসতে ভয় পায় সে। আবার যদি কিছু হয়ে টয়ে বসে!

রাত বারটা বাজলেও ভূপেশ ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়নি। দেয়নি ইচ্ছে করেই। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বই পড়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু চেষ্টা করেও কি বইয়ে মন বসাতে পেরেছে সে? পারেনি। দৃষ্টিটা বার বার গিয়ে আছড়ে পড়ছে ঐ মেহগনি খাটখানির উপর—পুরু গদির ধবধবে বিছানায় ললিতা যেখানে পিছন ফিরে শুয়ে আছে। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে এতক্ষণে। সুন্দরী না হলেও আটসাঁট দোহারা গড়নের এই মেয়েটির স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য আছে—বুক, নিতম্ব, উরু—সবকিছু ওর উদ্ধত স্বাস্থ্য-যৌবনের সাক্ষ্য দেয়।···

কিন্তু নারীর স্বভাবসুলভ কোমলতা কোথায় ওর চরিত্রে?···সান্ত্বনার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায় ভূপেশের। না, সান্ত্বনার সঙ্গে ওর কোন তুলনাই হয় না। কোন দিক্ থেকেই না—না চেহারায়, না স্বভাবে। যেমন মিষ্টি দেখতে, স্বভাবটিও সান্ত্বনার ছিল তেমনি।···বৌদি তো একরকম পাকা কথাই দিয়েছিলেন সান্ত্বনার মাকে—ভূপেশের চাকরির ব্যবস্থা হলেই দুই হাত—

দুই হাত আর এক হল কি করে? হল না ভূপেশের জন্যই। ললিতার বাবার প্রস্তাবে হঠাৎ সে রাজি হয়ে গেল।

হয়েছে অনেক কিছু চিন্তা করেই। এম. এ. পাস করলেও চাকরি জুটছিল না। ভিখিরীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল আপিসের দরজায় দরজায়। আর ঠিক সেই সময়েই রমেনের বাবা—ভূপেশের সহপাঠী

রমেন—ঐ প্রস্তাবটি করে বসলেন। বিশ হাজার টাকার চেক ব্যবসা করার জন্য, ল' পড়ার খরচ—এত বড় প্রলোভন জয় করা কি সহজ কথা? তা-ও ওদের মত গরীব লোকের পক্ষে।…

হ্যাঁ, ললিতার বাবা সাহায্য করেছিলেন বলেই না ভূপেশ আজ হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। ললিতা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সারা শরীরটা কেঁপে উঠলো নিঃশ্বাসের সঙ্গে। জেগে আছে নাকি? রাগ এখনও পড়লো না! ভূপেশের উপর ভীষণ চটে আছে। অপরাধ? ভূপেশ ওর কাজের কেন সমালোচনা করলো?

না করে থাকতে পারেনি। বিধবা মানুষ, পূর্ববঙ্গ থেকে ছেলের হাত ধরে আজ ওদের আশ্রয়ে এসে উঠেছেন। এসেছেন বাধ্য হয়েই। ওখানে থাকার আর উপায় থাকলে তো।…ইচ্ছে হলে কত আগেই চলে আসতে পারতেন। ভূপেশ কি আপত্তি করতে পারতো কখনো?

পারতো না। বলতে গেলে ওই বৌদির কাছেই তো সে মানুষ। পাঁচ বছর বয়সেই বাপ-মা হারিয়েছে ভূপেশ। বৌদির আর ছিলই বা কে?—একমাত্র মেয়ে গৌরী ছাড়া। অনুপ তো ওঁর শেষ বয়সের সন্তান।…বৌদিই মায়ের অভাব পূর্ণ করেছিলেন ভূপেশের। আর দাদা? তিনি কি না করেছেন ওর জন্য! খুলনা জেলার নয়ানগঞ্জ গ্রামের সামান্য স্কুল মাস্টার হয়েও ভূপেশকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়েছেন। অনেক কষ্ট করেই পড়িয়েছেন।…ওঁরা না থাকলে ভূপেশ আজ থাকতো কোথায়!

ললিতার কি উচিত হয়েছে বৌদিকে একতলায় পাঠিয়ে দেওয়া? দোতলায় যখন আরো বাড়তি একটা ঘর রয়েছে। সেখানেই অনায়াসে থাকার ব্যবস্থা করা যেত। নীচের ঘরগুলো তো অন্ধকূপের সামিল।

ভূপেশ চুপ করে থাকতে পারেনি—অন্যায় দেখলে সে চুপ করে থাকতে পারে না। ললিতার কাজের প্রতিবাদ করতে গেছলো—বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটি হয়েছে। সেই থেকেই ললিতা মুখ গোমরা করে আছে—শুতে এসেও কথা বলেনি।

ভূপেশও চুপ করে ছিলো—ইচ্ছে করেই রাগ ভাঙাতে যায়নি। দেখা যাক, কতক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে।

রাগ কি শুধু শুধু হয় কারো? সামান্য একটা ব্যাপার, তাই নিয়ে এত কথা! তিলকে তাল করা ভূপেশের চিরকালের স্বভাব। দোতলায় কেন ওঁর বৌদির থাকার ব্যবস্থা করা হয়নি। একতলার ঘরে থাকলে যেন মানুষের মান যায়! কিন্তু একতলার ঐ ঘরটা যে উপরের ঘরের চেয়ে অনেক বড় সেটা একবার ভেবেও দেখলো না। মা-ছেলে দিব্যি গা মেলে থাকতে পারবে। তাছাড়া চিরকাল ওঁদের একতলাতে থাকাই তো অভ্যাস।···দিদির সুবিধে হবে মনে করেই না ললিতা—

ভূপেশের সেকি রাগ এজন্যে! ভুরু কুঁচকে বললে—তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—বৌদিকে নীচেয় পাঠিয়ে দিলে!···ললিতা যেন সাংঘাতিক একটা কিছু করে ফেলেছে।

কথাটা শুনে ললিতারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। রাগের মাথায় বলে ফেললো—কাণ্ডজ্ঞান তোমারই নেই—আমাদের পাশের ঘরে থাকতে ওঁর অসুবিধেই হত।

—বৌদির অসুবিধে হত!···আমাদের পাশের ঘরে থাকতে?—ভূপেশ যেন বিশ্বাস করতেই পারলো না। নিজের মনে কি যেন ভাবলো খানিক। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো—না, অসুবিধা ওঁর হত না, হত তোমার।

ললিতারও জেদ চেপে গেল। বললে—হ্যাঁ, হতই তো, আমার ভীষণ অসুবিধে হত উনি উপরে থাকলে—

বলেই বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। কি দরকার আর কথা বাড়িয়ে!

রাত্রে শুতে এসেও কথা বলেনি ভূপেশের সঙ্গে। এতই যদি দরদ বৌদির জন্যে, ভালো বাড়ী নিলেই তো পারে। বালিগঞ্জে নতুন প্যাটার্নের কি সুন্দর সব বাড়ী উঠেছে। তা নেবে না, গোয়ালটুলী রোডে মান্ধাতার আমলের সেই পুরানো বাড়ীতেই পড়ে থাকবে।

অনেক কালের ভাড়াটে। বাড়ীর তুলনায় ভাড়াটা তাই সস্তা বইকি ! টাকাটা খুবই চিনেছে ভূপেশ।...ললিতাকে বিয়ে করেছিল, সে-ও ঐ টাকার জন্যে—ললিতার প্রেমে পড়ে নয়। বাবা বিয়ের প্রস্তাব করলে ওদের বাড়ী আসাই তো বন্ধ করে দিয়েছিল। রমেনদা গিয়ে তবে না ধরে নিয়ে এলেন।...ললিতাকে সে তো পাশ কাটিয়েই চলতো বরাবর। সব কথাই মনে আছে ললিতার। কতদিনের ঘটনা, তা-ও স্পষ্ট মনে আছে।...

বিকেলবেলায় সেদিন বাড়ীতে ওকে একলা দেখে দস্তুরমতো ঘাবড়ে গিয়েছিল ভূপেশ।...পিসতুতো বোনের বিয়েতে সবাই নেমন্তন্ন খেতে গেছেন। ললিতারও যাবার কথা। কিন্তু যায়নি, শরীর তেমন সুস্থ ছিল না।

দোতলায় খাটে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিল। এমন সময়ে ভূপেশ এল। দাদা বাড়ীতে নেই শুনেই চলে যাচ্ছিল, ললিতা গিয়ে বাধা দিলো—এসেই চলে যাচ্ছেন ?...চা খেয়ে যান—

পরের ঘটনাটা মনে হলে এখনও হাসি পায় ললিতার। বেটা-ছেলে যে এমন ভীতু হয় —ললিতাকে একরকম ঠেলেই সরিয়ে দিলে ! —কি করছো, কেউ এসে পড়বে।......

বিয়ের পরেই অন্য মানুষ। একটি দিনের তরে বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকার উপায় ছিল না। দিনে থাকলেও রাত্রে তো নয়ই।... বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সমীর পেটে এল। ললিতা, আই.এ. পড়ছিল তখন. পড়াশুনার ঐখানেই ইতি। লেডি ডাক্তারের মুখে কথাটা শুনে সে তো প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল। ওর ছোটবৌদিও এজন্য কত দুঃখ করেছেন—আহা, মেয়েটা একটু সাধ-আহ্লাদ করার সময় পেল না, বিয়ে হতে না হতেই—

ভূপেশ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো কথাগুলো। বলেছিল—ছেলে অল্প বয়সে হওয়াই তো ভালো—স্বামী-ছেলে দু'জনার রোজগার খেতে পারবে একসঙ্গে।

কিন্তু ছেলে না হয়ে মেয়েও তো হতে পারতো !···ছেলে হয়েছে অবশ্য ছেলের মতই। যেমন স্বাস্থ্য, তেমন চেহারা—দেখলে কে বলবে যে ওর বয়স আঠারো বছর ! বেতের মতন সোজা, পাঁচ ফুটের উপর লম্বা। চোখা নাক, ঝকঝকে দুটো টানা চোখ—চওড়া ব্যাকব্রাস-করা একমাথা চুল, উজ্জ্বল মসৃণ ভুরু।

দারুণ স্মার্ট ছেলে। ট্রাউজার আর বুসসার্ট পরে ও যখন বেড়াতে বের হয়, রঙটা ফর্সা হলে সবাই ওকে সাহেবের বাচ্চা বলেই ভুল করতো।···ইংরাজী উচ্চারণ ওর সাহেবের মতই। ডিবেট করতেও ওস্তাদ। বি, এ, এম, এ, পাস করা ছেলেরা ওর সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠে না। দোষের মধ্যে শুধু পড়াশোনায় মন নেই। খেলাধূলার দিকেই ঝোঁক বেশি। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মোটেই ভালো করতে পারেনি। কোন রকমে পাস করেছে।

মানসী এদিক থেকে অনেক ভালো। পড়াশুনার জন্যে বলতে হয় না ওকে। সামনের বছরেই পরীক্ষা দেবে। যোল বছর বয়সেই রূপ-লাবণ্য যেন ফেটে পড়ছে মেয়ের। টকটকে ফর্সা রঙ, নিটোল স্বাস্থ্য। নাক, চোখ সমীরের মতো টানা না হলেও মুখখানি ভারী মিষ্টি। ফোলা ফোলা গাল দুটি রুজ না মেখেই গোলাপী। কানের পাশে কালো কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ ওর মুখখানাকে আরো সুন্দর করে তুলেছে।···মাথায় এরই মধ্যে মানসী তার মাকে ছাড়িয়ে গেছে।···

ঘরের আলোটা হঠাৎ নিবে গেল। ভূপেশই নিবিয়ে দিয়েছে।

ঘুমের ভান করে ললিতা কাঠ হয়ে রইল। ভূপেশ এসে ওর গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লো। শুধু শোয়া নয়, ললিতাকে জোর করেই—

আপত্তি-বাধা গ্রাহ্যই করলে না ! বিয়ে-করা বউ, কাছে আসবে না, এ-কি একটা কথা হল ?—ভাবটা এই রকম। ইচ্ছে না থাকলেও সব সহ্য করতে হবে। মন বলে মেয়েদের যেন কোনো পদার্থ নেই।

মন আছে বইকি! আবালবৃদ্ধবনিতা—সবারই মন আছে। দেশের মাটির সঙ্গে মনের সরসতাটুকু রমলা নয়ানগঞ্জে ফেলে এসেছে। চলে আসার সত্যিই ইচ্ছে ছিল না ওর। কিন্তু না এসে উপায় কি? পাড়ার সবাই চলে এলেন, একলা থাকতে আর ভরসা পেল না। অনুপ তো অনেক আগেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল চলে আসার জন্যে। রমলাই রাজী হয় নি।

মায়ের উপর চটে গেছল অনুপ। বলেছে—যেতে চাইছ না কেন? এখানে তোমার কে আছে শুনি?—

কেউ নেই। মা, বাবা, স্বামী—সবাই তো চোখ বুজেছেন। অন্য আত্মীয়স্বজন যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও একে একে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিয়েছেন।

তবে কিসের মায়ায় পড়েছিলো রমলা? মানুষের, নয় পরিবেশের। মানুষের মায়া কাটলেও পরিবেশের মায়া কাটতে চায় না।······বাড়ির পূব কোণে সেই যে পানা পুকুরটা, তার সবুজ জলের মায়া কাটানো কি সহজ কথা! পুকুর-পাড়ের ঝোপঝাড়, বুনো ঘাস, শালিক, চড়ুই,—ফিঙে—এদের সবার সঙ্গে রমলা যেন এক নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিল।···

নিস্তব্ধ দুপুরে রান্নাঘরের চালার উপর বসে কাক ডাকতো—উদাস গম্ভীর সুরে। দূর থেকে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসতো বাতাসে। আম গাছের ছায়ায় একখানি মোড়ার উপর বসে থাকতো রমলা—স্কুল-বাড়ির দিকে তাকিয়ে। অনুপের স্কুল, ঐ স্কুলেই সারা জীবন মাস্টারী করেছেন রমলার স্বামী।···

দৃষ্টিটা হঠাৎ কেমন ঝাপসা হয়ে আসে রমলার। পোড়া চোখের যে কি হয়েছে, খামকা জল এসে পড়ে।

হাতের চেটোয় রমলা চোখের জল মুছে ফেললো তাড়াতাড়ি—হঠাৎ যদি কেউ এসে দেখে ফেলে!

দেখার অবশ্য কেউ নেই এখন। দুপুরবেলা। ভূপেশ কোর্টে।

ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে। হ্যাঁ, অনুপকেও ভূপেশ কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে—বি, এ, পড়ছে।

ললিতা অবশ্য বাড়িতেই আছে। ঘুমোচ্ছে? না, এতক্ষণে ঠিক উঠে পড়ছে। খাওয়া দাওয়ার পর একটু গড়াগড়ি দিয়েই সে উঠে পড়ে। ইচ্ছে করলেই এখন রমলার কাছে এসে সে বসতে পারে দু'দণ্ড—ভালো-মন্দ দুটো কথাও কইতে পারে। তা মন চাইলে তো কইবে! একলা ঐ ভাবে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উল বুনতে ভালোও লাগে মানুষের!

রমলারও কি ভালো লাগে একলা বসে বসে কাঁথা সেলাই করতে? কিন্তু একটা কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। বাড়ীর সামনে-পিছনে ইটের গাঁথনি দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। নয়ানগঞ্জের নিঃসীম মাঠটা চোখের উপর ভেসে ওঠে।...রমলাদের বাড়ীর দক্ষিণেই ছিল ঐ মাঠ। বর্ষাকালে জল থই থই করতো। ডিঙা নিয়ে মাছ ধরতে যেত গ্রামের ছেলে-ছোকরার দল—খালুই ভর্তি মাছ নিয়ে ফিরতো।...বাড়ীর সামনে রাস্তার ওপারে আকাশ-ছোঁয়া সেই বুড়ো বটগাছটাকে কিছুতেই ভুলতে পারে না রমলা। ওর দাদা-শ্বশুরের আমল থেকে নাকি গাছটা অমনি ডাল-পালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরানো দিনের সাক্ষী। আরো কত কালের সাক্ষ্য বহন করবে কে জানে!

নয়ানগঞ্জে রমলাদের বাড়ীর পরিধিও এমন ছোট ছিল না।...শুধু ঘর-বাড়ীর নয়, মনের পরিধিও এখানকার লোকের বড় সঙ্কীর্ণ। শহরেরই বিশেষত্ব হয়ত এটা।...মানুষ এখানে চোখের সামনে উন্মুক্ত আকাশ দেখতে পায় না যে।

নিজেকে নিয়েই এখানে ব্যস্ত সবাই। অসাধারণ কর্মব্যস্ততা। এই ব্যস্ততার মধ্যে অন্যের দিকে ফিরে তাকাবার মানুষের সময় কোথায়!...

দোর গোড়ায় পায়ের আওয়াজ। চিন্তায় বাধা পড়লো রমলার।
—ও, আসুন।

মানিকের মা এসে ঘরে ঢুকলেন। রমলাদের পাশের বাড়িতেই থাকেন মহিলাটি। অল্পদিন হল আলাপ হয়েছে।

বলার আগেই রমলার পাশে তক্তপোশের উপর বসে পড়লেন তিনি।—কাঁথা সেলাই করছেন!······কার জন্যে?—মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

—বিশেষ কারো জন্যে নয়—দরকার মত সবাই গায়ে দিতে পারবে।

—কাঁথা সেলাই করতে ভালো লাগে?

—একটা কাজ নিয়ে থাকলে মন ভালো থাকে।

রমলার মুখের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে কি যেন ভাবলেন মহিলাটি। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—এখানে এসে আপনার মন টিকছে না, না?

রমলা চুপ করে রইল। কি উত্তর দেবে ভাবছিল। আগের কথার জের টেনে মহিলা আবার বলে উঠলেন—আপনার মুখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

বিরক্ত হলেও রমলা চুপ করে ছিলো, মহিলা সেদিকে লক্ষ্যও করলেন না। নিজের মনে বলে চললেন—সত্যি দিদি, এসব আমাদের চোখে ভালো লাগে না। কি বেশ করে আপনার ছেলে ঘুরে বেড়ায়—একটা মাত্র তো ভাইপো—দুটো জামাও কি করে দিতে পারেন না ওঁরা?

গ্রামে বাস করলেও এসব গ্রাম্য আলোচনা কোনদিনও ভালো লাগে না রমলার। অনুপের বাবাও এ ধরনের কথাবার্তা শুনলে চটে যেতেন। তাছাড়া, ঘরের কথা নিয়ে অন্যের সঙ্গে সে আলোচনাই বা করতে যাবে কেন?

বিরক্তিটা রমলা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করেই ফেললো। ভুরু কুঁচকে বললে—দরকার হলে নিশ্চয়ই দেবে।

মুখে কিছু না বললেও মনে মনে নিশ্চয় চটে গেছলেন মহিলা। তা না হলে অত তাড়াতাড়ি উঠে চলে যাবেন কেন? গেলেন অবশ্য কাজের ছুঁতো করেই।

রমলাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

পরের দিন সকাল বেলায় গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ী ফিরেই আবার মাণিকের মায়ের সঙ্গে দেখা। রমলার ঘরের সামনে বারান্দায় বসে ললিতার সঙ্গে গল্প করছিলেন।

রমলাকে দেখে অমন থমমত খেয়ে গেলেন কেন? কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই। সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—গঙ্গায় নেয়ে এলেন বুঝি?

আন্তরিকতার অভিনয় করলেও কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা প্রকাশ পেল না।

ললিতা অভিনয় করতে জানে না। মুখখানা তার থমথমে হয়ে ছিলো। কথা বলা দূরে থাক, রমলার দিকে সে তাকিয়েও দেখলো না। ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কেন?… কোন কারণে মেজাজটা হয়ত বিগড়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।……

ভাঁড়ার ঘরে বসে রমলা সকালবেলার কুটনোগুলো কুটে রাখছিল, এমন সময়ে ললিতা এসে উপস্থিত হল। হাতে একটা কাগজের মোড়ক।

মোড়কটা রমলার সামনে রেখে গম্ভীর মুখে বললে—আপনার ছেলের জামা।…জামার দরকার সেটা অন্য বাড়ীর লোককে না জানিয়ে আমাকে জানালেই ভালো করতেন।

কথাগুলো শুনে রমলা হতভম্ব হয়ে গেল। বলে কি ললিতা!…

উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তার আগেই ও গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

গায়ে চার চারটে জামা আস্ত থাকতে কাকীমা ওর জন্যে আবার দুটো নতুন জামা কিনে এনেছেন। অনুপের আনন্দ ধরে না।

ছেলের আনন্দ দেখে রমলার চোখে জল আসে। আসল ঘটনাটা সে গোপন করে যায় ছেলের কাছে। কি হবে, ও সব সাংসারিক খুঁটিনাটি ওকে জানিয়ে? ছেলেমানুষ, অনর্থক মনটা বিষিয়ে যাবে।

মন সত্যিই বিষিয়ে যায়নি অনুপের। যাবে কেন? কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই কাকা ওকে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন—আশুতোষ কলেজে। প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাস করলেও অনুপের তো পড়াই হতো না দেশে থাকলে।···কাকার উৎসাহেই বলতে গেলে সে ইংরাজীতে অনার্স নিয়েছে। অনুপের লেখা দেখে তিনি কি খুশি।

ওঁর ধুরন্ধর ছেলেটি কিন্তু গ্রাহ্যই করে না অনুপকে। সব সময়ই একটা বিজ্ঞতার ভঙ্গিতে কথা বলে। দারুণ ডেপো ছেলে। পোশাক-আসাকেরই বা কি বাহার! সবে তো কলেজে ঢুকেছে। এর মধ্যেই এত!

মানসী কিন্তু অন্য রকম। পড়াশুনাতেও অনেক ভালো ভাইয়ের চেয়ে। সাজগোজ সে-ও করে বই কি! কিন্তু তার মধ্যে সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় আছে। যেমন দেখতে, স্বভাবটিও তেমনি মধুর। বাড়ীর মধ্যে এখন মানসীর সঙ্গেই তার সব থেকে বেশি ভাব। চকোলেট্ বল, চানাচুর বল, অনুপকে ভাগ না দিয়ে সে খাবে না।

মুখে কিছু না বললেও কাকীমা এসব পছন্দ করেন না। বিরক্তিটা সেদিন হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন।···দোষ মানসীরই। নিজের ভাগের মিষ্টি অনুপকে দিতে আসার কি দরকার ছিল?

সন্দেশটা হাতে দিতে যাবে, তখুনি কাকীমা উপস্থিত হলেন। মেয়েকে লক্ষ্য করে ভুরু কুঁচকে বললেন—সন্ধ্যাবেলায় পড়াশুনা না করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?

পড়াশুনা না করে মানসী কখন ঘুরে বেড়ায়?···হ্যাঁ, অনুপের জন্যেই মেয়েটা বকুনি খেল।

কাকীমা চলে গেলে মানসীর উপরই রাগটা ঝাড়লো অনুপ। বললে—আর কখনো আমার কাছে এসো না।

মানসী দমলো না এতটুকু। হেসে উঠলো। রেকাবি থেকে আর

একটি মিষ্টি তুলে ওর দিকে এগিয়ে ধরলো—নাও, আগে খেয়ে নাও তো, তারপর রাগ দেখিও।…

অনুপকে কি চোখেই যে দেখেছে মেয়েটা! তাড়িয়ে দিলেও যেতে চায় না। অনুপের সম্বন্ধে দারুণ একটা গর্ব ওর মনে।…

প্রফেসর বারীনবাবু বেড়াতে এলে সেদিন ও-ই তো হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। গর্বের সঙ্গে অনুপের পরিচয় দিয়েছিল—আমার দাদা,…চমৎকার কবিতা লিখতে পারে।

কবিতার খাতাখানা মানসীই একদিন আবিষ্কার করেছিল অনুপের দেরাজ থেকে।

লেখার নেশা থাকলেও কাউকে লেখাগুলি দেখায়নি অনুপ। দেখাবার মত কিছু নয়।

মানসীর কথা শুনে তাই লজ্জায় কান গরম হয়ে উঠেছিল ওর।

বারীনবাবু ওকে লক্ষ্য করে মিষ্টি হেসে বললেন—বেশ তো শুনিয়ে দাও একটা কবিতা—কবিতা দিয়েই আমাদের পরিচয় শুরু হোক।…

ছোটখাট এই মানুষটির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেছে অনুপ। আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সাধারণ চেহারা ভদ্রলোকের। কিন্তু কোথায় যেন একটা অসাধারণত্বের ছাপ আছে! প্রশস্ত কপাল—কপালের দিকে তাকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মনে পড়ে যায়। ভদ্রলোক বিদ্যার সাগর নিঃসন্দেহ। দু'দুটো সাবজেকটে এম. এ পাশ করেছেন। শুধু পাশ করা নয়, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। বিদ্যা ছাড়া আর যেটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সেটা ওঁর প্রাণ। প্রাণটা সত্যি রাজা-উজীরের মতই। কি গভীর সমবেদনা মানুষের দুঃখে! দুঃখ দূর করতে পারলে উনি যেন বেঁচে যান। হাতে এক টাকা থাকলে দু'টাকা দান করে বসেন—ধার করেও নাকি উনি টাকা দিয়ে থাকেন!… বারীনবাবুকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না।

কবিতা না শুনে ওঠেননি তিনি। পড়ে শোনাল মানসীই। দৌড়ে গিয়ে অনুপের ঘর থেকে খাতাখানা নিয়ে এসেছিল সে।

বারীনবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন প্রশংসায়। অনুপের দিকে তাকিয়ে বললেন—পার্টস্ আছে, কবিতাতেই কন্‌সেন্‌ট্রেট্ কর তুমি।

যাবার আগে পিঠে সস্নেহে এক চড় বসিয়ে বললেন—আমার ওখানে যেও মাঝে মাঝে—লিখতে না পারলেও কবিতার সমালোচনা তো করতে পারবো।...

যায় বই কি। আশ্চর্য একটা শক্তি আছে ভদ্রলোকের মধ্যে। কাছে গেলেই মনে কেমন উৎসাহ পাওয়া যায়। মন খারাপ হলেই তাই অনুপ চলে যায় ওঁদের ওখানে। বাপ-মেয়ের সংসার। বাপ বিপত্নীক। মেয়েটি বি. এ পড়ছে। সপ্রতিভ, কিন্তু গায়ে পড়ে আলাপ করার মেয়ে নয় বাণী।

অনুপও যেচে আলাপ করতে পারে না। দেখা হলেও বাণীর সঙ্গে সে কথা বলতো না প্রথম দিকে। কেমন সঙ্কোচ লাগতো যেন।

বাণীর ব্যবহারে কিন্তু কোনো সঙ্কোচ ছিল না। সহজ সরল ব্যবহার।...চেহারাতেও ওর কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, টানা নাক, বড় বড় টানা দুটি চোখ। চোখের তারা দুটো আশ্চর্য কালো। অরণ্যের বিস্ময় যেন স্তব্ধ হয়ে আছে ওখানে। মসৃণ—উজ্জ্বল ভ্রূরেখা সেই বিস্ময়কে যেন আরও গভীর করেছে। কপালখানা মেয়েদের তুলনায় একটু বড় বইকি। গায়ের রঙ খুব ফর্সা না হলেও মুখখানি ঝকঝক করে বুদ্ধির দীপ্তিতে। সাধাসিধে বেশ-ভুষা। সম্পূর্ণ নিরাভরণা। শাড়ীর সরু পাড়টি ছাড়া জামা-কাপড়ে কোথাও রঙের বালাই নেই। তাতেই কিন্তু বেশ মানিয়েছে মেয়েটিকে। ছিমছাম চেহারা। হঠাৎ দেখলে বাণীকে নিরীহ বলেই মনে হয়; কিন্তু সেটা কথা বলার আগে পর্যন্ত। ওর বাবার মতই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলে। তবে স্বভাবটি ভারী মিষ্টি। রাগ বা উষ্মা বলে কোন পদার্থ নেই। চোখে-মুখে একটা প্রসন্ন হাসি লেগে আছে সর্বক্ষণ। সন্ধ্যামালতীর প্রফুল্লতা ওর মনে।

সন্ধ্যাবেলায় বারীনবাবুর ওখানে যাবার সেদিন কোন কল্পনাই ছিল

না অনুপের। হঠাৎ গিয়ে হাজির হল। বারীনবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না।

বাণীই এগিয়ে এসে খবরটা দিলে।

তখুনি চলে আসছিল অনুপ। বাণী বাধা দিল। বললে—এসেই চলে যাবেন কেন, বসুন, বাবা এখুনি এসে যাবেন।

ভদ্রতার খাতিরেই বসতে হল।

বাণী ছুটে গিয়ে চা নিয়ে এল—দুজনের চা।

চা খেতে খেতে গল্প শুরু করলো—আপনি খুব ভালো কবিতা লেখেন শুনলাম।

আবার সেই কবিতা! অনুপ নারভাস হয়ে পড়লো—ওকে আবার কবিতা বলে!

—দারুণ বিনয়ী তো—

বাণী হেসে বললো। হাসিটা কেমন চেনা চেনা মনে হল যেন।

কিছু না ভেবেই অনুপ বলে ফেললো—আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হয়!

বাণী কি কৌতুক বোধ করল? মুখ টিপে একটুখানি হেসে বলল—এখানে নিশ্চয়ই।

কথাটা সত্যি একটু বেফাঁস বলে ফেলেছিল অনুপ। আলাপ না হলেও দেখা তো অনেক বারই হয়েছে ওর সঙ্গে।

চা শেষ হবার আগেই বারীনবাবু এসে গেলেন। অনুপও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।···

অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় তা-ও ঐ বারীনবাবুর ওখানেই। এক পাড়াতে বাস করলেও পরিচয় ছিল না অনুপের সঙ্গে।

বয়সে অরবিন্দ হয়ত সামান্য বড় অনুপের চেয়ে। গেল বছর বি. এ. পাস করেছে। লম্বা দোহারা গড়ন। রঙ ময়লা, কিন্তু মুখের ছাঁদটি ভারী সুন্দর—গ্রীসিয়ান কাট। টানা নাক-চোখ, চোখ দুটি হীরের মতই ঝক্‌ঝক করে। আশ্চর্য প্রাণবন্ত চেহারা, মজবুত মাংস-

পেশী, ওর হাতের ঘুষি খেলে লোকের মাথার খুলি তখুনি হয়ত দুভাগ হয়ে যাবে।

পূজোর ছুটি আরম্ভ হতেই মনটা কেমন উদাস লাগছিল অনুপের। থেকে থেকে দেশের কথা মনে পড়ছিল। পূজোর সময় ওরা গ্রামের ছেলেরা একত্র হয়ে নাটক করতো—কি উৎসব-আনন্দের মধ্য দিয়েই না কেটে যেত দিনগুলো!

বাড়ীতে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না বলেই সেদিন বিকেলে বারীনবাবুর ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল অনুপ। অরবিন্দও তখন সেখানে—রাজনীতি নিয়ে বারীনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করছে।

রাজনীতিক সমস্যা আলোচনা করতে কত লোকই না আসে বারীনবাবুর ওখানে!

অরবিন্দের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়ে গেল অনুপ। সঙ্কোচ ত্যাগ করে পরের দিন সকালেই সে গিয়ে হাজির হয়েছিল ওর আস্তানায়। কলেজও ছুটি ছিল।

কাঁসারী পাড়া রোড থেকে বেরিয়ে একটা সরু গলি। গলির মধ্যে একতলায় একখানি ছোট ঘর—অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে: দিনের বেলাতেও আলোর মুখ দেখা যায় না। দুটি ছেলে মিলে ওরা এই ঘরটি ভাড়া নিয়েছে— বেশি ভাড়া দেবার সামর্থ্য নেই নিশ্চয়।

ঘরে অরবিন্দ একলাই ছিল তখন—তক্তপোশের উপর বসে খবরের কাগজ পড়ছিল।

অনুপকে দেখে সে যতটা না বিস্মিত হল, খুশি হল তার চেয়েও বেশি। অনুপ যেন কতকালের চেনা ওর। উঠে গিয়ে তখুনি দোকানে চায়ের অর্ডার দিয়ে এল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক ছোকরা দুহাতে দু'গেলাস চা নিয়ে হাজির হল। সস্তার চা, চার পয়সা এক গেলাস চায়ের দাম, ছোট কাচের গেলাস।

চা খেতে খেতেই খবরের কাগজখানা লক্ষ্য করে অরবিন্দ বলে উঠলো—বক্তৃতার কি চোট দেখেছ? বক্তৃতা দিয়েই নেতারা বাজী

মাত করবেন ভেবেছেন ; কিন্তু শুধু বক্তৃতায় কি চিড়ে ভেজে ?—

অনুপ নির্বাক হয়ে ওর কথা শুনছিল।

একটু থেমে অরবিন্দ বললে—আসল সমস্যা অন্নবস্ত্রের—মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটাতে না পারলে এসব বক্তৃতা মাঠে মারা যাবে।

বাকী চা-টুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করেই সে উঠে পড়লো।

গায়ে সার্ট চড়িয়ে অনুপকে লক্ষ্য করে বললে—একটা জরুরী বৈঠক রয়েছে, এখুনি ছুটতে হবে।...তোমার ফুরসত মত একদিন সন্ধ্যার দিকে এসো, বসে গল্প করা যাবে।

কিন্তু সন্ধ্যার দিকে গিয়েই বা কি হবে ? সন্ধ্যার সময় বেশির ভাগ দিনই তো অরবিন্দ বাড়ীতে থাকে না। সর্বক্ষণ একটা-না-একটা কাজে ব্যস্ত সে।

রবিবার বিকেলে অভাবনীয় ভাবেই দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে।... বেড়াতে বেরিয়েছিল অনুপ। কোথায় যাওয়া যায় ? ট্রামে চেপে শেষ পর্যন্ত ময়দানে এসে নামলো।

মনুমেণ্টের তলায় হাজার হাজার লোক এসে জমায়েত হয়েছে। মিছিল করে নিঃস্ব মানুষের দল এগিয়ে চলেছে সেই দিকে—জনসমুদ্রে স্রোতস্বিনীর মতই মিলিয়ে যাচ্ছে মিছিলগুলি।

বাস্তুহারা সম্মেলন ! হাঁা, সকালবেলায় খবরের কাগজে অনুপ সম্মেলনের নোটিশ দেখেছিল বইকি !

অনুপ আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সভার দিকে। মাটিতে উপবিষ্ট জনতাকে ঘিরে বহুলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে। অনুপ তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মিটিং-এর সোরগোলের মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছে করলো না। ওজস্বিনী ভাষায় কে একজন বক্তৃতা দিচ্ছিল। গলাটা চেনা-চেনা মনে হল। ঘাড় উঁচু করে অনুপ মঞ্চস্থ বক্তাকে দেখলো—অরবিন্দ ! অরবিন্দ বক্তৃতা দিচ্ছে !

উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল অনুপ। হাত নেড়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ তখনও বলে চলেছে—দেশ বিভাগের ফলেই পূর্ববঙ্গের

মানুষকে আজ বাস্তুভিটে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে।···পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকার আজ কিছুতেই এড়াতে পারে না।—

বিপুল অভিনন্দন আর হাততালির আওয়াজে বক্তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।

মিটিং ভেঙ্গে গেলে অনুপ ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল অরবিন্দের কাছে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো ওর হাত দু'খানি। মনের মধ্যে মধ্যাহ্ন সূর্যের উত্তাপ অনুভব করছিল সে।

অরবিন্দকে যত দেখে ততই আশ্চর্য হয়ে যায় অনুপ। কি তেজ ! হতাশার কথা শুনলেই খেপে ওঠে। পেসিমিস্‌টিক্ কথাবার্তায় নাকি ওর 'নসিয়ার' ভাব আসে।

এত তেজ ও পেল কোত্থেকে ?

ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সামনে একটানা তিন মাস ছুটি। দীর্ঘ এই অবসর কি করে কাটাবে মানসী ? একটা বাজনা শিখলে কেমন হয় ? সেতার শেখবার শখ ওর অনেক দিন থেকেই। কিন্তু শেখাবে কে ?

গান-বাজনা শেখানোর জন্যে মানসীর বাবা টাকা খরচ করতে রাজী নন। মা গানের মাস্টার রাখার কথা তুলেছিলেন একদিন। বাবা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন—লেখাপড়ার জন্যে খরচ করার একটা মানে আছে, সেরেফ খানিকটা টুংটাং আওয়াজ করার জন্যে অতগুলো টাকা—

আসল কথা, গান-বাজনা উনি কিছুই বোঝেন না। বুঝলে কেউ অমন কাণ্ড করে ? রেডিওতে সেদিন আবদুল করিমের একখানা গান বাজছিল। ঘরে ঢুকেই চাবি ঘুরিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিলেন। কি হবে এসব ছাই ভস্ম শুনে, ভাবটা এইরকম। ঘটনাটা মনে হলে মানসীর এখনও হাসি পায়। ওঁর সমালোচনার চোটেই বোধ-হয় মানসীর মা গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। গলাটা কিন্তু খুব খারাপ ছিল না ওঁর—অনভ্যাসে মরচে পড়ে গেছে।

মানসীর মামার বাড়ীতে কিন্তু গান-বাজনার আদর আছে। মলিদি তাঁর গান-বাজনার অভ্যাস আগের মতই বজায় রেখেছেন। মানসীর মামাতো বোন মলি—বড়মামার একমাত্র সন্তান। বছর দুয়েক আগে পেন্‌শন্‌ নিয়ে বড় মামা দিল্লী থেকে চলে এসেছেন—আই. সি. এস. অফিসার ছিলেন। কলকাতায় এসে ক্যামাক স্ট্রীট অঞ্চলে বাড়ী করেছেন। ছোট্ট সংসার, মা, বাপ আর মেয়ে।

মানসীর চেয়ে মলি বয়সে অনেক বড়—সাত-আট বছরের। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বেঁটে ছিপছিপে গড়ন, চেহারা দেখলে কে বলবে যে উনি এম.এ. পাস করেছেন। বিয়ের পরেই পাস করেছেন, পড়াশুনা না করে করেনই বা কি? স্বামী বিয়ে করেই সেই যে বিলেত চলে গেলেন, আর ফিরবার নাম নেই। ইউরোপে গিয়ে ভদ্রলোক নাকি এক য়ুরোপীয় মেয়ের—

কিন্তু মলি য়ুরোপীয় মেয়েদের থেকে কম কিসে? আধুনিকতায় যে কোন য়ুরোপীয় মেয়ের সমকক্ষ। বব করা এক মাথা রুক্ষ চুল—একদিন অন্তর মাথায় শ্যাম্পু করা চাই। চোখে হালকা নীলাভ রঙের রিম্‌লেস্‌ চশমা। পরনে কাঁধ কাটা সিল্কের ব্লাউজ, হাল ফ্যাশনের জর্জেট কিংবা সিফন শাড়ী। শাড়ীর সঙ্গে নিখুঁত ভাবে ম্যাচ করা ব্লাউজ, জুতো। বেশভূষায় বেমানান কিছু দেখলেই মলি হেসে অস্থির। ওঁদের ওখানে যাবার সময় মানসী তাই ফিটফাট হয়েই যায়। মা না হলে যেতে দিলে তো? বেশভূষা সম্পর্কে ওর মা-ও খুব সচেতন। তবে বাবার পাল্লায় পড়ে লিপস্টিক্‌ মাখা ছাড়তে হয়েছে মাকে। লিপ্‌স্টিক্‌ মলিদিকেও মানায় না। গায়ের রঙ তো তেমন ফর্সা নয়।

গায়ের রঙ ফর্সা নয়, কিন্তু ইংরাজী উচ্চারণ ওঁর মেমসাহেবের মতই—ছেলেবেলায় মিশনারী স্কুলে পড়েছেন।

প্যান্ট-সার্ট পরে সুবোধের সঙ্গে ওকে ক্রিকেট খেলতে দেখলে কে বলবে যে উনি বাঙালী মেয়ে। মলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুবোধ। কত

ছেলের সঙ্গেই না ওঁর বন্ধুত্ব! চেহারায় না থাকলেও আচার-ব্যবহারে মলির সঙ্গে অসম্ভব মিল সুবোধের। বড়মামার বাড়ীতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মানসীর।

লম্বা দোহারা চেহারা। যেমন রঙ, তেমনি মুখ-চোখ। বয়স? চব্বিশ-পঁচিশের বেশি তো নয়ই। মলির সঙ্গেই বি.এ. পাস করেছে। বাঙালীর ছেলে ধুতি পরে না কেন? আজকাল অবশ্য ধুতি পরার রেওয়াজ কমে আসছে। তবে য়ুরোপীয় পোশাকেই ওকে মানায় ভালো। রঙটা তো প্রায় সাহেবেরই মত। বড়লোকের ছেলে, দেখলেই বোঝা যায়। বড়লোক না হলে এর মধ্যেই দু'দু'বার ইওরোপ ঘুরে আসতে পারতো? কন্টিনেন্ট-এর বহু জায়গায়ই নাকি ওর দেখা হয়ে গেছে। মলিদিও এখন বিলেত যাবার জন্যে তোড়জোড় করছেন। দারুণ স্মার্ট মেয়ে, আর স্মার্ট লোকের উপরই মানসীর যত আকর্ষণ। মলির প্রতি আকর্ষণের আরো একটি কারণ আছে অবশ্য। সেতারের হাত ওঁর ভারী মিষ্টি।

একবারের বেশি দু'বার বলতে হল না—মানসীকে বাজনা শেখাতে তিনি রাজী হয়ে গেলেন—বেশ তোমার সুবিধে মত চলে এসো—

বিকেল বেলায় রোদ পড়ে এলেই মানসী তাই চলে যায় বড়মামার বাড়ীতে। যত্ন করেই মলিদি ওকে বাজনা শেখান।

দিন কয়েক আগে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। ফার্ষ্ট ডিভিশনেই পাস করেছে মানসী—ইতিহাসে লেটার নিয়ে। মনটা তাই খুশিই ছিল। সকাল থেকেই বড়মামার ওখানে যাবার জন্যে উসখুস করছিল, বিকেলে একটু আগেই বেরিয়ে পড়ল সে—রোদ থাকতে।

ক্যামাক ষ্ট্রীটে ঢুকে প্রথমেই নজর পড়লো ঐ অঞ্চলের গাছপালার দিকে—সবুজ ডালপালায় পড়ন্ত বেলার রাঙা রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে। মনের মধ্যে রঙের নেশা জাগলো মানসীর।

বড়মামার বাড়ী অবধি যাওয়া হল না। পথেই দেখা হয়ে গেল

মলির সঙ্গে। শুধু মলি নয়, সুবোধের সঙ্গেও। গাড়ী করেই বেরিয়েছিল দুজনে। সুবোধ নিজেই ড্রাইভ্ করছিল, মানসীকে দেখে ব্রেক কষলো।

সুবোধের পাশের সীটেই বসেছিলেন মলিদি। গাড়ী থেকে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের ওখানে যাচ্ছো?

মানসী ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সুবোধ গাড়ীর দরজাটা খুলে ধরলো। উজ্জ্বল প্রসন্ন দৃষ্টিটা মানসীর মুখের দিকে তুলে বললে—উঠে এসো।

সামান্য ইতস্তত করে মানসী গাড়ীতে উঠে বসলো—পিছনের সীটে।

গাড়ীতে আবার স্টার্ট দিলে সুবোধ। কোথায় যাচ্ছে? যাক না যেখানে খুশি, মলিদি তো সঙ্গেই আছেন।

বালিগঞ্জ সারকিউলার রোডে একখানি বিরাট বাড়ীর সামনে এসে গাড়ীটা থামলো।

সুবোধের বাড়ী! বাড়ী নয় তো রাজপ্রাসাদ। ভেতরে ঢুকে মানসী মুগ্ধ হয়ে গেল। গেট খুলতেই লাল সুরকি-ঢালা পথ। পথের দু'পাশে ঝাউ গাছের সারি, প্রহরীর মত।

ডাইনে-বায়ে সাজানো ফুলের বাগান। ফুলের মধ্যে গোলাপ আর রংবেরং-এর বিলিতি ফুলই বেশি। গোলাপের সাইজ দেখলে সত্যি তাজ্জব লাগে।

ইচ্ছে হলেও বাগানে বেড়াতে পারলো না মানসী। ওদের সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে ঢুকতে হল।

বাড়ীতে কে-ই বা আছে সুবোধের! বাপই বেঁচে ছিলেন একমাত্র। তিনিও মারা গেছেন গেল বছরে। ঠাকুর, চাকর, বেয়ারা নিয়েই সংসার।

ড্রয়িং রুমে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা ছুটে এল—কোল্ড্ কফি নিয়ে।

কফি খেতে খেতে সুবোধ গল্প জুড়ে দিল মলির সঙ্গে। চোখ দুটো কিন্তু ছিল মানসীর দিকেই। অপলক দৃষ্টি। অত কি দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে? মানসীর লজ্জা লাগছিল ভীষণ।

কফির কাপগুলো তখনও খালি হয় নি, বেয়ারা আবার ট্রে করে জলখাবার নিয়ে এল—কেক, মিষ্টি, ফল। কত রকমের যে খাবার।

খেতে খেতেই সুবোধ হঠাৎ ঐ প্রস্তাবটা করে বসলো—সিনেমায় গেল মন্দ হত না, একটা দুর্দান্ত বই এসেছে লাইট্ হাউসে।

মলিদি ইতস্তত করছিলেন। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুবোধ বললে—এখনও সময় আছে, রাজী থাক তো বল।

মানসীর দিকে তাকিয়ে মলিদি হেসে জিজ্ঞেস করলেন কি গো মত আছে?

—ওর আবার মতামত কি?—মানসীর হয়ে সুবোধই উত্তর দিলে।

মামারাড়ীর নাম করে বিকেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে মানসী। সন্ধ্যার মধ্যে না ফিরলে মায়ের কাছে বকুনি শুনতে হবে। মা নিজে অবশ্য প্রায়ই রাত করে বাড়ী ফেরেন। কিন্তু মায়ের সঙ্গে কি ওর তুলনা হয়?

মানসী দোটানায় পড়ে যায়।

মলিদির সেটা নজর এড়ালো না।

সুবোধকে লক্ষ্য করে কৌতুকের ছলে বলে উঠলেন—তোমার সঙ্গে যেতে ওর আপত্তিও তো থাকতে পারে।

—আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি!

—কেন, তুমি এমন কোন্ সাধুপুরুষ শুনি?

সুবোধ হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই বললে—আর যা হতে বলো, সাধুপুরুষ হতে বোল না—একটু থেমে তেমনি হাসির ছলে বললে—মুখে যা-ই বল না কেন, মনে মনে তোমরা সাধুপুরুষকে কখনও পছন্দ কর কি?

—কি সব যা-তা বকছো।—শাসনের ভঙ্গিতে সুবোধের দিকে চেয়ে মলি বলে উঠলো : কতগুলো চটকদার কথা বলে গেলেই হল।

মলির বকুনি খেয়েও সুবোধ ঘাবড়ালো না। হেসেই জবাব দিলে—কথারই তো যুগ এটা—কথা চটকদার না হলে চলবে কেন ?

সোফায় এলিয়ে বসেছিলেন মলিদি। ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে বলতে যাবেন কিছু, সুবোধ বলতে দিলো না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুবোধ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল —ও মাই গড্, ছ'টা বাজতে চললো, যেতে হলে আর দেরী নয়।

মলি কেমন বিব্রত হয়ে পড়লো। মানসীকে নিয়েই তাঁর যত চিন্তা। মানসীর মুখের উপর একটা গম্ভীর দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞেস করলো—কি যাবি ?···পিসীমা চিন্তা করবেন না ত' ?

এবারও উত্তরটা দিলো সুবোধ। বললে—ওর ভার আমি নিচ্ছি। মায়ের জিম্মায় মেয়েকে পৌঁছে দিলেই তো হল !

সন্ধ্যা উতরে গেছে। খানিক আগে এক পসলা বৃষ্টি হয়েছে, তবু মেঘ কাটে নি। যে কোন সময়ে আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ দেখতে দেখতে হঠাৎ খেয়াল হল ভূপেশের—মানসী এখনও বাড়ী ফেরেনি। বৃষ্টি মাথায় করে আজ বাইরে বেরোনর কি দরকার ছিল ? মেয়েটা আগে কিন্তু এরকম ছিল না। ঘরকুনো ঠাণ্ডা স্বভাবেরই তো মেয়ে। শেষ পর্যন্ত মায়ের ধারাই পেল নাকি ?···

বড় বহির্মুখী মন ললিতার। বড় লোকের মেয়েদেরই হয়ত বৈশিষ্ট্য এটা। বিকেল হলেই বাইরে বেরোনর জন্যে ছটফট করতে থাকে। ভূপেশ কোর্ট থেকে ফিরে আসবার আগেই সাজসজ্জা কম্‌প্লিট। চায়ের পাট সারা হতে না হতেই—

দুঃখের বিষয় নিজেদের গাড়ী নেই। তবে গাড়ীওয়ালা বন্ধু-বান্ধবের তো অন্ত নেই ওর। তাঁরাই গাড়ী নিয়ে আসেন। এই তো

সেদিন নীলিমা দেবীর স্বামী বিরাট বুইক গাড়ী হাঁকিয়ে হাজির হলেন. নীলিমা নাকি ওকে নিয়ে যেতে বলেছে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গিয়ে গাড়ীতে ওঠার কি প্রয়োজন ছিল? তা-ও যদি নীলিমা দেবী নিজে আসতেন নিতে। ললিতার কলেজ-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। তিনজনে নাকি কোথায় বেড়াতে যাবেন।

যেতে চায় যাক। তাই বলে নিজের ঘর-সংসারের দিকে একটু নজর দেবে না?

কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই।...তাতে নাকি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়!...

বরাবরই জেদী মেয়ে ললিতা। তার উপর বারীন ওকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ভূপেশের আবাল্য বন্ধু বারীন—ছেলেবেলা থেকেই মাথাভাঙ্গা।...

মেয়েদের নাকি পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বুদ্ধিতে এবং কর্ম-ক্ষমতায় খাটো, এটা বারীন কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। একটা পুরানো সংস্কার থেকেই নাকি এই চিন্তাধারার উৎপত্তি।...

নয়ানগঞ্জের মত গ্রামে পর্যন্ত সে একবার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একসঙ্গে থিয়েটার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কৃতকার্য হয়নি। একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় ভূপেশের। ব্যাপারটা হাসির।...

গ্রামে ছেলেরাই বরাবর মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতো। সেবার নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিল সুরেন। ছোটোখাটো মেয়েলী ধরনের চেহারা। বারীন ওদেরই সহপাঠী সে, শুধু সহপাঠী নয়, পরম ভক্ত বারীনের।

নায়কের পার্ট নিয়েছিল বারীন নিজে। থিয়েটার শেষ হবার পর সুরেন এসে বারীনের কাছে অভিমান জানালো: অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছিলি কেন!

বারীন মজার উত্তর দিয়েছিল: তোর মুখের দিকে তাকিয়ে

প্রেমালাপ করা সম্ভব হত না, তাই।—

বারীনের কথা শুনে থিয়েটার-ক্লাবের সমস্ত সভ্য হেসে উঠেছিল হো হো করে।

থিয়েটার সত্যিই ভালো করতো বারীন—শিশিরবাবুর কাছাকাছি।...এই ক্ষমতাটার জন্যেই হয়ত গ্রামের কুমারী মেয়েগুলো ওর ভালবাসায় হাবুডুবু খেত।...গ্রামের লোক, মেয়েদের সঙ্গে অত মেলামেশা করলে নিন্দে তো করবেই। কথাগুলো শুনে মন খারাপ হয়ে যেত ভূপেশের।

বারীনকে শুধরে দেওয়ার কি চেষ্টা করেনি সে? করেছে, কিন্তু ফল হয়নি। বারীন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে ওর কথা, বলেছে—নিন্দুকের স্বভাবই তো নিন্দে করা—ওতে ঘাবড়ালে চলবে কেন?—হাসতে হাসতেই বলেছে—সংসারে সব কিছুর জন্যেই মানুষকে প্রিমিয়াম্ দিতে হয়।...

স্বাধীনতায় হাত দিলে বারীন বরাবরই খেপে যায়—বিশেষ করে মেয়েদের স্বাধীনতায়।...

ওরা তখন এম. এ. পড়ছে। 'নিকেতন বোর্ডিং'-এর বিজনবাবুকে মুখের উপর কেমন কড়া কথা শুনিয়ে দিল!...

ছুটির দিনে দুপুরের দিকে বিজনবাবুর ঘরে প্রায়ই তাসের আড্ডা বসতো। তাস খেলার নেশা না থাকলেও ব্রিজের হাত কিন্তু বারীনের ভালোই ছিল। খেলার শেষে সেদিন চায়ের আসরে দেশের বিপ্লবী নেতাদের নিয়ে আলোচনা উঠেছিল। আলোচনার একটা স্তরে বিজনবাবু হঠাৎ মন্তব্য করেছিলেন—আন্দোলনের মধ্যে মেয়েদের কখনো টানতে নেই।—একটু থেমে রসিকতার ছলে বলেছিলেন: খানাতল্লাসের সময় কুমারীদের স্যুটকেশ থেকে শেষে বিপ্লবী ছোকরাদের ছবি বেরিয়ে পড়ে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা বিশেষ একটি খবর পরিবেশন করে বিজনবাবু সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন।

বড় বড় চোখ করে সবাই তার কথা শুনছিল। বারীনের চোখে

হঠাং যেন একটা আগুনের ফুলকি চমকে উঠল। বিজনবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললে—বিপ্লবী মেয়ের স্যুটকেস থেকে বিপ্লবীর ছবি বেরুনোই তো স্বাভাবিক—আপনার আমার মত 'তাসারু'-র ছবি বেরুবে কি করে?

ঘরের সবাই হেসে উঠেছিল বারীনের কথা শুনে। কিন্তু বিজন-বাবু হাসতে পারেন নি।···

ঘড়িতে ঢং ঢং আওয়াজ করে উঠতেই চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল ভূপেশের। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠল সে। রাত আট-টা বাজলো, তবু মানসীর দেখা নেই। এত রাত তো ও করে না বড় একটা!

চেয়ার ছেড়ে ভূপেশ পায়চারি করতে লাগলো। দিন কয়েক আগে আরো একদিন এইরকম রাত করে বাড়ী ফিরেছে সে। মলি নাকি ওকে জোর করে সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে অবশ্য গাড়ী করে সে-ই পৌছে দিয়ে গেছে। অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছু বলতে পারেনি ভূপেশ।···নিজের মামাতো বোনের সঙ্গে সিনেমায় যাবে এতে বলার কি আছে?

কিন্তু ওদের সঙ্গে অত মেলামেশা না করাই ভালো। বুড়ী হতে চলেছে, এখনও সঙয়ের মত মুখে রঙচঙ মেখে থাকে মেয়েটা। যেমন পোশাক, তেমন চালচলন।···বড় পুরুষঘেষা স্বভাব।

হাঁা, মানসী আজকাল বড় বেশি যাতায়াত সুরু করেছে ওদের ওখানে। মলিদি বলতে অজ্ঞান।···বিকেল হতে না হতেই মেয়ে বেরিয়ে গেছেন। কতক্ষণে ফিরবেন কে জানে!

গলা খাঁকরি দিয়ে বারীন ঘরে ঢুকলো।

ওকে দেখে রাগটা যেন আরো বেড়ে গেল ভূপেশের। পায়চারি করতে করতেই বললে—মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়াই বিপদ।

বারীন চুপ করে রইল। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো মনোযোগ সহকারে। সিগারেটে একটা টান দিয়ে হঠাৎ বলে উঠল—যেখানে

স্বাধীনতা সেখানেই দায়িত্ব, যেখানে মুক্তি, সেখানেই ভয়।—

ওসব কচকচি ভালো লাগছিল না ভূপেশের। বিরক্তির সঙ্গে বললে—স্বাধীনতা দিয়েছ কি মেয়েরা গোল্লায় গেছে।

বারীন যেন কৌতুক বোধ করে কথাটা শোনে। বলে—এক কাজ করলে সব থেকে ভালো হয়, মেয়েদের পাগুলো সব খোঁড়া করে দেওয়া হ'ক—তাহলে আর বিপথে যাবার ভয় থাকবে না।

মনে মনে চটলেও বারীনের কথার কোন প্রতিবাদ করে না ভূপেশ। তর্কে ওর সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত।

আগের কথার জের টেনে বারীনই আবার বলে উঠল—এ ব্যাপারে চীনারাই সব থেকে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল—ছেলেবেলা থেকেই তারা মেয়েদের পা বেঁধে রাখতো লোহার জুতো পরিয়ে।

বারীনের রসিকতায় ভূপেশ হেসে ফেললো শেষ পর্যন্ত।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চা খেয়ে বারীন চলে গেল খানিকবাদেই।

বৈঠকখানার ঘরেই চুপচাপ বসে রইল ভূপেশ। মানসী এখনও ফিরলো না কেন? এত রাত অবধি বাইরে থাকলে পড়াশুনাই বা করবে কখন?

ভূপেশ জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ একখানি 'প্যাকার্ড' গাড়ী এসে থামলো বাড়ীর সামনে। কে এল অমন গাড়ী করে! মানসী? হ্যাঁ, মানসীই তো নামলো গাড়ী থেকে। সঙ্গে একটি যুবক! আলাপ না থাকলেও ঐ ছেলেটি অপরিচিত নয় ভূপেশের। সুবোধ চৌধুরী, ললিতার বড়দা রমেশবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত আছে ওর, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। ভূপেশ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল।

বাড়ীতে এসে ঢুকলো দুজনে—বৈঠকখানার ঘরটাকে পাশ কাটিয়ে সোজা অন্দরমহলের দিকে চলে গেল।

ছেলেটি নাকি মলির ক্লাসফ্রেণ্ড।···স্বামী বিদেশে পড়ে আছে, ক্লাসফ্রেণ্ড নিয়ে এত নাচানাচি কেন বাপু!

মানসীর সঙ্গেও ছেলেটির আলাপ আছে দেখা যাচ্ছে। রমেশবাবুর বাড়ীতেই নিশ্চয় আলাপ হয়েছে। কিন্তু এত রাতে মানসীকে সে পৌঁছে দিতেই বা এল কেন?...

রাস্তায় গ্যাস-পোস্টের সামনে বিরাট গাড়ীখানা ঐরাবতের গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভূপেশ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।... নিজের রোজগারের টাকায় ছোকরা নিশ্চয় এই গাড়ী কেনেনি।... গাড়ীর শখ ভূপেশেরও আছে বইকি! তবে ললিতার মত তো অবুঝ নয় সে। ধার করে গাড়ী কেনার কোন অর্থ ই হয় না। তা ছাড়া রেকারিং এক্স্‌পেন্স্‌-এর কথাটাও তো ভাবতে হয়।...

রাত্রে শুতে এসে ললিতা নিজ থেকেই সুবোধের কথা তুললো—সুবোধ নিজে গাড়ী করে আজ পৌঁছে দিয়ে গেছে মানসীকে।...অমন ছেলে হাজারে একটা মেলা ভার।

ভূপেশ উৎসাহিত হল না। ললিতার কিন্তু ঘাটতি নেই উৎসাহের। বললে—ওর সঙ্গে মানসীর বিয়ে হলে বেশ হয়, না?

ভূপেশ ঘাড় নাড়লো—ছেলেটির চালচলন আমার একদম ভালো লাগে না।—কারণটা সে খুলেই বললে—মলির সঙ্গে অতটা মাখামাখি —এই কথা।—ললিতা হেসে উঠল: তুমি বড় সেকেলে।...ছেলে-মেয়েরা আজকাল সহজভাবেই মেলামেশা করে। তোমাদের দিন আর নেই, একথা ভুলে যাচ্ছ কেন?—একটু থেমে বললে—সহপাঠিনীদের সঙ্গে ছেলেরা আড্ডা দিতেই ভালবাসে। কিন্তু কখনো ভালবাসায় পড়ে না—বিয়ে করা তো দূরের কথা।

—তা যা বলেছো—

ভূপেশের সমর্থন পেয়ে ললিতা আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল। মিষ্টি হেসে বললে—কেন, নিজের কথা মনে নেই...?

মনে ঠিকই আছে। ভূপেশ এবার আর না হেসে থাকতে পারলো না।...চিত্রলেখা ওদের ক্লাসেই পড়তো। ভূপেশের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে তার বাবা কত ঝুলাঝুলিই না করলেন! ভূপেশ কিছুতেই

রাজী হলনা।···চিত্রলেখা দেখতে কিন্তু মোটেই খারাপ ছিল না। তবে লজ্জা-শরম বড় কম ছিল। হাসির কোনো কথা উঠলে ক্লাসের মধ্যেই হেসে উঠতো খিল খিল করে। ছেলেগুলোও যেমন, হাঁ করে আদেখলের মত ওর দিকে চেয়ে থাকতো।···কত ছেলের যে মাথা খেয়েছে মেয়েটা! ভূপেশকে টলাতে পারে নি। বেহায়াপনা কোনদিনই পছন্দ করে না সে।···

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে পুরানো দিনের পাতা উল্‌টে চলেছিল ভূপেশ।

চোখ বড় করে বিস্ময়ভরা গলায় ললিতা হঠাৎ বলে উঠল···বড়বৌদির কাছে শুনেছি, সুবোধ নাকি সম্প্রতি দুটো মিলের মালিক হয়ে বসেছে।

—দুটো মিলের মালিক!

ললিতা সগর্বে উত্তর দিলে—বিশ্বাস না হয়, বড়বৌদিকেই জিজ্ঞেস কর।

খানিকটা নীরবতা। নীরবতা ভেঙ্গে ভূপেশ আস্তে আস্তে বললে —কিন্তু আমাদের মত গরীব লোকের সঙ্গে ওরা কাজ করতে রাজী হবে কেন?

—চেষ্টা করতে দোষ কি?

ভূপেশ দোমনাভাবে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে—আর প্রতিবাদ করে না।

মানসী কি ইচ্ছে করে দেরী করেছে সেদিন? মোটেই না। সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ী ফিরে আসবে ঠিক করেই তো সে মলিদের ওখানে সেতার শিখতে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার অনেক আগেই ফিরে আসছিল। না আসার কোন কারণও ছিল না। ফাঁকা বাড়ীতে মানুষ আর কতক্ষণ বসে থাকতে পারে! মলিদিরা সবাই নেমন্তন্ন খেতে গেছেন, আগে জানলে মানসী তো যেতই না ওখানে।

ঠায় এক ঘণ্টা ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করলো মানসী, তারপর উঠে পড়লো।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে—গেটের সামনেই সুবোধের সঙ্গে দেখা।

গাড়ী থেকে নেমেই বলে উঠলো—একি, চলে যাচ্ছো?

যাবে না তো করবে কি? মানসী মাথা নেড়ে সায় দিলে। বললে—মলিদিরা কেউ বাড়ী নেই।

—একলা ভয় পাচ্ছো?—সুবোধ হেসে উঠল: চল, চল। এখুনি যাবে কি!

চিন্তা করার আর অবসর পেল না মানসী, সুবোধের সঙ্গে আবার ফিরে এল, ড্রয়িং-রুমে এসে বসলো তুজনে।

সুবোধকে দেখে বেয়ারা ছুটে গিয়ে চা নিয়ে এল।

টিপয়ে চায়ের ট্রে নামিয়ে দিয়ে বললে—দিদিমনিরা এখনই এসে যাবেন।

—শুনলে তো?—মানসীর দিকে তাকিয়ে মৃত্যু হেসে বললে সুবোধ।

তুধ, চিনি মিশিয়ে চায়ের কাপ মানসীই এগিয়ে দিলে সুবোধের দিকে।

ধূমায়মান চায়ের দিকে তাকিয়ে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল হয়ত।

—কি ভাবছো এত?—সুবোধ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো।

মানসী থতমত খেয়ে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলে। অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে বললে—মলিদিরা কতক্ষণে আসবেন কে জানে!

সুবোধ হাসলো একটু।—মলিদিকে তুমি খুব ভালবাস, না?

মানসী কি উত্তর দেবে? চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আমতা আমতা করে বললো—দিদিকে কে না ভালবাসে।

হাসির মুখ করে মানসীর দিকে তাকিয়ে সুবোধ সিগারেট ধরালো। সিগারেটে জোরে টান দিয়ে বললে—দিদিকেই সব ভালবাসা দিয়ে ফেল না যেন! আমাদের জন্যেও ছিটেফোঁটা রেখো।

এ আবার কি কথা! শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথার দিকে উঠে এল মানসীর।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে সুবোধ তেমনি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলো—আপত্তি আছে?

নিষ্পলক-মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুবোধ তাকিয়েছিল মানসীর দিকে। লজ্জায় মুখ নীচু করে রইল মানসী।

সুবোধ আচমকা ওর হাতটা টেনে নিলে নিজের হাতের মধ্যে। মুঠোয় চেপে ধরে বললে—কি নরম হাত। বলেই চুমু খেলে হাতের উপর।

মানসী কেমন হকচকিয়ে গেল। সারা শরীরে আশ্চর্য একটা শিহরণ। বাধা দেওয়া দূরে থাক, একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারলো না সে!

সুবোধ মুখের উপর ঝুঁকে পড়লে সম্বিৎ ফিরে পেল মানসী—দূরে সরে গেল।

অপরাধীর মত মুখ করে সুবোধ বললে—রাগ করলে?

মানসী তবু কথা বলতে পারলো না। কি করে বলবে? বুকটা তখনও যে ওর দুরদুর করছে।

টি-পট থেকে আরো এক কাপ চা ঢেলে নিলে সুবোধ। চায়ে হালকাভাবে চুমুক দিয়ে মৃদু হেসে বললে—ভালোবাসা কোনো অপরাধ নয়। একটু থেমে বললেঃ আমার হাতে মেয়ে দিতে তোমার বাবার নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

লজ্জায় মানসী মাথা নোয়ালো।

সুবোধ বললে—হানিমুনের জায়গাটা আগে থেকেই ঠিক করে ফেলতে হবে। কোথায় যাবে বল?

মানসীকে ও বিয়ে করবে! ভালোবাসে? কথাটা মানসী বিশ্বাস করতে পারে না যেন।—হ্যাঁ, ঠিক আছে, প্যারিসেই যাওয়া যাবে।—সুবোধ নিজেই উত্তর দিলে নিজের কথার। একটু চুপ করে থেকে

বললে—পৃথিবীতে অমন সুন্দর দেশ অতি অল্পই আছে। ওখানে গেলে মনে হয় যেন স্বপ্নরাজ্যে এসে পড়েছি।

স্বপ্নরাজ্যেই চলে গিয়েছিল মানসী। ঘড়িটা হঠাৎ আওয়াজ করে উঠতেই খেয়াল হল—রাত হয়েছে।

—এবার যেতে হয়।

—একলা যাবে? চল, পৌঁছে দিয়ে আসি।

সঙ্কোচ লাগলেও মানসী আপত্তি করতে পারলো না। সুবোধের সঙ্গে গাড়ীতে এসে উঠলো।

পিছনের সীটেই দুজনে বসলো গিয়ে। ড্রাইভারই ড্রাইভ করছিল। গায়ে গা ঘেঁষে বসেছিল সুবোধ।

গাড়ীর স্পীড্ বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কোমরটা জড়িয়ে ধরলো। মানসীর আপত্তি গ্রাহ্যই করলো না।

মানসীকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল সে।

রাত্রে পড়ায় আর মন বসলো না মানসীর। খাওয়া সেরেই শুয়ে পড়লো। কিন্তু বিছানায় চোখ বুজে পড়ে থাকলেই কি ঘুম আসে! অনেক রাত অবধি জেগে রইল মানসী। বুকের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা আনন্দ! আনন্দে মানুষের এমন কান্না পায় কখনো?

পোড়-খাওয়া মানুষ, মনের বল হারায় না সহজে।

রমলাও হারায় নি।

বেঁচে থাকলে অনুপ নিশ্চয়ই একদিন সুদিনের মুখ দেখবে—দুঃখের সময়ে মনকে সে প্রবোধ দিয়েছে। নিজেকে একেবারে মিথ্যে প্রবোধ দেয় নি সে।

ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে অনুপ বি. এ. পাস করেছে। আনন্দে রমলার চোখে জল আসে, ওর বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন! চিরদিনই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তিনি। ভূপেশ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক

পাস করলে কি আনন্দই না হয়েছিল তাঁর !—ওকে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াবো।

পড়িয়েছিলেন বইকি! সকালে সন্ধ্যায় টুইশানি করে ওকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়েছিলেন। কি প্রাণ-ই না ছিল মানুষটার।

তাঁর ছেলে আজ বি. এ. পাস করেছে। কিন্তু রমলার অদৃষ্টে শান্তি লেখা নেই। কাকীমাকে প্রণাম করতে গিয়ে অনুপ মুখ বিমর্ষ করে ফিরে এল। পাসের খবর পেয়েই ললিতাকে প্রণাম করতে গেছলো সে। ললিতা ওর সঙ্গে হেসে দুটো কথাও কি বলতে পারতো না? মন অবশ্য ওর ভালো নেই। সমীর পরীক্ষায় পাস করতে পারে নি। তাতে রমলারও কি দুঃখ হয় নি? কিন্তু কি করতে পারে সে?…মন দিয়ে পড়াশুনা করলে সামনের বার নিশ্চয় পাস করবে সমীর।

এম.এ. ক্লাসে ভর্তির সময় হয়ে এসেছে। রমলাকে তাই অতিষ্ঠ করে তুলেছে অনুপ। সকালে-বিকালে রোজই একবার করে তাড়া দেয়—কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

সত্যিই তো, নানা কাজে ব্যস্ত থাকে ভূপেশ, হয়তো খেয়াল নেই। রমলা তাই নিজেই বলতে গেল কথাটা। ভূপেশকে বলবে না তো বলবে কাকে? ওর চেয়ে আপনার কে আছে সংসারে!

সকালবেলায় কোর্টে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে ভূপেশ, কিন্তু অমন গম্ভীর হয়ে আছে কেন? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেক্‌টাই বাঁধছিল।

রমলার কথা শুনে চুপ করে কি যেন ভাবলো একটু। তারপর নেক্‌টাই বাঁধতে বাঁধতেই বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলে—এম.এ. পাস করে কোন্ রাজ্যটা উদ্ধার করবে শুনি! একটু থেমে বললে—ছেলেকে এখন চাকরি-বাকরির চেষ্টা করতে বল।—হুকুমের সুর ভূপেশের গলায়।

রমলা হতভম্ব হয়ে গেল। রমলার সঙ্গে ও এইভাবে কোনদিনও কথা বলে নি।…পড়া ছেড়ে অনুপকে এখুনি চাকরিতে ঢুকতে হবে। এম.এ. পড়বে বলেই না সে অনার্স নিয়ে বি.এ. পড়তে গেছে।

অনার্সের বই অবশ্য তাকে একখানাও কিনতে হয় নি—লাইব্রেরি আর বন্ধুবান্ধবের বই দিয়েই চালিয়ে দিয়েছে।···

মাথা নীচু করে রমলা স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, কোট গায়ে দিয়ে ভূপেশ গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার আগে রমলার দিকে একবার ফিরেও তাকালো না। এ যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। রমলার কোলে-পিঠে চড়ে যে ভূপেশ বড় হয়েছিল, এ যেন সে নয়।···

চোখ থেকে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো রমলার। অভিমানের উত্তাপে সেই জল আবার কখন যে শুকিয়ে গেল, সে জানতেও পারলো না।

মুখের উপর রমলাকে অমনিভাবে কথাটা বলে ফেলে ভূপেশের মনও কি খারাপ লাগছিল না? কোর্ট থেকে কয়েক ঘণ্টা আগেই তাই বাড়ী ফিরে এল সে। কাজও ছিল না।

মেজাজটা আগের দিন থেকেই খারাপ হয়েছিল। হয়েছিল ললিতার জন্যেই—অনর্থক চটাচটি করলো খানিকটা। অপরাধ?

অনুপের পরীক্ষার ফল দেখে ভূপেশ কেন অত উৎফুল্ল হয়ে উঠলো? উচ্ছ্বাসটা হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছিল ললিতার কাছে—ওর পেছনে টাকা খরচ করা সত্যিই সার্থক হয়েছে।

কথাটা শুনে ললিতা যে এমন চটে যেতে পারে ভূপেশ ধারণাই করে নি।···মুখ গোমড়া করে কি যেন ভাবলো খানিকক্ষণ। তারপর ভূপেশকে লক্ষ্য করে আচমকা বলে উঠলো—টাকার চিন্তা না করে নিজের ছেলেটাকে যাতে মানুষ করতে পার তার চেষ্টা কর।

ছেলেকে মানুষ করতে চেষ্টার কি ত্রুটি করেছে ভূপেশ? একটার জায়গায় তিন তিনটে টিউটর রেখে দিয়েছে। তবু পরীক্ষায় পাস করতে পারলো না। পড়াশুনা না করলে করবে কিভাবে।···লেখা-পড়ার বিরুদ্ধে সে এখন জেহাদ ঘোষণা করে বসেছে। ভূপেশের

মুখের উপর স্পষ্ট বলেছে—পরীক্ষা-টরিক্ষা ওসব আমার ধাতে পোষাবে না···মিথ্যে কেন টাকা নষ্ট করছো ?

—কিন্তু ডিগ্রীটা তো চাই—ভূপেশ বোঝাবার চেষ্টা করেছিল।

ছেলে বিজ্ঞের মত উত্তর দিলে—ডিগ্রীর কী মূল্য আছে ?

শুনে গা জ্বলে উঠেছিল ভূপেশের।—ডিগ্রী না থাকলে যে কুলিগিরি করে খেতে হবে।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে সমীর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এই ছেলেকে নিয়েই কত কল্পনা ভূপেশের।···বি.এ. পাস করলেই ওকে বিলেত পাঠাবে। সংসারের খরচ সংক্ষেপ করে তাই না সে—

ললিতার মিথ্যা অভিযোগ শুনে ভূপেশ তাই অত চটে উঠেছিল। রাগের মাথায় বলে ফেলেছিল—ছেলেকে মানুষ করার উপায় আছে ! আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই তো ওর মাথাটি খেয়েছ !

আর যায় কোথায় ! রাগে নাসারন্ধ্র কাঁপতে লাগলো ললিতার। বললে—আদরের কি দেখলে ?···একটা ভালো স্যুট তৈরি করতে চেয়েছিল, বিরক্তির সঙ্গে পঞ্চাশটি টাকা ফেলে দিয়ে চলে গেলে। পঞ্চাশ টাকায় আজকাল স্যুট হয় ? খুব কম করেও দুশো টাকা লাগে।···পাঁচ-টা নয়, সাত-টা নয়, একটা মাত্র ছেলে—তার কোন আবদার রেখেছো তুমি ? ছুটিতে বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে যেতে চেয়েছিল, তাতেও গররাজী।

ভূপেশ কোন উত্তর খুঁজে পেল না। ললিতা একাই বলে চললো —বেশ তো, ভাইপো অনার্স পেয়েছে, এখন বিলেত পাঠিয়ে দাও পড়তে—

ভূপেশ জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো—কোন কথা বললে না।

ভূপেশকে চুপ করে থাকতে দেখেই হয়তো ললিতা শেষ পর্যন্ত রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

রাত্রেও ভালো করে কথা বললে না ভূপেশের সঙ্গে। অনুপের প্রশংসা করে সে যেন একটা মস্ত অপরাধ করে বসেছে !

মেজাজটা তাই খিঁচড়ে ছিল ভূপেশের।

সকালবেলায় কোর্টে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, বৌদি আর সময় পেলেন না আসার। ঘরে ঢুকেই ছেলের পড়ার কথা তুললেন—তোমার ভাইপো তো এম.এ. পড়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।

কথাটা শুনেই চটে উঠলো ভূপেশ। তবে উত্তরটা সে ভালোভাবেও তো দিতে পারতো! বৌদির মুখে সে কোনোদিন কড়া কথা শুনেছে বলে মনে করতে পারে না। কড়া কথা শুনতেও তিনি অভ্যস্ত নন। অপ্রিয় কোন কথা শুনলে মুখখানা এমন কাঁচুমাচু করে ফেলেন যে দেখলে মায়া হয়।

কিন্তু সকালবেলায় ওঁর মুখের দিকে না তাকিয়েই তো সে দিব্যি বেরিয়ে এসেছে বাড়ী থেকে! নিজের ঘরে গিয়ে বৌদি নিশ্চয় চোখের জল ফেলেছেন। কোর্টে গিয়েও তাই হয়তো ওঁর কথা বার বার মনে পড়েছে।

বাড়ী ফিরে এলে ললিতা রাগ-অভিমান ভুলে নিজের হাতে চা-জল-খাবার নিয়ে এল। ললিতার রাগ হতেও দেরী হয় না, যেতেও দেরী হয় না, ওর স্বভাবটাই ঐরকম।

চা খেতেই-খেতেই ভূপেশ রমলার কথা জিজ্ঞেস করলো—বৌদি কি করছেন?—করবেন আবার কি?—মুখ বেঁকিয়ে ললিতা উত্তর দিলো: এই তো খানিক আগে কালীঘাট থেকে ফিরে এলেন।

—কালীঘাটে!

—হ্যাঁ, ছেলে পাস করেছে বলে কালীমন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলেন।

পুজো দিতে গিয়েছিলেন বৌদি! ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে ভূপেশ নির্বাক হয়ে রইল। সমীর পাস করতে পারে নি, সেজন্যে ওঁর তাহলে এতটুকু দুঃখ নেই!···অনর্থক ওঁদের জন্যে খেটে মরছে ভূপেশ। না, ঠিকই করেছে ভূপেশ। নতুন দায়িত্বের মধ্যে না গিয়ে ঠিকই করেছে।···বালিগঞ্জের বাড়ীটা টাকার অভাবে আধা-খেঁচড়া হয়ে পড়ে আছে।···

কালীঘাটে সত্যিই গিয়েছিল রমলা।

সকালবেলায় ভূপেশের কথা শুনে মন যত খারাপই লাগুক না কেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই রমলা সেটা ঝেড়ে ফেলেছে।···বি.এ. পর্যন্ত পড়বার সুযোগই বা আজকাল কটা ছেলের ভাগ্যে জোটে ?

অনুপ ভালোভাবে পাস করলে কালীঘাটে পুজো দেবে মানত করেছিল রমলা। আজ-কাল করে পূজোটা দিয়ে আসতে পারে নি।

বারটার আগে কাজকর্ম সারা হয়ে গেছে। সকালে চা খেয়ে অনুপ বেরিয়ে গেছে—তখনও ফিরে আসে নি। একলা বসে থেকে করবেই বা কি !

মোক্ষদাকে সঙ্গে নিয়ে রমলা বেরিয়ে পড়লো—মায়ের পূজো ফেলে রাখতে নেই।

দুপুরবেলায় বাড়ী ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে অনুপ এসে চেপে ধরলো।—বেশ লোক, দিব্যি বেরিয়ে গেছ—যা বলে গেলাম—। অনুপের গলায় অভিযোগের সুর।

—কালীবাড়ী পূজো দিতে গেছলাম।—কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল রমলা, কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। স্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করলে—কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলে ?

রমলা হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে গেল—মুখে কথা যোগালো না।

—কথা বলছো না যে !···কাকা কি বললেন ?—মায়ের মুখের দিকে ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে অনুপ জিজ্ঞেস করলে আবার।

চুপ করে থাকা গেল না আর। সামান্য ইতস্তত করে রমলা উত্তর দিলো—এম.এ. পড়ে কি আর এমন লাভ হবে ?···তার চেয়ে বরং একটা—

কাকা ওকে চাকরি খুঁজে নিতে বলেছেন ? আহত-অভিমানে চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠলো অনুপের। দেখতে-দেখতে চোখ দুটো জলে ভরে এল।

রমলা বিপন্ন হয়ে পড়লো—আচ্ছা ছেলে, এত সামান্য কারণে কাঁদতে আছে ! আঁচলে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ছেলের মাথায়

হাত বুলায় রমলা। দেশ ছেড়ে চলে আসার পর থেকে ছেলেটা যেন কেমন হয়ে গেছে, কথায়-কথায় অভিমান।

ছল-ছল চোখে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অভিমান-ভরা গলায় বললে—বেশ, ঠিক আছে, চাকরি ঠিক না করে আমি আর এ বাড়ীতে ভাত খাবো না।

এবার রমলারও কান্না পেল। অনেক কষ্টে সামলে নিলে। অনুপের পিঠে হাত রেখে বললে—ছিঃ বাবা, কাকার উপর অভিমান করতে নেই।

অভিমান সত্যিই করে নি অনুপ।

চাকরিতে ঢুকবার পর থেকে ওর স্বভাবটা যেন বদলে গেছে! রমলার আশ্চর্য লাগে ওকে দেখে। অমন নিরীহ লাজুক প্রকৃতির ছেলে কেমন চটপটে হয়ে উঠেছে!

বাড়ী আর কলেজ ছাড়া সে এতদিন কিছুই জানতো না। ছুটি-ছাটায় যা একটু বেড়াতে যেত। সেই ছেলেকে আজকাল বাড়ীতে পাওয়াই ভার। মায়ের কাছেও দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না। অথচ মনে ওর কোন দুঃখ-অভিমান আছে বলেও বোধ হয় না। বেশ হাসিখুশি ভাব। তবে বেশি হাসিখুশি দেখায় অরবিন্দ এলে।... অরবিন্দ ওকে ভাইয়ের মতোই ভালবাসে।

সপ্তাহ খানেক বাইরে বেরুতে পারে নি অনুপ। সর্দি জ্বরে শুয়ে আছে। জ্বরটা কমে গেলেও মাথায় যন্ত্রণা আছে। বিকেলবেলায় ছেলের কাছে বসে রমলা তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ ডাক দিলে—অনুপ—

এক মুহূর্তে তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল অনুপের—বিছানায় শুয়েই উত্তর দিলে—এসো, ভেতরে এসো।

দোরগোড়ায় স্যাণ্ডাল খুলে রেখে অরবিন্দ ঘরে ঢুকলো। সাত-পুরানো স্যাণ্ডাল। গায়ের সার্ট-টাও পুরানো। ঘাড়ের কাছে কড়া মাড় দেওয়া ছেঁড়া-কলার থেকে সুতো বেরিয়ে পড়েছে। বুকে চারটে

বোতামের মধ্যে দুটো বোতামই নেই। বাড়ীতে মা নেই, কে আর লাগিয়ে দেবে সময়মত ?···মাতৃহারা ছেলেদের মুখের দিকে তাকালে মনটা যেন কেমন করে ওঠে রমলার।

চেয়ারে না বসে অরবিন্দ একেবারে অনুপের গা ঘেঁষে বসে পড়লো—খাটের উপর।—জ্বর হয়েছে ?

অনুপ মাথা নেড়ে সায় দিলে।

হাতে হাত রেখে অরবিন্দ ওর গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করলো। একটু চুপ করে থেকে অনুযোগের সুরে বলে উঠলো—আচ্ছা লোক, একটা খবর দিতে হয় !

—খবর দিয়ে কি হত ?—মৃদু হেসে অনুপ উত্তর দিলে : শান্তি-সেনাদের কি বন্ধুবান্ধবের খোঁজ নেওয়ার সময় আছে ?

ক্ষীণ একটা হাসির আভা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল অরবিন্দের মুখে। অন্যমনস্কভাবে অনুপের হাতটা নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে—শান্তি রক্ষার দায় যে সবার বাড়া অনুপ !

এমন আন্তরিকতার সঙ্গে সে কথাগুলো উচ্চারণ করলো যে অনুপের রোগা মুখখানাও আলো হয়ে উঠল—আবেগে, উৎসাহে।

অরবিন্দ আগের কথার জের টেনে বললে—মিল-মালিকেরা দাঙ্গাটা আবার কেমন পাকিয়ে তোলার তালে ছিল দেখ নি ?···গণ-সংগঠন জোরালো ছিল বলেই না—।

দাঙ্গার আগুন এখানেও ছড়িয়ে পড়লো শেষ পর্যন্ত ?···রমলার মুখে চিন্তার ছায়া পড়েছিল হয়তো।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ থেমে গেল হঠাৎ।

ওদের দুজনকে নিরিবিলিতে গল্প করার সুযোগ দিয়ে রমলা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ঘণ্টাখানেক বাদে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে সে যখন ঠাকুরঘর থেকে ফিরে এল, অরবিন্দ তখন চলে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, অনুপ খাটের উপর বসে দিব্যি বই পড়তে শুরু করেছে—মাথা ধরার কথা আর

মনে নেই ওর! অরবিন্দকে দেখলে সে অসুখের কথাও কি ভুলে যায়?

বাণী বেড়াতে এলেও অনুপ আজকাল এই রকম উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। অথচ মেয়েদের সম্বন্ধে বরাবরই ওর কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব ছিল। অল্পবয়সী কোন মেয়ের দিকে মুখ তুলে কথা বলতো না। ছেলের জন্যে তাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে রমলা।···বাণী ওদের স্বজাতি হলে আলাদা কথা ছিল। জাতিভেদ অবশ্য আজকাল মানুষ মানতেই চায় না।···কিন্তু দেখতেও তো কিছু সুন্দরী নয় মেয়েটি। অতি সাধারণ চেহারা, গায়ের রঙ অনুপের তুলনায় দস্তুর মত কালো। তবে লক্ষ্মীশ্রী আছে চেহারায়। বেশভূষাও খুব সাদাসিধে। ওদিকে একেবারেই খেয়াল নেই।···গয়না পরতে নাকি ওর লজ্জা লাগে। হাত দুখানা পর্যন্ত খালি। শাড়ীর পাড় তো নজরেই পড়ে না— আর একটু বড় পাড় দেখে শাড়ী কিনলেই পারে। অমন বিধবা বেশ ভালো লাগে না রমলার চোখে।

তবে স্বভাবটি বড় মিষ্টি বাণীর। হেসে ছাড়া কথা কয় না। রমলাকে দুদিনেই আপন করে নিয়েছে।··সবার সঙ্গেই ওর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার—ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গেও। অনুপের হাত থেকে সেদিন কেমন এক ছুটকায় টেনে নিলে খবরের কাগজখানা! এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করলো না! অনুপই বরং যেন লজ্জা পেয়ে গেল।····

না, সাদা মন মেয়েটির। ছুটির দিনে সে কখন-সখন এক-আধ ঘণ্টার জন্যে বেড়াতে আসে ওদের বাড়ীতে—সে-তো আগেও আসতো।···বেড়াতে এসে এখন অবশ্য বেশির ভাগ সময় রমলার ঘরেই বসে থাকে। অনুপের সঙ্গে গল্প করে। অনুপ ওকে কবিতা পড়ে শোনায়। কোনো কোনো দিন অরবিন্দও এসে যোগ দেয় ওদের আসরে। হাসি-গল্প বাণী বেশি করে কিন্তু অরবিন্দের সঙ্গেই। অরবিন্দ অনুপের মত লাজুক নয়।···

রমলার সন্দেহটা হয়ত একেবারেই অমূলক।

উনিশ শো পঞ্চাশ সাল। নভেম্বর মাস। নভেম্বর মাসেই ভূপেশ তার নতুন বাড়ীতে উঠে যাবে।

বালিগঞ্জের দেশপ্রিয় পার্কের কাছেই সে বাড়ী করেছে। নেহাত ছোটও নয় বাড়ীখানা। দোতলা বাড়ী, উপরে নীচে সব সুদ্ধ আট-খানা শোয়ার ঘর। ড্রয়িং রুম, ডাইনিং রুম, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বারান্দা, কল-বাথরুম নিয়েও কম জায়গা নেই। ললিতার বায়না রাখতে গিয়েও বাড়ীর সামনে কাঠা দুই জমি ছেড়ে দিতে হয়েছে। ললিতা নাকি সেখানে বাগান করবে—সব্জির নয়, ফুলের। বড়দার বাড়ীর বাগান দেখেই শখ হয়েছে। বাপের মৃত্যুর পর ওর দাদারা সবাই আলাদা আলাদা বাড়ী করেছেন। একান্নবর্তী পরিবারকে আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।...অর্থ নৈতিক কাঠামোই যে ভেঙ্গে গেছে তার।

কিন্তু স্নেহ-ভালোবাসা তো রাতারাতি উবে যায় না মন থেকে। আনন্দের দিনে মানুষ আত্মীয়স্বজন সবাইকেই কাছে পেতে চায়। একা একা কেউ আনন্দ করতে পারে কখনো?

গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ললিতা তাই কিছু জলযোগের আয়োজন করেছে—আত্মীয়-বন্ধু অনেককেই নেমন্তন্ন করেছে চায়ে।...শুধু চায়ে নেমন্তন্ন নয়, নতুন বাড়ী সাজানোর জন্যে সে ভূপেশের কাছে ইতিমধ্যেই ফার্নিচারের এক নতুন ফর্দ পেশ করে বসেছে। খরচের কথাটা একবারও চিন্তা করে না ললিতা।

যিনি চিন্তা করতেন তিনি তো এখন সম্পূর্ণ উদাসীন এসব ব্যাপারে।...অনুপ চাকরি নেওয়ার পর থেকেই বৌদি কেমন গম্ভীর হয়ে থাকেন।...ছেলের এম.এ পড়া হল না বলেই কি ক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন?...মানুষ সত্যি বড় অকৃতজ্ঞ। এই দুর্দিনের বাজারেও ভূপেশ বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়েছে অনুপকে। ভূপেশকে সাহায্য করার মত কেউ পিছনে নেই। নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা না ভেবেই বা সে পারে কি করে! ওদের সম্বন্ধে তার যে একটা নৈতিক দায়িত্ব

রয়ে গেছে। তা ছাড়া ললিতা অল্পদিনের মধ্যেই আর-একটি সন্তানের মা হতে চলেছে। ভবিষ্যতেও যে আরো দু-একটি সন্তানের মুখ দেখবে না তাই বা কে বলতে পারে!…

না, নতুন বাড়ী সম্বন্ধে রমলা একটা কথাও জিজ্ঞেস করেন নি। ভূপেশ নিজে যেচেই কথাটা তুলেছিল। বলেছিল—গৌরীকে আসতে লিখে দাও—গৃহপ্রবেশের দিন ওর উপস্থিত থাকা দরকার।

রমলা মোটেই গা করলেন না। নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন—কি হবে চিঠি লিখে। বুড়ো শাশুড়ীকে ফেলে ও তো আসতে পারবে না!—

ভূপেশের আশ্চর্য লাগে ওঁর ব্যবহারে। কিন্তু বৌদি আগে তো এমন ছিলেন না! কলকাতায় এসেও ওকে একটা আস্তানা করার জন্যে কত উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন—দেশের ভিটের সঙ্গে তো জন্মের মত সম্পর্ক চুকে গেছে, এখন এদিকে যাতে একটু জায়গা করতে পার তার চেষ্টা দেখ!

জায়গাটা অবশ্য বছর পাঁচেক আগেই কিনে রেখেছিল ভূপেশ—সস্তা দরেই। জমি সত্যি জননীর মত বিশ্বস্ত—মানুষকে ঠকায় না কখনও।…টাকার অভাবেই এতদিন বাড়ীর কাজ শেষ করতে পারেনি ভূপেশ।

কিন্তু রমলার উৎসাহ হঠাৎ এমন পড়ে গেল কেন?…ললিতার নামে বাড়ীটা করার জন্যেই কি—!

বুদ্ধিটা কিন্তু ললিতার নয়, ললিতার বড়দার। কথাটা তিনি ঠিকই বলেছেন; ললিতার নামে বাড়ীটা থাকলে ভবিষ্যতে ওটা নিয়ে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কোন গোলমালের সম্ভাবনা থাকবে না।…

সন্ধ্যাবেলায় একলা ঈজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল ভূপেশ; ললিতা নিঃশব্দে এসে সামনে দাঁড়াল—হাতে এক গাদা নেমন্তন্নের কার্ড।

কার্ডগুলো টেবিলের উপর রেখে বললে—ফার্নিচারগুলো এখনও এসে পৌঁছুল না।…গৃহপ্রবেশের আগে পাওয়া যাবে তো?

—হুঁ।—সংক্ষেপে জবাব দিয়ে ভূপেশ চায়ের ফরমাস করলো নেশার মধ্যে ওর ঐ একটি মাত্রই নেশা।

ললিতা খোশমেজাজেই ছিল। সস্নেহ শাসনের ভঙ্গিতে বললে—এই কিন্তু লাস্ট কাপ—সকালের আগে আর চা পাবে না বলে রাখছি।

নেমন্তন্নের চিঠিগুলো ভূপেশের সামনে রেখে চলে গেল সে। বেয়ারাকে চায়ের ফরমাস করে মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরে এল আবার। ভূপেশ তখন চিঠিতে ঠিকানা লিখতে শুরু করে দিয়েছে আত্মীয়বন্ধুদের।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

চেয়ারে ভূপেশের মুখোমুখি হয়ে বসেছিল ললিতা। চায়ে হালকা চুমুক দিয়ে ভূপেশ বললে—তোমার লিস্ট-টা পেলে ভাল হতো। মোট কত জনকে বলতে চাও?

একটু ভেবে ললিতা উত্তর দিলে—নেমন্তন্নের ভারটা তুমি আমার উপর ছেড়ে দিতে পার।

চায়ের কাপে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে ভূপেশ হাসলো একটু। বললো—নেমন্তন্নের ভারটা না হয় তুমি নিলে, খরচার ভারটা নেয় কে?

কথাটা শুনে ললিতার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। অভিমানের সুরে বললে—গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে মানুষ কত ঘটা করে, সামান্য একটু চায়ের আয়োজন করেছি, তা নিয়েও নানারকম কথা।

—নানারকম কথাটা হল কোথায়?—ভূপেশ রসিকতার ছলে বললে: কথা তো একটাই বললাম—টাকার কথা।

ললিতা তবু হাসতে পারলো না। গম্ভীর হয়েই রইল। খানিক পরে হঠাৎ বলে উঠলো—সর্বক্ষণ হিসেব আর হিসেব। ঘুমের মধ্যেও বোধ হয় তুমি টাকা-পয়সার কথা ভাবো?

আগে এসব কথা শুনলে ভূপেশ রেগে যেত। বলতো—হ্যাঁ, ভাবি বই কি! ভাবতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাকে টাকা রোজগার করতে হয়, তাকে ভাবতে হয়।

আজ কিন্তু একটুও রাগ হল না। বরং কৌতুকবোধ করলো। হেসেই উত্তর দিলে—তা নইলে কি আমাদের মত লোক বালিগঞ্জে বাড়ী তুলতে পারে ?

ললিতার দিকে তাকালে এখন সত্যি মায়া লাগে। মাতৃত্বের লক্ষণ ওর দেহে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

না, ললিতার সঙ্গে এখন কিছুতেই ঝগড়া করা চলে না। ওকে খুশি করার জন্যেই ভূপেশ বললে—তোমার টাকা তুমি যেভাবে খুশি খরচ করবে।...সমীরকে বিলেত পাঠাতে হবে বলেই না এত চেপে চেপে খরচ করছি।

সাপের মাথায় যেন ধুলোপড়া পড়লো। রাগ জল হয়ে গেল ললিতার। হেসে বললে—বসে-বসে গল্প করার আমার সময় নেই। হাতে মাত্র একটি সপ্তাহ। জিনিসপত্র এখনও সব গুছানো হয় নি।

ধীর-মন্থর পায়ে ললিতা আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এক হাতে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ললিতা। নতুন করে সংসার পাতানো কি সহজ কথা !

পুরানো বাড়ি ছেড়ে বালীগঞ্জের বাড়ীতে উঠে এসেছেন মানসীর বাবা। আগের বাড়ীটার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না এ বাড়ীর। সামনে ছোট্ট ঐ ল্যানটুকুর জন্যেই বাড়ীর চেহারা বদলে গেছে। মানসীর বাবা তো প্রথমে রাজীই হচ্ছিলেন না—মা জেদ ধরলেন বলেই না—

বিকেলবেলায় মানসী আজকাল এই ল্যনেই পায়চারি করে—বাইরে বড় একটা বের হয় না।...বেড়াবার সময়ই বা কোথায় ? ফাইন্যাল পরীক্ষা তো এসে গেল বলে।

মলিদির কাছেও আজকাল আর বাজনা শিখতে যায় না সে।

মলিদির ওখানে না গেলেও সুবোধের সঙ্গে কিন্তু দেখা হয়। সুবোধ এখন প্রায়ই বেড়াতে আসে ওদের বাড়ীতে।

হ্যাঁ, বিকেলবেলায় আজ সুবোধের জন্যেই অপেক্ষা করছিল মানসী। মাঘ মাস। উপভোগ্য ঠাণ্ডা পড়েছে। গরম কোট গায়ে চড়িয়ে ল্যনে পায়চারি করছিল সে। দৃষ্টিটা ছিল রাস্তার দিকে। সুবোধ এখনও আসছে না কেন? মানসী আর সমীরকে নিয়ে আজ সন্ধ্যার শো-তে সিনেমায় যাবার কথা। উৎসাহটা বেশি সুবোধেরই। পড়ার ক্ষতি করেও মানসী তাই যেতে রাজী হয়েছে। কিন্তু যে নিয়ে যাবে, তারই তো দেখা নেই।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল—সমীরকে কতক্ষণই বা আর ধরে রাখা যাবে। কাজের ছুতো করে সে এক্ষুণি হয়তো বেরিয়ে পড়বে বাড়ী থেকে। মানসীর তাহলে কি আর সিনেমায় যাওয়া হবে?··· মা রাজী হলেও সুবোধের সঙ্গে একলা ছেড়ে দিতে বাবা রাজী হবেন না কিছুতেই।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বিকেলের আলো মিলিয়ে গেল একসময়। সিনেমার যাবার সময়ও উত্তীর্ণ হল।···না, ওঁর সঙ্গে জীবনে আর কোনো অ্যাপয়েন্ট্‌মেণ্ট করবে না মানসী।

উত্তেজনার ঝোঁকে জোরে-জোরে পায়চারি করছিল সে। পিছন ফিরেই একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল অরবিন্দর। হঠাৎ চমকে উঠেছিল— আপনি!

—হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।—অরবিন্দ একটু হাসলো যেনঃ আর কাউকে আশা করেছিলেন বুঝি?

কথা শুনে রাগ ধরে গেল—ভুরু কুঁচকে মানসী অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

—অনুপ বাড়ীতে আছে?

—না।—অন্যদিকে তাকিয়েই গম্ভীর মুখে উত্তর দিল মানসী।

—একটু অপেক্ষা করা যাক, কেমন?

—আপনার খুশি।

আশ্চর্য লোক, বাগানেই বসে পড়ল! ঘরে গিয়ে বসতে কি

দোষ হয়েছিল ? অনুপদা না থাক, তার মা তো বাড়ীতেই আছেন।··· মানসী নিজের মনে একটু বাগানে বেড়াবে তারও উপায় নেই।

বিরক্ত হয়েই মানসী এগিয়ে গেল গেটের দিকে। মীরাদের বাড়ী থেকেই ঘুরে আসা যাক। মানসীর ক্লাসফ্রেণ্ড মীরা—ওদের পাড়াতেই থাকে।

ফটক পেরিয়ে রাস্তায় এসে নামলো মানসী। রাস্তায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল—যাবে, কি যাবে না ? সুবোধ যদি এসে পড়ে ? এলে এতক্ষণেই আসতো।···কথা দিয়ে যখন কথা রাখতে পারে না, মানসীরই বা কি দায় পড়েছে।

মানসী সোজা এগিয়ে চললো। দু পা যেতে না যেতেই আবার অরবিন্দের সঙ্গে দেখা। দেখা হলেও অরবিন্দ কথা বললে না, মানসীর পাশ দিয়েই হনহন করে বেরিয়ে গেল। এই না বললো, অনুপের জন্যে অপেক্ষা করবে!

অদ্ভুত লোক। অহঙ্কারীও। কেমন একটা ব্যান্টারিং টোনে কথা বলে।···অনুপদা কোত্থেকে যে এই বন্ধুটিকে আমদানি করলো!

মীরাদের বাড়ীতে গিয়ে মীরার দেখা মিললো না। মানসী তখুনি চলে আসছিল। কিন্তু ওর মা আসতে দিলেন না। বললেন—একটু বোস, মীরা এখনি এসে পড়বে।

মানসীকে বসিয়ে রেখে তিনি রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। একলা ঘরে মানসী বসে রইল চুপচাপ। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সুবোধ হঠাৎ যদি এসে পড়ে ?··আচ্ছা জব্দ হবে, এসে যখন দেখবে ওর জন্যে অপেক্ষা না করেই—

—কখন এলি ?—মীরার গলার আওয়াজে মানসীর চমক ভাঙ্গলো। মীরা কখন এসে ওর পাশের চেয়ারখানি অধিকার করে বসেছে, সে খেয়ালও করে নি।

—কি ভাবছিলি এত ?—মীরা জিজ্ঞেস করলে।

মৃদু হেসে মানসী উত্তর দিলে—একজনের কথা।

—লোকটি কে ?

মানসী চুপ করে রইল—ভীষণ লজ্জা লাগছিল।

—নাম বলতে নিষেধ আছে ? মীরা দুষ্টুমির হাসি হাসলো।

নিষেধ না থাকলেও ওর নাম কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারলো না মানসী। তবে আসল কথাটা চেপে রাখতে পারে নি। যা চালাক মেয়ে মীরা, প্রশ্ন করে সব কথা জেনে নিলে।···

—তোকে বুঝি সে ভালোবাসে ?

—জানি না।

—তাই বল্! মীরার মুখে ঠাট্টার হাসিঃ ভালোবাসায় পড়েছিস ?

—মোটেই না। মানসী তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলোঃ অমন লোককে কেউ আবার ভালোবাসতে পারে ?···একটা কথারও যার ঠিক নেই—

মীরার কাছে সব কথাই আস্তে আস্তে বলে ফেললো মানসী। শুধু একটি কথা ছাড়া—একলা পেয়ে সেদিন সুবোধ ওর গালের টোল লক্ষ্য করে যে কথাটা বলেছিল। মনে হলে লজ্জায় এখনও ওর কান গরম হয়ে ওঠে।

মীরার কাছে কথাগুলো বলে মনটা যেন অনেক হালকা হয়ে গেল মানসীর। বাড়ীতে কার কাছেই বা ওর কথা বলবে। একটা সমবয়সী বোন বা বৌদিও নেই!

যে পায়ে এল, সেই পায়েই ফিরে গেল সুবোধ। মানসী বেড়াতে গেছে শুনেই মেজাজটা যেন বিগড়ে গেল ওর—পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করলো না!

সুবোধকে ধরে রাখার জন্যে ললিতা কত চেষ্টাই না করলো! বললে—এই তো তোমার জন্যে এতক্ষণ ঘর-বার করছিল, হঠাৎ আবার গেল কোথায়!···কাছে-পিঠে কোথাও হয়ত গেছে, এখুনি এসে পড়বে।

—আজ যাই, আর একদিন আসা যাবে। বলেই যাবার জন্যে পা বাড়ালো সুবোধ।

—চা খেয়ে যাও।

—একটু কাজ আছে।

ললিতার অনুরোধ উপেক্ষা করেই সুবোধ চলে গেল। ললিতা অপমান বোধ করলো বই কি।

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো ভজুয়ার উপর। ঐ বেটাই তো যত গোলমাল বাধালো। তোর বাবা অত সর্দারি করতে আসা কেন! দিদিমণি অরবিন্দবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গেছেন। তোর কাছে কে জানতে চেয়েছে এসব খবর?

ভজুয়ার মুখে এই কথাটা না শুনলে সুবোধ হয়ত এমনভাবে চলে যেত না।

ভূপেশ তখনও বাড়ী ফেরে নি। রাগ করেই ললিতা দোতলায় উঠে এল। এসেই হাঁপিয়ে পড়লো।

হাসপাতাল থেকে ফিরে অবধি ললিতা আর সুস্থ হতে পারে নি। ...ছেলেটাও বাঁচলো না—হাসপাতালেই মারা গেল।...ললিতার জীবন নিয়েও টানাটানি চলেছিল—।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকে বিছানায় চিত হয়ে পড়লো ললিতা।... এই ভবঘুরে অরবিন্দ ছোকরাটার সাহসও তো কম নয়। বলা নেই, কওয়া নেই, মানসীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল!...মানসীই বা ওর সঙ্গে গেল কেন? ছোঁড়াটাকে সে পছন্দ করে বলে তো মনে হয় না। করা সম্ভবও নয়। যেমন চেহারা, তেমন আচার-ব্যবহার। ছোকরার ব্যবহারে কখনও ভদ্র রুচির পরিচয় পায় নি ললিতা। রাঁধুনীর ছেলে, ভদ্ররুচি ওর আসবেই বা কোত্থেকে?...মায়ের মনিব দয়া করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তাই। না হলে ওকে হয়ত কুলিগিরি করেই খেতে হত।...অনুপও বন্ধুত্ব করার মত আর ছেলে পেল না কলকাতা শহরে!

অনুপকে শুধু দোষ দিয়ে কি হবে! বারীনবাবুর ওখানেও যাতায়াত আছে ছোকরার। যায় অবশ্য বাণীর আকর্ষণেই। মেয়ের দিকে একেবারেই দৃষ্টি নেই বাপের। ইজিচেয়ারে বসে সর্বক্ষণ রাজা-উজীর মারছেন।

বিছানা ছেড়ে ললিতা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো। মেয়েটা সত্যি গেল কোথায়! লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বসেছে। বলি, তোর বাপের তো একটা মানসম্ভ্রম আছে!

মানসম্ভ্রম কি মানসীরই নেই? অরবিন্দর সঙ্গে বেড়াতে যাবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না।···

মীরাদের বাড়ীতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল। দেরি তো সে ইচ্ছে করে করে নি। আরও আগে চলে আসছিল, মীরার মা আসতে দিলেন না। চা-খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না কিছুতেই।

জোরে পা চালিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাড়ী পৌঁছে গেল মানসী। না, সদর দরজায় কোনো গাড়ী দাঁড়িয়ে নেই। কেউ আসে নি তাহলে!

ল্যন পেরিয়ে মানসী বারান্দায় গিয়ে উঠলো। বারান্দায় এক কোণে নিরিবিলিতে বসে ভজুয়া খৈনী খাচ্ছিল, মানসী তার কাছে এগিয়ে গেল। গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেউ এসেছিল?

—হ্যাঁ, সেই গাড়ীওয়ালা বাবু—। ভজুয়া উত্তর দিলে। মানসী দোতলায় উঠে এল। মায়ের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মা ধমকে উঠলেন—কোথায় গিয়েছিলি?···সুবোধ রাগ করে চলে গেল—

মানসীরও রাগ ধরে গেল। এসেই চলে গেলেন—একটু বসতে পারলেন না!····

সুবোধের ব্যবহারে আগে কিন্তু এমন রাগ হত না। একটু হেসে কথা বললেই খুশি হয়ে যেত। তখন তো ভাব হয় নি সুবোধের সঙ্গে। ভাব হবার পর থেকেই কেন যেন বেশি রাগ হয় ওর উপর।

নিজের ঘরে ঢুকে খাটের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো মানসী। বই নিয়ে বসতে ইচ্ছে করলো না। সুবোধের জন্যে আজ সন্ধ্যেটাই মাটি হয়ে গেল।…নিজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে পারেন না, তার উপর আবার মেজাজ দেখানো। চলে গেছেন, চলে গেছেন তো বয়ে গেছে!

মেয়ের এমন মনমরা ভাব কোনদিনও দেখে নি ভূপেশ। সন্ধ্যার পর মেয়ের মায়ের কাছেই তাই সে জানতে চাইলো কারণটা—মানসীর কি হয়েছে বল তো? কেমন যেন চুপচাপ—

মুচকি হেসে গলার স্বর খাটো করে ললিতা বললে—ওদের এখন অভিমানের পালা চলেছে।….ভালোবাসায় পড়লে সবারই ওরকম হয়ে থাকে।

কথাটা শুনে ভূপেশের হাসি পেয়ে গেল। হেসেই বললে—এ ব্যাপারে তুমি অবশ্য একটা অথরিটি।—বিয়ের আগেকার সব কথাই তো জানে ভূপেশ। ভূপেশের সঙ্গে তখনও বিয়ে ঠিক হয় নি। ওদের কলেজের সেই যে নলিনাক্ষ ললিতার পিছনে কি ঘোরাঘুরিই না করেছিল দিন কতক। ললিতা কোনদিনই পছন্দ করতো না তাকে। একটু খেলিয়েছিল মাত্র।…অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে দেখলে ছেলেগুলো কি হ্যাংলামিই না করতে পারে!

অসমাপ্ত কথার জের টেনে ভূপেশ বললে—বেচারা নলিনাক্ষর জন্যে সত্যি আমার খুব দুঃখ হয়েছিল…ছেলেবেলায় তুমি ভারি দুষ্টু ছিলে।

—এখন তো লক্ষ্মী হয়েছি।

ললিতা মুখ টিপে হাসলো। হাসলে ওর গালে সুন্দর একটা টোল পড়ে। ভূপেশ লোভ সামলাতে পারলো না, এদিক ওদিক দেখে নিয়েই—

খুশি হলেও ললিতা ঠেলে সরিয়ে দিলে ভূপেশকে।—কি যে কর—

সলজ্জ মুখ নীচু করে কি যেন ভাবলো একটু। তারপর ভুরু

কুঁচকে কৃত্রিম অভিমানের সুরে বললে—তুমিও আমাকে কম জ্বালাও নি।—বিয়ের ভয়ে আমাদের বাড়ীতে আসাই তো বন্ধ করে দিয়েছিলে—যা রাগ হয়েছিল—ভেবেছিলাম—

আশ্চর্য অভিমান! এক যুগ আগের সেই ঘটনাটা আজও মনে করে রেখেছে!

স্মিতমুখে ললিতার দিকে তাকিয়ে ভূপেশ বললে—এত আগে থেকেই আমার কথা ভাবতে শুরু করেছিলে? কোনদিন বল নি তো?

—বলে লাভ? একটু চুপ করে তেমনি অভিমান-ভরা গলায় ললিতা বললে—ভালবাসার কথা শুনবার তখন একজনের সময় ছিল?

সময় সত্যিই ছিল না ভূপেশের। গরীব লোকের ভালবাসার কথা শুনবার সময় থাকে না।

ভূপেশকে নিরুত্তর দেখে ললিতা আবার সুবোধের কথা তুললো। আচমকা গম্ভীর হয়ে বললে—দু' সপ্তাহের উপর সুবোধ আসে না, সন্ধ্যে থেকে মেয়েটা তাই মুখ কালো করে থাকে—

ললিতার আরও কিছু হয়ত বলার ছিল, বলতে পারলো না। মোক্ষদা এসে বাধা দিলে—নীলিমা মাসিমা বেড়াতে এসেছেন। খবরটা শুনেই ললিতা বেরিয়ে গেল ব্যস্ত হয়ে।

শোবার ঘরে ভূপেশ একলাই বসে রইলো। সুবোধ আসে না কেন? পাত্রটি মনের মতই—অত বড় ঘরে মেয়ে দেবার কথা ভূপেশ ভাবতেও পারতো না।···আলাপ হবার পর থেকে সুবোধকে কিন্তু ভালই লাগে। অদ্ভুত পরিশ্রমী ছেলে! নিজে উদ্যোগী না হলে পৈতৃক টাকা থাকলেও কিছু হয় না। মদ, নেশা করেই উড়িয়ে দিতে পারে। বাপের মৃত্যুর পর থেকে ব্যবসার কাজকর্ম সুবোধ নিজেই দেখাশুনা করে—অন্যের উপর ছেড়ে দেয় নি।···দু' দুটো কাপড়ের মিল চালানো কি সহজ কথা!···

ললিতার পছন্দ আছে বলতে হবে। কিন্তু ছেলেটি হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিলো কেন?···বিয়ের কথাটা পাকাপাকি ঠিক করে

ফেললেই ভালো করতো ললিতা। নিজে থেকে উত্থাপন করতে হয়ত সঙ্কোচ বোধ করছে।

—একটু সবুর কর।···প্রস্তাবটা ছেলের তরফ থেকে আসাই তো ভালো।—ললিতা যুক্তি দেখিয়েছে।

কিন্তু বিয়ে স্থির না করে ওদের অতটা মেলামেশা করতে দেওয়া—। কাঁচা বয়েস। ললিতার এসব দায়িত্বজ্ঞান নেই একেবারেই।···সুবোধ ওর মেয়ের রূপ দেখে ভুলে গেছে, এতেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের চোখের নেশা আজ আছে, কাল না-ও তো থাকতে পারে! না, বড় ছেলেমানুষের মত কাজ করেছে ললিতা।

যাই হক, একটা খবর নেওয়া উচিত। একলা মানুষ, অসুখ-বিসুখও তো করতে পারে।

শুধু শুধু মন খারাপ হয় নি মানসীর—যথেষ্ট কারণ আছে। দু' সপ্তাহের উপর সুবোধ ওদের বাড়িতে আসে না। কি হল হঠাৎ? রাগ করেছে নিশ্চয়। সারা দুপুর বই নিয়ে বসে থাকলেও পড়ায় আজ কিছুতেই মন বসলো না মানসীর।

অনর্থক বই কোলে করে বসে থেকে লাভ?

বিকেল হতে না হতেই তাই বই রেখে উঠে পড়লো সে। আয়নায় নিজের চেহারাটা চোখে পড়লো। উঃ, কি বিশ্রীই না দেখাচ্ছে ওকে। হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলে মানসী। তারপর নীচে নেমে বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বসলো। বাড়ীর সামনে সিঁড়ির দুটো পাশ মানসীর মা এর মধ্যেই ফুলের টব দিয়ে সাজিয়ে ফেলেছেন। নানা রঙের বিলিতি ফুল। বিলিতি ফুলের দিকেই বেশি ঝোঁক ওঁর। গন্ধ নেই, শুধু রঙের বাহার। বাড়ীটাকে যেন আলো করে রেখেছে। ফুলের শখ মানসীরও কম নয়। সকাল-বিকালে পড়ার-ফাঁকে সে এসে এই গাছগুলির তদারক করে।

ফুলগুলি আলোয় হাসে, হাওয়ায় দোল খায়—পৃথিবীর আলো-হাওয়ার সঙ্গে যেন কতকালের মিতালি ওদের।…

আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হল—নিঝুম-নিঃসঙ্গ সন্ধ্যে। বাড়ীটাও নিঝুম—রূপকথার ঘুমন্ত পুরীর মতন। মানসীর বাবা তখনও ফিরে আসেন নি। মা দোকানে গেছেন কেনাকাটা করতে। বড়মা থাকা, না থাকা সমান। সন্ধ্যে হলেই তো তিনি ঠাকুর ঘরে গিয়ে জপের মালা নিয়ে বসে যান। অনুপ আর সমীর? বিকেলবেলায় ওরা না বেরিয়ে থাকতে পারে?

শীতের কুয়াশা-মাখা আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে ছিল মানসী। সুবোধ হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো ওর। অনেকদিন পরে দেখা। বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় মানসী—মুখে কথা সরে না।

অন্য একটা চেয়ারে মানসীর মুখোমুখি হয়ে বসে পড়লো সুবোধ। হেসে বললে—এমন তন্ময় হয়ে কোন্ ভাগ্যবানের কথা ভাবছিলে জানতে পারি কি?

মানসী চুপ করে রইলো।

স্মিত হেসে সুবোধ বললে—সেদিন কতক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেলাম। শুনলাম, অনুপবাবুর বন্ধুর সঙ্গে নাকি বেড়াতে বেরিয়েছ। তাই আর বিরক্ত করতে আসি নি।

অনুপদার বন্ধু? অরবিন্দ? অরবিন্দর সঙ্গে বেড়াতে গেছল সে? কথাগুলো শুনে মানসী শুধু বিস্মিত হল না, রেগেও গেল। মিথ্যা দোষারোপ করলে কার না রাগ হয়!

মানসীর রোখ চেপে গেল। বললে—আসেন নি—ভালই করেছেন।

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করে রইল। সুবোধই শেষ পর্যন্ত মানসীর রাগ ভাঙ্গালো। বললে—ইউ লুক্ ভেরি বিউটিফুল—রাগ করলেই তোমাকে সব থেকে বেশি সুন্দর দেখায়—

রাগতে গিয়েও মানসী হেসে ফেললো। সুবোধ এমনভাবে কথা বলে যে ওর উপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায় না।

—ভেতরে গিয়ে বসা যাক্, কেমন? সুবোধ প্রস্তাব করলো।

সুবোধকে নিয়ে সোজা দোতলায় উঠে এল মানসী। একতলায় আর কেউ না থাকলেও ঝি-ঠাকুর-চাকর ওরা তো আছে। নিরিবিলি বসে গল্প করার উপায় নেই।

মানসীর ঘরে ঢুকে চেয়ারে আরাম করে বসলো সুবোধ।

মানসীর দিকেই তাকিয়ে ছিল সে—হাসিমুখে।

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে অভিমানের সুরে মানসী বললে—আর কথাই বলবো না, ঠিক করেছিলাম।

—অপরাধ?

—মিথ্যে অভিযোগ করলে কার না রাগ হয়?—অভিমানের ভাবেই মানসী বললেঃ অনুপদার বন্ধুর সঙ্গে আমি কবে আবার বেড়াতে গেলাম?

—ও যাও নি তাহলে?—মিষ্টি হেসে সুবোধ বললে। পরক্ষণেই কেমন গম্ভীর হয়ে পড়লো। বললে—ব্যাপারটা কি জান? লোকটিকে আমার একেবারেই ভালো লাগে না।

একটু কি যেন ভাবলো। তারপর বললে—ছোটলোকগুলোর মাথায় ওরাই তো যত সব দুর্বুদ্ধি ঢুকিয়েছে—লোকগুলোর আস্পর্ধা তাই তো এত বেড়ে উঠেছে হঠাৎ।

—কাদের আবার আস্পর্ধা বেড়ে গেল? হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করলো মানসী।

সিগারেট দেশলাইয়ের বাক্সে ঠুকতে ঠুকতে সুবোধ বলে—ঐ যাদের তোমরা কুলি-মজুর বলে থাক। লোকগুলো এখন আর খাটতে চায় না, কথায় কথায় ধর্মঘটের হুমকি দেখায়।

—কিন্তু ওদের দাবি মিটিয়ে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।

সিগারেটে টান দিয়ে সুবোধ উত্তর দেয়—ওদের দাবি মেটানো?

…অসম্ভব! দাবির ওদের শেষ আছে? একবার সুতো আলগা করেছ কি—

প্রশ্নভরা চোখে মানসী তাকিয়ে থাকে সুবোধের দিকে।

বিদ্রূপের সুরে সুবোধ বলে যায়—মজুর এখন আর মজুরিতে খুশি নয়—মিলের লাভের অঙ্কেও ভাগ চাই। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে—লাভটা নাকি ওদের প্রাপ্য—ওদের ঠকিয়েই শিল্পপতিরা নাকি সেটা নিজেদের পকেটস্থ করছে।

বলেই হো হো করে হেসে উঠলো সুবোধ।

মানসী ওর কথাগুলো নিয়ে ভাবতে থাকে। সুবোধ সেদিকে খেয়ালও করে না। সিগারেটের বাকি অংশটুকু ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে বলে—কবে সিনেমায় যাবে বল?…শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়।

আর কেউ নয়! একলা মানসীকে কি ছেড়ে দেবেন মা-বাবা?…

মোক্ষদা চা রেখে যায়। চা খাওয়া শেষ হলেই সুবোধ হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যাবার জন্যে।

—এবার যেতে হবে, জরুরি কাজ রয়েছে।

—রোজই জরুরী কাজ! মানসীর কথায় অভিমান প্রকাশ পায়।

সুবোধ মৃদু হাসলো। বললে—কাল বিকেলেও একটা জরুরি অ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট্‌ রয়েছে, ছটার আগেই বেরুতে হবে বাড়ী থেকে।

—শুনে আমার লাভ?

—লাভ নেই?…কিন্তু যার কাছে আসবো তাকে বলে যেতে হবে না?

দুষ্টুমির হাসি হেসে সুবোধ আচমকা এগিয়ে এল মানসীর কাছে। দু'হাতে ওর মুখখানা তুলে ধরে—

লজ্জায় মরে গেলেও মানসী বাধা দিতে পারলো না।

বাপ-মা একমাত্র সন্তানকে সাধারণতঃ যেরকম আদর দিয়ে

থাকেন, বাণীর বাবা কিন্তু কোনদিনই তেমন আদর দেন নি বাণীকে।
বলতে গেলে তিনিই তো একাধারে ওর মা-বাপ। জন্মের পরেই মাকে হারিয়েছে বাণী।

বাচ্চা মানুষ করা কি ওর বাবার পক্ষে সম্ভব!···মাসীর কাছেই মানুষ হয়েছে বাণী। বরানগরে মাসীর বাড়ী।

ফাঁক পেলেই বাণীর বাবা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন।

দূরে থাকলেও ওঁর প্রভাব কোনদিনও কম ছিল না বাণীর উপর।
·· কোনরকম মানসিক দুর্বলতা দেখলেই হয়েছে!···

বাণীর বয়স তখন কত? বছর বার? দিল্লী থেকে দিদিমা চিঠি লিখলেন কান্নাকাটি করে—বাণীকে একবার দেখতে চান। শরীর সত্যিই ভেঙ্গে পড়েছিল তাঁর, কবে মরে যান ঠিক নেই।

চিঠি পড়ে বাণীর মনটাও অস্থির হয়ে উঠেছিলো—বুড়ো মানুষ কিছু বলা যায় না।

স্কুলে তখন ছুটি চলেছে। বাবা দিল্লীর টিকিট কেটে নিয়ে এলেন, একখানাই।

—একলা যাবো নাকি? আশ্চর্য হয়ে বাণী জিজ্ঞেস করেছিল।

—ভয় পাচ্ছো। বাণীর বাবাও যেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন: বিংশ-শতাব্দীর মেয়ে হয়ে তুমি একলা চলতে ভয় পাও?

—কিন্তু—। বাণী সামান্য আপত্তি জানাতে যাবে, বারীন থামিয়ে দিলেন ওকে—কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই এর মধ্যে, টিকিট কাটা হয়ে গেছে, সোজা গিয়ে গাড়ীতে চড়ে বসবে। দিল্লী পৌঁছে দেওয়া? সে তো রেল কোম্পানির দায়িত্ব।···

অল্প বয়স থেকেই তাই বাণীর একা চলাফেরা করার অভ্যাস।

বাবার কাছে একদিন দু'দিন করে প্রথমে থাকতে শুরু করেছিল বাণী, ক্লাস নাইনে উঠে স্থায়িভাবেই থেকে গেল।

একা একা ওর বাবার বেশ কষ্টই হচ্ছিল—চাকর-বাকর কি সব বুঝে করে উঠতে পারে?

বাণী কাছে থাকায় খুশিও কি হন নি?

হয়েছেন বই কি! মুখে অবশ্য স্বীকার করতে চান না।···

বেশ রাত করেই আজ বাড়ী ফিরেছে বাণী। বিকেলবেলায় মাসীর ওখানে গিয়ে আটকে পড়েছিল।···

সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ করে পাড়ায় কি হইচই-টাই না হল! হাতাহাতি থেকে শুরু। তারপর লাঠি, সোডার বোতল নিয়ে দস্তুর মত লড়াই আর কি! শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে মীমাংসা করলো।···

বাণীর মেসোমশাই তো বাণীকে বাড়ী থেকে বেরুতেই দেবেন না। অসুখে ভুগে ভুগে কেমন নিউরটিক হয়ে উঠেছেন—সব তাতেই ভয় পান।

ভয় বাণীর বাবাও কিছু পেয়েছিলেন। তা নইলে অমন করে পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবেন কেন? গোলমালের খবর তাঁর কানে এসেও পৌঁছেছিল। বাণী ঘরে ঢুকতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আমি তো ভাবছিলাম, তুমি বুঝি আজ ফিরলেই না।

—না ফেরারই কথা ছিল। বাণী সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে ফেললো।

বারীন নির্বাক হয়ে কথা শুনছিলেন।

বাণী বলে—মেসোমশাই তো কিছুতেই আমাকে একলা আসতে দিচ্ছিলেন না। যা ভীতু, সবাইকে সাবধান করে বেড়ান, কিন্তু ছেলে-মেয়ে কেউ এখন আর ওঁর কথা শোনে না।

একটা কথা মনে পড়ে ভারী হাসি পেয়ে যায় বাণীর। বারীনের দিকে চেয়ে হেসে বলে—মেসোমশায় কি বলেছেন জানো?

উৎসুক চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বারীন।

বাণী হাসতে হাসতে বলে—আমি নাকি তোমার মত একগুঁয়ে হয়েছি—তোমাকে অনুকরণ করার নাকি চেষ্টা করছি।

বারীন প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকেন—না, না, অনুকরণ করতে যেও না কাউকে—বাপকেও নয়।···ও ব্যাপারটা চিত্তবিকাশের

মোটেই সহায়ক নয়।—স্থির দৃষ্টিটা বাণীর মুখের উপর তুলে বলেন—আপন মনের স্বাধীনতা না থাকলে চিত্তের বিকাশ হবে কি করে?

হ্যাঁ, মনোবিজ্ঞান নিয়ে বারীন অনেক পড়াশুনা করেছেন বই কি! শুধু মনোবিজ্ঞান নয়, সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধেও ওঁর অগাধ জ্ঞান। ফুরসত পেলেই এসব নিয়ে তিনি বাণীর সঙ্গে আলোচনা করেন।

কিন্তু ফুরসত পাচ্ছেন কোথায়? য়ুনিভারসিটি থেকে ফিরেও তো সেই বই নিয়ে বসে যান। সকালের দিকে যেটুকু সময় থাকে তা-ও রাজনীতির আলোচনাতেই কেটে যায়।

ছুটির দিন সকালে বৈঠকখানায় লোকজন আসার যেন বিরাম নেই। কতরকম লোকই না আসে!···অরবিন্দ প্রায়ই এসে যোগ দেয় এই আসরে। চিন্তাধারায় সে বারীনেরই সমগোত্রীয়—শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী।

ছেলের বয়সী হলেও সে বন্ধুর মতই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে। এটা অবশ্য বাণীর বাবারই গুণ, অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেও তিনি বন্ধুর মত ব্যবহার করেন। তবে অরবিন্দর সম্পর্কে কি একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই?

আছে। থাকাই স্বাভাবিক। হাসি-খুশি সরল স্বভাব অরবিন্দর। বয়সে বাণীর চেয়ে কিছু বড়ই হবে। ব্যবহার কিন্তু সমবয়সীর মতই। নিজে যেচে এসেই আলাপ করেছিল প্রথম।···

বছর খানেক আগেকার কথা।

ছুটির দিন, সকালবেলায় রান্নাঘরে রামলালকে রান্না দেখিয়ে দিচ্ছিল বাণী, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাণীকে লক্ষ্য করে বললে—রাগ করবেন না। আপনাকে একটু খাটিয়ে নেব—পাঁচ কাপ চায়ের দরকার।

কথার ধরন দেখে হাসি পেয়েছিল, হাসি চেপে উত্তর দিয়েছিল—দিচ্ছি।

—ধন্যবাদ।

উনুনে চায়ের কেতলী বসানোই ছিল, টি-পটে চা ভিজিয়ে দিলে বাণী।

অরবিন্দ তখনও দাঁড়িয়েছিল দোরগোড়ায়। বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে খাপছাড়া ভাবেই বলে উঠলো—আপনি স্কটিশচার্চ কলেজে পড়েন শুনেছি—কিন্তু এমন চুপচাপ--

বাণী হেসে ফেলেছিল—স্কটিশের ছাত্র-ছাত্রীকে বুঝি কখনও চুপচাপ থাকতে নেই?

—নিশ্চয়ই আছে।····সামনেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—স্মিত হাসলো অরবিন্দ ঃ ব্যতিক্রমও বলতে পারেন।···স্কটিশের স্টুডেণ্টস্‌রা সাধারণতঃ খুব স্মার্ট হয় কিনা—।

বাণী কাপে চা ঢালছিল, কথাটা শুনে কৌতুক অনুভব করলো। বললে—আমাকে কি খুব ক্যাবলা বলে মনে হচ্ছে?

অরবিন্দ একটুও ঘাবড়ালো না, হেসেই উত্তর দিলে—আগে হলেও এখন আর হচ্ছে না।

বাণী হাসি চাপতে পারলো না।

ওকে চায়ে দুধ ঢালতে দেখে হঠাৎ যেন খেয়াল হল অরবিন্দর—ঐ যা, আপনার কাজের ব্যাঘাত করছি—আর একদিন বসে ভালো করে গল্প করা যাবে।—বলেই বৈঠকখানার দিকে চলে গেল।···

হাসি-খুশি মিশুকে এই ছেলেটির মধ্যে তেজও কম নেই। অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নোয়ায় না।···দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে মনটা ওর ইস্পাতের মতই শক্ত হয়ে উঠেছে।···

ভাগ্য ছেলেবেলা থেকেই বিরূপ ওর উপর। তা নইলে জন্মের আগে অ্যাকসিডেণ্টে ওর বাপ মারা যাবেন কেন? কোলিয়ারীতে কাজ করতেন।···বাপের মৃত্যুর পর ওর মাকে রান্নার কাজ করে ভরণপোষণ চালাতে হত। কপালে তা-ও সইলো না অরবিন্দর। দশ বছর বয়সে সে মাকেও হারালো। যে বাড়ীতে ওর মা রান্না করতেন,

সেই ভদ্রলোকই দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলেন—লেখাপড়াও শিখিয়েছেন।···

কিন্তু ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা যখন ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে, ফুটপাতে শুয়েও কি ও রাত কাটায় নি? উপোস করেও কাটিয়েছে কতদিন। তবু হার মানে নি।···সমাজের অন্যায়-অত্যাচার ওর চোখের সামনে এক নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিয়েছে। বাণীর মুখের উপর দুটো জ্বলজ্বলে চোখ রেখে বলেছে—সমাজতন্ত্র ছাড়া মানুষের কোন ভবিষ্যৎ নেই—নিজের জীবনেই আমি শ্রেণী-সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছি।

নিঃশব্দ ছায়ার মতই অরবিন্দকে অনুসরণ করে একটি ছেলে—সে আর কেউ নয়, অনুপ। ভূপেশকাকার ভাইপো। পাঁচ ফুটের বেশি লম্বা নয়, দোহারা গড়ন। ফুটফুটে রঙ, ভাষা-ভাষা দুটো বড় চোখ। চোখের সাদা, কালো দুটো অংশই আশ্চর্য উজ্জ্বল। উজ্জ্বল টানা ভুরু। মিশকালো কোঁকড়া চুল মাথা ভরা। সব মিলিয়ে ভারী মিষ্টি চেহারা। স্বভাবটিও তেমনি।···কোথায় যেন একটা মিল আছে অশোকের সঙ্গে। অশোক! বাণীর শৈশব-কৈশোরের খেলার সাথী। মারা গেছে—পাঁচ বছর আগে। মাসীমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকতো তারা।···অশোকের মতোই ঠাণ্ডা মেজাজ অনুপের।

বয়সের তুলনায় অনেক ছেলেমানুষ দেখায় ওকে। এমন লাজুক ছেলে বাণীর চোখে পড়ে নি আজ পর্যন্ত। গ্রাম্য মেয়েদের মতই লাজুক। বাণীর দিকে তাকিয়ে সে এখনও কথা বলতে লজ্জা পায়।···সুন্দর কবিতা লেখে। মজার লোক। কোনো ম্যাগাজিনে ওর কবিতা ছাপানোর নাম করলেই নাকি খাতাপত্র লুকিয়ে ফেলে। অরবিন্দ ওর দেরাজ থেকে কয়েকটা কবিতা চুরি করে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছে। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখে লজ্জায় অনুপের কান নাকি লাল হয়ে উঠেছিল। আচ্ছা ধূর্ত অরবিন্দ! অনুপের কবিতার খাতাখানা সে চুরি করে বাণীর জিম্মায় রেখে গেছে—অনুপকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে।

কান্নায় ভরাই তো জীবন ওদের। আপিসের কেরানী জীবন—দিনগত পাপক্ষয় করা ছাড়া আর কি! কিন্তু আপিস থেকে বাড়ী এসেও একটু শান্তি পাওয়ার উপায় আছে?

বাড়ী ফিরেই মনটা খারাপ হয়ে গেল অনুপের। হল, মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখ দুটো কেমন ভিজে ভিজে লাগছিল—মা কাঁদছিলেন নিঃসন্দেহ।

চেপে ধরতেই বেরিয়ে পড়লো। মায়ের মন সত্যিই ভাল নেই। দিদির চিঠি পেয়ে খারাপ হয়ে গেছে। পাকিস্তানে ওদের নাকি আর সংসার চলছে না। আয়ের উপায় থাকলে তো চলবে! ওখানকার সংসার গুটিয়ে তাঁরা নাকি এখন কলকাতায় চলে আসতে চাইছেন। কিন্তু আসতে চাইলেই তো হয় না। অনুপের মা তাই ভাবনায় পড়ে গেছেন। ভেবে কূল পান নি, তাই কাঁদতে বসেছিলেন।

মায়ের চোখে জল দেখলে অনুপ স্থির থাকতে পারে না। সংসারের বিরুদ্ধে—সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর বিদ্রোহ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত মাকেই কষে এক ধমক লাগালো—আগে থেকেই কাঁদতে বসেছ? আগে আসুক, তারপর দেখা যাবে।

চোখ মুছে মা চা জল-খাবার নিয়ে এলেন।

খাওয়া হয়ে গেলে খাটের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লো অনুপ। শুয়ে শুয়েই খবরের কাগজ পড়ছিল। মা মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠলেই ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঠাকুর-দেবতার প্রতি ভক্তি মায়ের যেন ক্রমশই বেড়ে উঠছে। ...ধর্ম মানুষের জীবনে সত্যিই আফিং-এর নেশার মত। "...দি সেন্টিমেন্ট (হার্ট) অব্ এ হার্টলেস্ ওয়ার্ল্ড্, অ্যাজ ইট্ ইজ্ দি সোল্ অব্ এ সোল্‌লেস্ সার্কাম্‌স্ট্যান্স। ইট ইজ্ দি ওপিয়াম্ অব্ দি পিপ্‌ল্।"—

জানালা দিয়ে ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে অনুপ। মায়ের সাদা থানের মতই বর্ণহীন-করুণ মনে হয় আকাশটাকে।

খিল খিল হাসির আওয়াজে চিন্তার স্রোত ভেঙ্গে গেল। মানসী হাসছে, হাসতে হাসতে বারান্দা দিয়ে চলে গেল। সুবোধবাবু এসেছেন নিশ্চয়।···মেয়েটা ঠিক প্রেমে পড়েছে।

অনুপ নেমে পড়ল খাট থেকে। না, আর শুয়ে থাকা নয়। জামা-কাপড় বদলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল সে। কোথায় যাওয়া যায়! ভাবতে ভাবতে বারীনবাবুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল।

বারীনবাবু বাড়ী ছিলেন না। বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়াতে অরবিন্দই প্রথম অভ্যর্থনা জানালো—এই যে তরুণ কবি, আসতে আজ্ঞা হয়। বৈঠকখানায় বসেই বাণীর সঙ্গে গল্প করছিল সে।

ঘরে ঢুকে অরবিন্দর পাশে বসে পড়লো অনুপ—তক্তপোশের উপর।

বাচ্চা চাকরটি চা রেখে গেল।

চামচ দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে বাণী কি যেন ভাবছিল। অরবিন্দকে লক্ষ্য করে মৃত্যু হেসে হঠাৎ বলে উঠলো—আচ্ছা, কবিদের নিয়ে লোকে এত হাসি-ঠাট্টা করে কেন বলতে পারেন?

অরবিন্দ আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে থাকে—ভাবনায় পড়ে যায় যেন। একটু ভেবে নিয়ে বলে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওটা একটা পোজ—পোজ দেখলে মানুষের হাসি পাবে না?

সাহিত্যের আলোচনা অরবিন্দ শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে টেনে আনলো। রাজনীতি নিয়ে বাণী অবশ্য অরবিন্দর মত অত মাথা ঘামায় না, আর্ট-লিটারেচার সম্পর্কেই ওর বেশি উৎসাহ।

সত্যি কথা বলতে কি, অনুপের কবিতার মোড় সে-ই তো ঘুরিয়ে দিয়েছে!···কবিতা বলতে অনুপ আগে শুধু লিরিক কবিতাই বুঝতো। বাংলার কবিদেরই হয়ত বৈশিষ্ট্য এটা। বিদেশী সাহিত্যের বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে তারা কিছুটা উদাসীন বইকি!

বাণী এসব ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল।···ফরাসী দেশের সুররিয়ালিস্ট্ আন্দোলনের সঙ্গে জার্মানীর তৎকালীন একস্‌প্রেস-নিজম্-এর পার্থক্য সে এক কথায় বুঝিয়ে দিতে পারে।···অনুপের

কবিতায় টেক্‌নিকটাই ছিল প্রধান। ছন্দ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল ওর। যে কারণে অজিত দত্তর সে একজন পরম ভক্ত। ভাষার মোহে বিষয়বস্তুকে সে অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করেছে—এ ভুলটাও ওর ধরিয়ে দিয়েছে বাণী।···

কিছুদিন আগে অনুপদের আপিস-ম্যাগাজিনে বাণী একটি গল্প ছাপাতে দেয়—শারদীয় সংখ্যায়। লেখা ওর নিজের নয়, এক বন্ধুর। অনুপের পছন্দ হয় নি লেখাটা।

বাণীর হাতে গল্পটি ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল—বড্ড কাঁচা লেখা।

কথাটা শুনে রেগে গেল বাণী—কাঁচা লেখা!···থীম্‌টা কত জোরালো সেটা নজরে পড়লো না?—একটু থেমে ভুরু কুঁচকে বললে—বাবা ঠিকই বলেন—এটা আইনস্টাইনের যুগ নয়, এডিসনের যুগ। কবি সাহিত্যিকেরাও তাই আজ টেকনিক্‌-সর্বশঃ হয়ে উঠেছেন।···

কথাটার মধ্যে চিন্তার খোরাক আছে যথেষ্ট। অনুপ খুশি হয়েই ওর কথা শোনে।

বাণী যখন তর্ক করে তখনই যেন ওকে আরো বেশি ভাল লাগে। ···তর্ক করতে বাণী ওস্তাদ।

তর্ক করতেই শুধু ওস্তাদ নয়, সাহসও ওর অসাধারণ। অনুপ তাজ্জব হয়ে গেছে ওর সাহস দেখে।···

অভিশপ্ত উনিশ-শো পঞ্চাশ সাল।···জীবন আহুতি দিয়েও মহাত্মা গান্ধী হিংসার বীজ নির্মূল করতে পারেন নি। পূর্বপাকিস্তানে দাঙ্গা লাগলো আবার—পশ্চিম বঙ্গেও তার জের চললো।···আকাশ লাল হয়ে উঠেছিল হিংসার আগুনে।···

ট্রাকে শান্তি মিছিল নিয়ে হাওড়ার দিকে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিল অরবিন্দ—অনুপকেও সঙ্গে টেনে নিয়েছিল। শান্তিসেনা কমিটির আপিস থেকেই রওনা হবে ওরা। গরমকাল, দুপুরের আকাশ তখন আগুন ঢালছে মাথার উপর। দর দর করে ঘাম ঝরছে, সেদিকে খেয়াল নেই কারো।

ট্রাকে সবাই প্রায় উঠে বসেছে, এমন সময়ে বাণী উপস্থিত হল। অরবিন্দকে ধরে বসলো—সে-ও সঙ্গে যাবে।···বিপদের আশঙ্কা ছিল বলেই না অরবিন্দ ওকে নিয়ে যেতে আপত্তি করেছিল!

বাণী রীতিমত ধমকে উঠলো অরবিন্দকে।—আপনারা যেতে পারলে আমি-ই বা পারবো না কেন?···মুখে খুব তো বড় বড় প্রগতির কথা—আসলে ভীষণ গোঁড়া।—

ধমক খেয়ে অরবিন্দ চুপ করে গেল।

অরবিন্দর আপত্তি অগ্রাহ্য করেই বাণী ওদের সঙ্গে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘুরে এসেছে। উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও ওকে এতটুকু উত্তেজিত হতে দেখা যায় নি।···বাণীর তুলনায় অরবিন্দকে বরং উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।···

সন্ধ্যার পর বাণীদের বাড়ীতে ফিরে এসেও সে যেন শান্ত হতে পারছিল না।

চেয়ারে বসে আঙ্গুল দিয়ে কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে বলে উঠলো—যে করেই হোক, দাঙ্গা রুখতে হবে।···দাঙ্গার চেয়ে বড় শত্রু নেই শ্রমিকের—এই অস্ত্রের সাহায্যেই এখন মিলওয়ালারা মজুরের ঐক্য ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করছে।

—এত ভয়? অনুপ প্রশ্ন করেছিল।

—নিশ্চয়ই। একটু দম নিয়ে অরবিন্দ উত্তর দিয়েছিল: মজুরের একতা কায়েমী স্বার্থ চিরদিনই ভয় করে—উনিশ-শো ছেচল্লিশ সালে ট্রেড ইউনিয়নের সংহতি দেখে ইংরাজ বণিকদের পর্যন্ত পিলে চমকে গেছল—।

অনুপ একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, অরবিন্দ সেদিকে খেয়াল না করেই আপন আবেগে বলে চললো—আমাদের সমস্ত সর্বনাশের মূলে ঐ ইংরাজ।···যাবার সময়ও চরম শত্রুতা করে গেল!

বিশ্রাম নেওয়ার ভঙ্গিতে চেয়ারের গায়ে মাথাটা সামান্য হেলিয়ে চুপচাপ বসেছিল বাণী। অরবিন্দর কথা শুনে সোজা হয়ে উঠে

বসলো। অরবিন্দর দিকে একটা হাসিমাখা দৃষ্টি ফেলে বললে—আশ্চর্য হবার কিছু নেই—শত্রুর ধর্মই তো শত্রুতা করা।

বলেই উঠে পড়লো। অরবিন্দকে আর বক্তৃতা দেবার সুযোগ না দিয়েই হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।...

উচ্ছ্বাসটা সত্যিই বড় কম ওর চরিত্রে!

চিঠিপত্র না দিয়েই হঠাৎ একদিন রমলার মেয়ে-জামাই এসে উপস্থিত হল—মেয়েদের নিয়ে। পূর্ববঙ্গে পূর্ব পুরুষের ভিটে আঁকড়েই ওরা পড়েছিল এতদিন। কলকাতায় এসে খাবে কি!

শেষ পর্যন্ত আসতেই হল।...পাকিস্তানে রোজগারের পথ যখন বন্ধ হয়েই গেছে অবিনাশের, কলকাতায় না এসে উপায় কি! চাকরি পেলে দেশের পাট উঠিয়ে কলকাতায় চলে আসবে।

কিন্তু চাকরি পাওয়া তো মুখের কথা নয়। কতদিনে যোগাড় হবে কে বলতে পারে! অবিনাশের যোগ্যতাই বা কি! ম্যাট্রিক পাস। ওর মত কত ম্যাট্রিক পাস ছেলে আজকাল সামান্য পিয়নের কাজের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রমলা দুর্ভাবনায় পড়ে যায়। পোষ্য তো কম নয়, নিজের বউ-মেয়ে, তার উপর মা-বোনও আছে।

গৌরীই তার মাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে। বলে—উপায় একটা হবেই।...কাকা ওঁকে একটা ভাল কাজ জুটিয়ে দিতে পারবেন না?—

জুটলো কোথায়! মাস ঘুরে এল, তবু কাজের কোন সন্ধান পেল না অবিনাশ।

ওদের আসা নিয়ে সংসারে যে এমন অশান্তি ঘনিয়ে আসতে পারে, রমলা কল্পনাও করে নি কোনদিন।...

গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ভূপেশ নিজেই তো গৌরীকে আসতে বলেছিল, কিন্তু তখন ওরা আসতে পারে নি।

সেই গৌরী আজ বিপদে পড়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এসেছে।…ললিতা হেসে একটা কথাও কি বলতে পারতো না!…

দুপুরবেলায় ঘুমন্ত নাতনীদের পাশে শুয়ে আছে রমলা। আলাদা খাটে গৌরীও ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ঘুম নেই অবিনাশের চোখে। ঘরে ঢুকে আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা নিয়ে গায়ে চড়ালো। তারপরেই বেরিয়ে গেল আবার। কোথাও যাবে নিশ্চয়। চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অন্যের উপর মানুষ কতদিন আর বসে খেতে পারে? এতগুলি লোকের খরচও তো কম নয়!

কিন্তু খরচের জন্যে মোটেই ভাবে না ললিতা। বেহিসাবী লোক বলে ভূপেশের সঙ্গে তো ওর খিটিমিটি লেগেই আছে।

ভাঁড়ারের চাবি চাকরের জিম্মায় গচ্ছিত রেখেছিল সে—প্রতিদিন নিজের হাতে খুঁটিনাটির হিসাব রাখা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ না রেখেও উপায় নেই—ভূপেশের কাছে কথা শুনতে হয়।

বাজারের হিসাব নিয়েই তো গোলমাল বাধলো নরহরির সঙ্গে। মাস দুয়েক আগে ললিতা ওকে কাজে বহাল করেছে। ভূপেশের অবশ্য এতে মত ছিল না। ললিতাই জিদ করে রাখলো। বাড়ীতে নাকি এখন কাজ অনেক বেড়ে গেছে। অথচ বাড়ীর লোকেদের ও কাজে হাত দিতে দেবে না—রমলাকে তো নয়ই। নিজের ঘরখানা পরিষ্কার করতে গেলেও বিরক্ত হয়—আপনি ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন কেন?

ললিতার কথার উপর কেউ কথা বলতে পারে না।

নরহরিও বলতো না কখনো। ললিতাকে সে তো সমীহ করেই চলতো। সেদিন হঠাৎ কি যে দুর্মতি হল তার। মুখের উপরই বলে বসলো—কাল থেকে আমি আর বাজারে যেতে পারবো না।

কথাটা শুনেই জ্বলে উঠলো ললিতা। বড়লোকের মেয়ে, চাকর-

বাকরের মেজাজ সে সহ্য করবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলো— বাজারে যেতে পারবি না তো কাজ করতে এসেছিস কেন?

নরহরিকে লক্ষ্য করে ললিতা যা মুখে আসে বলে গেল। এমনকি, চাল-ডাল, তেল-নুন চুরির অপবাদ দিতেও দ্বিধা করলো না।···কিন্তু চাকরির খাতিরে মানুষ কি-না সহ্য করে! অপবাদ তো তুচ্ছ কথা।

চুরির অপবাদ সহ্য করলেও নরহরি ললিতার ভাঁড়ারে হাত দিতে আর রাজী হল না। হাত জোড় করে বললে—ও কাজটা বড়মার উপরে ছেড়ে দিলেই তো ভালো হয়—আমাদের ভুলচুক হয়ে যায়।

ভাঁড়ারের চাবির গোছা রমলার হাতে তুলে দিয়ে ললিতা দৈনন্দিন সাংসারিক ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতি মানুষকে কি অত সহজে নিষ্কৃতি দেয়?

দেয় না।

সমীরের জন্মতিথি গেছে দু'দিন আগে। বাড়ীতে সামান্য জল-যোগের আয়োজন করা হয়েছিল সেই উপলক্ষে। সের পাঁচেক ঘি উদ্‌বৃত্ত থাকার কথা।···ব্যাপারটা মোক্ষদাই ধরে ফেললো। ঠাকুরের নামে গিয়ে সে কোটনামি করলো ললিতার কাছে—মা, ঠাকুর ঘি সরিয়েছে।

আর যায় কোথায়!

সকালবেলার পূজো আহ্নিক সেরে রমলা গৌরীর কোলের মেয়েটার জন্যে কাঁথা সেলাই করতে বসেছিল—নিরামিষ ঘরের রান্না তো এসে অবধি গৌরীই করে বেশির ভাগ দিন।

হঠাৎ ঝড়ের মত ললিতা এসে ঘরে ঢুকলো। বয়স, সম্পর্ক কিছুই গ্রাহ্য করলো না। রমলার দিকে তাকিয়ে কর্তৃত্বের সুরে বললে—সেদিন যে ঘি-টা বেঁচেছে, ওটা আলাদা করে রেখে দেবেন, খরচ করবেন না।

—ঘি! সেদিন আবার ঘি-বাঁচলো কোথায়? রমলা আশ্চর্য হয়ে গেল: ঠাকুর তো সেদিন সব ঘি-ই খরচ করে ফেলেছে।

—খরচ করে ফেলেছে!—ললিতা রাগের ভাবেই বলে উঠলো: পরে যে আরো পাঁচ সের ঘি আনা হল, সেটা গেল কোথায়?

ললিতার মেজাজ বুঝেই রমলা কথাবার্তা বলে, রুক্ষ মেজাজ দেখলে কোন কথার মধ্যে যায় না। কথায় কথা বাড়ে।

কিন্তু রমলা চুপ করে থাকলে কি হয়! ললিতা থামলো না। রমলার মুখের উপরই বলে বসলো—যে দিকে না দেখবো, সেখানেই একটা বিভ্রাট বাধবে।···খাবার লোক আছে অনেক, দেখবার বেলায় কেউ নেই।

সহ্যেরও একটা সীমা আছে। রমলা আর চুপ করে থাকতে পারলো না। বললে—খাবার খোঁটা দিও না ছোট বউ।—

রাগে গর গর করতে করতে ললিতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অপমানে, দুঃখে রমলা যেন পাথর হয়ে গেল।···ললিতার কথাগুলো সে নিজের মনেই চেপে রেখেছে, কাউকে বলে নি। অপমানের কথা বলতে গেলে অপমান বাড়ে ছাড়া কমে না।···ভূপেশের বউ তাকে অপমান করেছে, এ দুঃখের কথা সে বলবেই বা কাকে!

মার্চের শুরু থেকেই হঠাৎ কেমন গরম পড়ে গেল। প্রকৃতি দেবীও যেন খামখেয়ালী হয়ে উঠেছেন!

ছুটির দিন, সকালবেলায় তেমন কোন কাজে আটকা না পড়লে অরবিন্দ আজকাল ঠিক এসে হাজির হয় অনুপদের বাড়ীতে। মা-ও অমনি চা-খাবার নিয়ে উপস্থিত হন। অরবিন্দকে অসম্ভব স্নেহ করেন তিনি। দু'দিন না এলেই এখন চিন্তিত হয়ে পড়েন, অরবিন্দ সেটা বোঝে বই কি।

আপিস-কলেজ বন্ধ ছিল। আটটা বাজতে না বাজতেই অরবিন্দ এসে গেল।

মায়ের ঘরে বসেই দু'জনে গল্প করছিল। ঠিক গল্প নয়, তর্ক।

অনুপকে পিপলস্ পোয়েট না বানিয়ে ছাড়বে না অরবিন্দ। দ্বি

রোল অব্ লিটারেচার অ্যাণ্ড দি রাইটার্স্ মিশন্—নিয়ে একচোট বক্তৃতা ঝাড়লো।

ভাবী যুগের কবি কে? শুধু জনতার সঙ্গে একাত্মা হলেই চলবে না—কর্মক্ষেত্রে, এমনকি লড়াইয়ের ময়দানেও তাঁকে এক সারিতে এসে দাঁড়াতে হবে জনতার সঙ্গে।

কিন্তু এত লড়াই করলে কবি কলম ধরবে কখন? সাহিত্যিকের মিশন, সাহিত্য সৃষ্টি করা—অরবিন্দ কিছুতেই মানতে চায় না একথা।

রমলা এক ফাঁকে চা-খাবার রেখে গেলেন—নিরামিষ ঘরের রান্না নিয়ে ব্যস্ত আছেন। অনুপের দিদি তাঁর জালি বোট দু'টি নিয়ে মায়ের পাশে ঘুরঘুর করছে।

জলযোগ শেষ হতে না হতেই বাণী এসে উপস্থিত হল। কাকার কাছে নাকি তার কি দরকার। কিন্তু বৈঠকখানায় ঢুকতে গিয়েও ঢুকতে পারে নি—জোর বৈঠক চলেছে সেখানে।

সর্বক্ষণই ব্যস্ত অনুপের কাকা। কত লোকের সঙ্গেই না যোগাযোগ ওঁর। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি—এমনকি, মিনিস্টারদের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব। পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে খাতির না রাখলে কি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়?

বৈঠকখানায় সকাল থেকেই লোক আসতে শুরু করে। বেশির ভাগ লোকই অবশ্য আসে নিজের জন্যে তদ্বির করতে।···এর উপর আছে টেলিফোন আর কলিং বেলের উৎপাত। কান ঝালাপালা হয়ে যায় বাড়ীর লোকজনের।

মিনিট দশেকের মধ্যে তিন-চার বার টেলিফোন বেজে উঠলো।

মিষ্টি হেসে বাণী বললে—কাকাবাবুর জন্যে আমার সত্যি দুঃখ হয়—ছুটির দিনেও একমুহূর্ত বিশ্রাম নেই।

—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একেই বলে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'!—অরবিন্দ টিপ্পনী কাটলো: ওরিজিন্যাল্ সিন্-এর পর থেকে সংসারে সবকিছুর জন্যেই মানুষকে প্রিমিয়াম্ দিয়ে আসতে হয়েছে।

অরবিন্দর মুখের কোনো লাগাম নেই—যা মনে আসে বলে ফেলে। ওর কথা শুনে বাণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—নিঃশব্দ হাসির আভায়। অনুপ কিন্তু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে—বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কাকাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে প্রস্তুত নয় সে। শত হলেও তিনি ওর গুরুজন।

বাণীই কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয় আবার। অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে তেমনি হাসি মুখে বলে—'গার্ডেন অব্ ইডেন' কবির কল্পনা হলেও ভারী মিষ্টি কিন্তু কন্‌সেপ্টটা—পরিশ্রম না করেই মানুষ সেখানে খেতে পেত।

বাণীর কথাটা লুফে নিয়ে টেবিলের উপর একটা কিল মেরে অরবিন্দ বললে—কিন্তু পরিশ্রম করেও কি মানুষ আজকাল খেতে পাচ্ছে ?

নোটিশ না দিয়েই অনুপের জামাইবাবু ঘরে ঢুকলেন। শুকনো মুখ—উদভ্রান্তের মত চেহারা।

তাঁকে দেখেই বাণী উঠে পড়লো। চলি।—আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাণীর ছেড়ে-যাওয়া চেয়ারখানায় অবিনাশবাবু বসে পড়লেন হতাশভাবে।

বয়সের অনেকখানি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অবিনাশবাবুর সঙ্গে অরবিন্দর এরই মধ্যে আলাপ জমে উঠেছে। এমন মনোযোগ দিয়ে অরবিন্দ ওঁর অভাব-অভিযোগের কথা শোনে যে দেখলে মনে হবে—সমস্যাটা যেন ওর নিজেরই।

অরবিন্দর দিকে একটা অসহায় দৃষ্টি ফেলে অবিনাশবাবু বললেন—চাকরির তো কোন আশাই দেখছি না।···যেখানে যাই সেখানেই শুনি চাকরি নেই।

—চাকরি নেই বললেই হল ?—অবিনাশবাবুর পক্ষ নিয়ে অরবিন্দ যেন হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে : রুজি-রোজগারের সুযোগ—রাইট্ টু ওয়ার্ক—মানুষের একটা প্রাথমিক অধিকার।

কিন্তু রোজগারের সুযোগ অবিনাশ পাচ্ছেন কোথায়!··· কলকাতায় এসে চাকরির চেষ্টায় আপিসে আপিসে দৌড়াদৌড়ি করে পুরানো জুতোর সুখতলা ফুটো হবার যোগাড় হয়েছে। কিন্তু চাকরির কোন হদিস মেলে নি।

অরবিন্দ চলে গেলে তিনি শেষ পর্যন্ত অনুপকেই ধরে বসলেন—তোমাদের আপিসে কোন কাজ খালি নেই?

জামাইবাবুর বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া লাগলো অনুপের। আর কোন উপায় না পেয়ে বুদ্ধি দিলে—কাকাকে বলুন না গিয়ে, তিনি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই—

কিন্তু চেষ্টা করলেন কোথায়! খুব আশা নিয়েই কথাটা বলতে গেছলেন অবিনাশবাবু।···রাত আটটার পর ঘর ফাঁকা দেখে ঢুকে পড়েছিলেন। অনুপ ঘরে ঢোকে নি, ঘরের বাইরেই বারান্দায় বসে ছিল—বেতের চেয়ারে।

ভূপেশ মকদ্দমার নথিপত্র দেখছিলেন। গম্ভীর মুখে অবিনাশকে বসতে বলে নথিপত্রের মধ্যে আবার তন্ময় হয়ে গেলেন।

খানিক ইতস্ততঃ করে অবিনাশ শেষপর্যন্ত বলে ফেললেন—একটা কথা বলতে এসেছিলাম—

কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে ভূপেশ অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলেন অবিনাশের দিকে।

অসমাপ্ত কথার জের টেনে অবিনাশ বললেন—খাদ্যদপ্তরে নাকি অনেক লোক নিচ্ছে, আপনি যদি মন্ত্রীকে একটা ফোন করে দেন—

অবিনাশের বক্তব্য শেষ হবার আগেই বারীনবাবু প্রবেশ করলেন—সদর দরজা দিয়ে।

চোখের ইশারায় তাঁকে বসতে বলে ভূপেশ ফিরে তাকালেন অবিনাশের দিকে। বিরক্তিভরা গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন—মন্ত্রীকে ফোন করে কি হবে?—একটু থেমে তেমনি গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন

—এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মন্ত্রীদের বলা চলে না।—নিজের মনে কাগজের পাতা উল্‌টে চললেন তিনি।

অন্য কাজ না পেয়েই যেন বারীন সকালের পুরানো খবরের কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন। অবিনাশ কখন উঠে বেরিয়ে এলেন তাঁরা লক্ষ্যও করলেন না।

অনুপ তখনও বারান্দায় বসে আছে। পাশ দিয়েই অবিনাশ চলে গেলেন, অনুপকে যেন দেখতেই পেলেন না। সোজা মায়ের ঘরের দিকে চলে গেলেন—বিমর্ষমুখে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল অনুপের। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হল। ও না বললে তো তিনি যেতেন না কাকার কাছে।

বারান্দায় চুপচাপ বসে রইল অনুপ। অবিনাশের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কেমন সঙ্কোচ লাগছিল।

বারীন তখনও খবরের কাগজ পড়ে চলেছেন।—তারপর কি খবর তোমার ?—বারীনকে লক্ষ্য করে ভূপেশ সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ঠাট্টার ছলে বারীন উত্তর দিলেন —খবর তো এখন তোমাদেরই।···কংগ্রেসের টিকিট নিয়ে পার্লামেন্টের সীটে দাঁড়িয়ে গেলেই তো পার।

কথাটা শুনে ভূপেশ একটু বিরক্ত হলেন যেন। গম্ভীর মুখে বললেন—আমি চাকরির একটা বুরো খুলে বসেছি যেন···আত্মীয়-স্বজনের উৎপাতে বাড়ীতে টেঁকা দায় হয়ে পড়েছে। একটু থেমে বললেন—আমাকে কিনা এখন সবার চাকরির জন্যে উমেদারি করে বেড়াতে হবে।

—তা না হয় করলেই—আত্মীয়স্বজনের জন্যে একটু কষ্ট করলে দোষ কি ? বারীনের গলায় ঠাট্টার সুর।

ভূপেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়েন যেন।

কৈফিয়ত দেবার মত করে বলেন—জানই তো, অন্‌ প্রিন্সিপল্‌ আমি কারো চাকরির জন্যে তদ্বির করি না।

বারীন নিজের মনে হাসেন। হাসির মুখ করেই ভূপেশের দিকে তাকিয়ে বলেন—তবে সে-প্রিন্সিপ্‌ল্‌টা সব সময়েই কিন্তু তোমার নিজের পক্ষে খুব সুবিধাজনক।

নির্বাক ক্রোধের ভঙ্গিতে বারীনের দিকে একবার তাকিয়েই ভূপেশ দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিলেন নথিপত্রের দিকে।

মিনিট কয়েক বাদেই বারীন উঠে পড়লেন।

ভূপেশের সামনে দাঁড়িয়ে ছাইয়ের পাত্রে চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন—আজ চলি। সহজ আন্তরিকতার সুর গলায়।

খানিক আগে তিনি ভূপেশের সম্বন্ধে অমন কড়া মন্তব্য করেছেন, সেটা এরই মধ্যে ভুলে গেছেন!

রাগের মাথায় রমলাকে অমন কড়া কথা বলে ফেলে অস্বস্তির সীমা ছিল না ললিতার। ওর স্বভাবই ঐরকম। রাগ হলে যা মুখে আসে বলে ফেলে। কথাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ওর মনের কথা নয়। কিন্তু তা আর কে বিশ্বাস করছে?

ভূপেশ অবশ্য করে। ওঁর কাছে সব ব্যাপারটা খুলে বলতে পারলে মনটা হয়তো হালকা লাগতো।

কিন্তু দেখা পেলে তো বলবে।

বিকেলের দিকে আগে তবু সময়মত বাড়ী ফিরতো ভূপেশ। এখন সর্বক্ষণই কাজ নিয়ে ব্যস্ত সে।···ইলেকশন-এ দাঁড়াবার ইচ্ছে আছে —খরচের জন্যেই ইতস্ততঃ করছে। ললিতার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় কোথায় তাঁর?···তু'দিন আগে ওর শরীরের উপর যে ধকলটা গেল, সে সম্বন্ধেও কি কোন চিন্তা আছে? নীলিমারা পর্যন্ত লক্ষ্য করেছে—ওর চেহারা কত খারাপ হয়ে গেছে—তা বাড়ীর লোকের খেয়াল হয় না।···

সংসারে ললিতার সম্বন্ধে এতটুকু সহানুভূতি নেই কারো। এমন কি, মেয়েটার পর্যন্ত নেই। মায়ের চেয়ে জেঠাইমাকেই সে বেশী

ভালবাসে—'বড়মা' বলতে অজ্ঞান।...ছুটির দিন সারা দুপুরটা তো ওঁর ঘরেই কাটায়। উপুড় হয়ে বড়মার মাথার পাকা চুল তোলে।

সংসারের সবকিছুতেই রমলা কর্তৃত্ব করতে আসেন। রান্না-খাওয়া আর সন্ধ্যা-আহ্নিক ছাড়া যেন মানুষের কোন কাজ নেই। হাসি-গল্প, গান-বাজনা, সিনেমা-থিয়েটার—এসব তো উনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।...এক যুগ বাদে সেদিন সকালে কিছুক্ষণের জন্যে হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসেছিল ললিতা। রেডিওতে শোনা নতুন একখানা গানের সুর তোলার চেষ্টা করছিল, ঠিক তখুনি মোক্ষদা এসে হাজির হলঃ বড়মা তোমাকে এখুনি নীচে ডাকছেন, কারা যেন বেড়াতে এসেছেন।

রমলা কলকাতায় আসার পর থেকে আত্মীয়স্বজনের যাতায়াতও যেন বেড়ে গেছে।...

গৌরীরা এসেছে তা-ও তো কম দিন হল না! অবিনাশ কবে চাকরি পাবে তার ঠিক কি!...

ওদের সঙ্গে রুচিতেও খাপ খায় না ললিতার। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে বড় বেশি ঔৎসুক্য! বাড়ীতে কে এল, গেল—কার সঙ্গে কতক্ষণ কথা বললো, না বললো—সবকিছু নিয়ে ওদের মাথা ঘামানো চাই। বিকেলবেলায় ললিতাকে একলা বেরুতে দেখলেই চোখ ছানাবড়া—একলা যাচ্ছো? কোথায় যাবে?

ললিতা যেন এখনও সেই কচি খুকীটি আছে।

ঔৎসুক্যটা গৌরীরই বেশি সব থেকে।...

সন্ধ্যার পর সেদিন বাইরের খোলা বারান্দায় বসে সুবোধের সঙ্গে মানসী গল্প করছিল, জানলার পাশে দাঁড়িয়ে তোর বাপু আড়ি পেতে ওদের কথা শুনতে যাওয়া কেন!

ললিতার হঠাৎ চোখে পড়ে গেছল। বিরক্ত হয়ে বলে ফেলেছিল—ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছো?

লজ্জাও নেই—ফিক করে একটু হেসে গৌরী সরে গেল সেখান থেকে।

ওরা আসার পর থেকে সংসারের খরচও অনেক বেড়ে গেছে। ভূপেশের ধারণা, ললিতাই সব খরচের জন্যে দায়ী।···ঘি চুরির খবরটা কানে আসতেই তাই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছল।···রমলা একটু খেয়াল রাখলে কি ওরা চুরি করতে পারতো?

রাগের মাথায় কথাগুলো বলে ফেলেছে ললিতা, তবে না বলাই উচিত ছিল।

ব্যাপারটা শুনে ভূপেশও হয়তো রাগ করবে।

কিন্তু রাগ করলো না। মামলা জিতে মনটা বিশেষ প্রফুল্ল ছিল ওর।

রাত এগারোটায় একমুখ হাসি নিয়ে শোবার ঘরে এসে ঢুকলো সে।

ললিতার মুখের দিকে তাকিয়েই ব্যাপারটা আঁচ করে নিলে। বললে—কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি?

—ঝগড়া করে বেড়ানো আমার স্বভাব নয়।—ললিতা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভূপেশের কাছে কিছু গোপন রাখার উপায় আছে? উকিল মানুষ, জেরা করে পেটের কথা আদায় করে ছাড়ে।

ললিতা সব কথাই বলে ফেললো শেষ পর্যন্ত।

কথাগুলো শুনে মুখটা সামান্য গম্ভীর করে ভূপেশ বললে - এসব কথার মধ্যে তোমার না যাওয়াই ভালো ছিল।···আমি নিজেই যখন ওদের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

—কোথায়? ললিতার বিশ্বাস হয় না কথাটা।

—শান্তিনগরে, সামনের সপ্তাহেই যেতে পারবে।···একখানা টিনের ঘর তুলতে ক'দিনই বা লাগবে!

ভূপেশ ওদের বাড়ী করে দিচ্ছে! শান্তিনগরে! নিজের জমিতে?

আত্মীয়স্বজন সবার জন্যেই ওঁর চিন্তা। কিন্তু ওঁর জন্যে চিন্তা করার লোক নেই সংসারে।...দাবি আছে সকলের, কিন্তু দরদ নেই।...

ললিতাকে আর ভাববার অবসর দিলে না ভূপেশ—গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লো।

রাত্রে বিছানায় শুতে এলে সে যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়—কে বলবে যে সারাদিনের মধ্যে সে একবার চেয়েও দেখে না ললিতার মুখের দিকে।

আদরের চোটে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে ললিতার। ভূপেশের সেদিকে খেয়ালই নেই। আদর করতে করতেই কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে —আমাদের আর একটি ছেলে হলে বেশ হয়, না?

ছেলের সাধ যেন কিছুতেই মিটতে চায় না ভূপেশের।

ছুটির দিন। তবু অন্যদিনের তুলনায় অনেক ভোরেই আজ ঘুম ভেঙ্গে গেছে অনুপের।

আকাশ ফর্সা হবার আগেই ওর মা উঠে ঘরের মধ্যে ঘুরঘুর করছিলেন। একা মা নন, আরো অনেকে। পাতলা ঘুমে তখনও চোখ দুটো জড়িয়ে ছিল অনুপের।

ঘরের মধ্যে চাপা গলায় কারা যেন কথা বলছিলেন।

ঘুমের ঘোর কেটে যেতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।—দিদিরা আজ চলে যাচ্ছেন। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল অনুপের। সত্যি সত্যিই ওঁরা চলে যাবেন আজ!

না গিয়ে করবেনই বা কি? কাকা না কি ওদের—

থাকার ব্যবস্থা অবশ্য তিনিই করে দিয়েছেন—শান্তিনগর কলোনীতে।

দেশের জমি বিক্রি করে কিছু টাকা পেয়েছিলেন অবিনাশবাবু। সেই টাকা দিয়েই ঘর তুলে নিয়েছেন। পাকা বাড়ী না হলেও বাড়ী তো! অন্যের রাজপ্রাসাদের চেয়ে নিজের কুঁড়েঘরও ভালো।

দিদি চলে গেলে অনুপ মায়ের কাছেই বসে রইল।

মাথায় হাত দিয়ে তিনি বসেছিলেন স্তব্ধ হয়ে—ভাঙ্গা গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল।

অনুপের চোখও কি শুকনো ছিল? ছিল না। দুঃখে তারও কান্না পেয়েছিল।

শুধু দুঃখ নয়, রাগও হচ্ছিল। রমলাকে লক্ষ্য করে বলে ফেললো—চল না মা, আমরাও চলে যাই এ বাড়ী থেকে।

রমলা যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন ওর কথা শুনে। ছল-ছল দৃষ্টিটা ওর মুখের দিকে রেখে নির্বাক হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

অনুপ তাঁর আরো কাছে এগিয়ে বসলো।

অনুপের মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি শান্ত গলায় বললেন—ছিঃ বাবা, নিজের জনের উপর অভিমান করতে নেই।

নিজের জন—কথাটা শুনে হাসি পেল অনুপের। বললে—নিজের জন যখন পর হয়ে যায়, তখন সে যে পরেরও বাড়া মা।

রমলার চোখে মৃত্যুশোকের মত করুণ এক ব্যথাতুর দৃষ্টি ফুটে উঠলো। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—বোকা ছেলে, নিজের জন কখনো পর হয়?

এমন একটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি কথাটা বললেন যে অনুপ আর উত্তর দিতে পারলো না। মায়ের পাশেই চুপ করে বসে রইল।

প্রতিদিনের মতই রোদ উঠলো যথাসময়ে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল।....মা শুয়ে পড়েছেন, না ঘুমোলেও চোখ বুজে আছেন।

দিদিরা চলে যাওয়ায় বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে। দিদির বাচ্চা মেয়ে দুটো যেন বাড়ীটাকে ভরে রেখেছিল।

বাড়ীতে মন টিকছিল না অনুপের। কিন্তু দুপুরবেলায় কারো বাড়ীতে তো বেড়াতে যাওয়া চলে না!

বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে সোজা এসপ্লানেড-এ এসে নামলো।

হাঁটতে হাঁটতে ইডেন-গার্ডেন-এ চলে এল সে। নির্জন একটা

জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো ঘাসের উপর। রোদে পুড়ে পুড়ে ঘাসের সবুজ রঙ হলদে হয়ে এসেছে।

নিজের অজান্তেই বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো অনুপের।

রোদের তেজ পড়ে গেল। বিকেলের আলোও ম্লান হয়ে এল একসময়।

একলা বসে থাকতে আর ভাল লাগলো না। আনমনা ভাবে রাস্তায় নেমে পড়লো অনুপ।

কোথায় যাওয়া যায়? না, এখুনি বাড়ী ফিরবে না অনুপ।

এসপ্লানেডে এসে শ্যামবাজারের ট্রামে চেপে বসলো। বারীনবাবুর ওখানেই যাওয়া যাক।

বারীনবাবু না থাকলেও বাণী তো আছে। ওখানে গেলে আজও কি অরবিন্দর সঙ্গে দেখা হবে? অসম্ভব নয়। কিন্তু রাজনীতির কচকচি আজ আর শুনতে ইচ্ছে করছে না অনুপের।

অরবিন্দ না-ও তো আসতে পারে। বাণী হয়তো এখন একলাই আছে বাড়ীতে।

সপ্তাহ ঘুরে এল দেখতে দেখতে। রবিবার। সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রমলা এসে তাড়া দিলেন অনুপকে।—আজ তো আপিস নেই, দিদির ওখান থেকে ঘুরে আয় না?

যেতে হল। অনুপেরও যে যাবার ইচ্ছে ছিল না, তা নয়।

চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লো সে। অরবিন্দর সঙ্গে দেখা করে তবে দিদির ওখানে যাবে। আগের দিন বাড়ীতে এসে অরবিন্দ ধরতে পারেনি ওকে।

শান্তিনগরের নাম শুনেই সে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললে—চল, আমিও যাবো--গ্রামের বাতাস গায়ে লাগিয়ে আসি।

একসঙ্গে রওনা হল দু'জনে। দিদির বাড়ী পৌঁছুতে প্রায় দশটা বাজলো।

ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে প্রায় মাইল দুয়েক পথ। গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ভদ্রলোক নেই বললেই চলে—বেশির ভাগই চাষী শ্রেণীর। বাদবাকী যারা আছে তারা কাছাকাছি কোন কলকারখানায় কাজ করে।

দীন-দরিদ্র চেহারা মানুষগুলোর। ঘর-বাড়ীর চেহারাও তেমনি—টিনের চাল, চাঁচের বেড়া। অনুপের দিদির বাড়ীটা ঐ ঘরগুলি থেকে অন্য রকম নয়।

আস্তে আস্তে বাড়ীর দাওয়ায় গিয়ে উঠলো ওরা।

অবিনাশবাবু বাড়ী ছিলেন না। ছোট মেয়েটাকে ডাক্তার দেখাতে গেছেন—ক'দিন থেকেই নাকি সে জ্বরে ভুগছে।

দিদির সঙ্গে দেখা করেই অরবিন্দ বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

উঠোনে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসে দু'জন চাষী গোছের লোক কথা বলছিল, অরবিন্দ গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলে।

অনুপ বারান্দাতেই বসে রইল। দিদির সঙ্গে কথা বলছিল।

উঠোনে দেখতে দেখতে আরো জনকতক লোক এসে জমা হল। ...ছুটির দিনে রোজই নাকি ওদের এই রকম মজলিস বসে। চাষ-আবাদ, মজুরি-ভাতা নিয়েই আলোচনা করছিল তারা।

অরবিন্দ পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেললো। সবাই যেন কতকালের চেনা ওর।

দিদি না খাইয়ে ছাড়লো না ওদের। চাষী-শ্রমিক পরিবারের পাশে দিদিকে সংসার পাততে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল অনুপের।

বাড়ী ফেরার পথে তাই সে চুপ করেই ছিল। কথা বলেনি অরবিন্দর সঙ্গে!

পাশাপাশি হেঁটে চলেছিল দুজনে। অনুপকে চুপ করে থাকতে দেখে অরবিন্দ হঠাৎ একটা ধাক্কা দিলো ওর কাঁধে—কি হে, এত কি ভাবছো?

অনুপ হাসতে চেষ্টা করলো। কিন্তু অরবিন্দকে ফাঁকি দেওয়া গেল না।

অনুপের চিন্তা অনুসরণ করেই যেন সে একটা নিঃশ্বাস ফেললো দুঃখের সঙ্গে।

পথ চলতে চলতে অনুপের দিকে একটা সহানুভূতির দৃষ্টি ফেলে বললে—এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই অনুপ।···মধ্যবিত্তও আজ সম্পূর্ণ বিত্তহীন হয়ে পড়েছে। কৃষক-শ্রমিকের পাশে এসেই তাই আজ তাকে দাঁড়াতে হবে—তা নইলে সে-ও যে বাঁচতে পারবে না।

অনুপ কি ভয় পেয়ে গেল! বিহ্বল হয়ে পথ চলছিল।

অরবিন্দ ওর হাতটা জোরে চেপে ধরে বলে উঠলো—বি ব্রেভ্। মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড্, বি ব্রেভ্।

অনুপ শক্ত করে ধরে রাখলো ওর হাতটা।

বাণী জোর করে নিয়ে না গেলে মানসী আজ কিছুতেই যেত না ওদের বাড়ীতে।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়েই হঠাৎ বাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, এ-ই বা কে ভেবেছিল!

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। পরীক্ষার জন্যেই অনেক দিন সিনেমায় যাওয়া হয় নি। মীরার সঙ্গে সে তাই আজ ম্যাটিনিশো-তে সিনেমা দেখতে এসেছিল।

কাজের নাম করে মীরা সরে পড়লো, কিন্তু মানসীকে বাণী ছাড়লো না কিছুতেই। বললে—সে কি হয়?···বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে চলে যাবে?—

যাবার ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হল।

বাড়ীর সামনে গিয়েই মানসী একেবারে অপ্রস্তুত। সদর দরজাতেই অরবিন্দর সঙ্গে দেখা। এখানেও এসে হাজির হয়েছে। এমন

জানলে মানসী কিছুতেই আসতো না বাণীদের বাড়ীতে। তবে এসেই যখন পড়েছে, না ঢুকে উপায় কি?

বাণী নিজের ঘরে নিয়ে এল হুজনকে।

ঘরে ঢুকে তক্তাপোষের উপর বসে পড়লো মানসী—গম্ভীর মুখে। আর অরবিন্দ এগিয়ে গেল টেবিলের সামনে—বাণীর পড়ার টেবিল। চেয়ারে বসেই খবরের কাগজের উপর উপুড় হয়ে পড়ল—ভীষণ একটা জরুরী খবর যেন ওকে এখুনি জেনে নিতে হবে।

—চা নিয়ে আসি।—বলেই বাণী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অরবিন্দর সামনে মানসীকে একলা বসিয়ে রেখেই চলে গেল!

চাকরকে ডেকে কি চায়ের কথা বলা যেত না? নিজে যাবার কী দরকার ছিল?

বাণী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ তার হাতের খবরের কাগজটা ভাঁজ করে সরিয়ে রাখলো।

মানসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—পরীক্ষা কেমন হল?

কথাটা শুনেই রাগ ধরে গেল। আমার পরীক্ষার খবরে তোমার দরকার কি?

ভদ্রতার খাতিরে তবু উত্তর দিতে হল।—একরকম। অন্যদিকে তাকিয়েই কথাটা বললে মানসী।

—একরকম মানে?—অরবিন্দ হেসে বললে: আপনারা মেয়েরা সত্যি বড় বিনয়ী, পরীক্ষা ভাল দিয়েছেন, সেটা বলতে পর্যন্ত নারাজ।

—ভাল দিলে তো বলবো?

—সে তো ঠিকই।—অরবিন্দ আবার হেসে উঠলো—ঠাট্টার ভাবে। সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানও কি নেই ওর?

—আপনি দেখছি চটে যাচ্ছেন।

মানসী জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।...বাণী ঘরে ঢুকতে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

বাণীর হাতে খাবারের রেকাবি। রেকাবির দিকে তাকিয়ে

উল্লসিত হয়ে উঠলো অরবিন্দ—ভাল সময়েই এসে পড়েছি দেখছি, একেই বলে লাক্।—কথাটা শুনে মানসীর হাসি পেয়ে গেল।

হেসে ফেলেছিল হঠাৎ, সামলে নিয়ে আবার গম্ভীর হয়ে রইল।

ছোকরা-চাকর ট্রে করে চা দিয়ে গেল।

হাসি হাসি দুটি চোখ অরবিন্দর দিকে তুলে বাণী বললে—ভাগ বসালেন তো?

আড় চোখে মানসীর দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ উত্তর দিলে—ভাগীদার দেখে আপনার অতিথি যেরকম মুখ ভার করে আছেন, তাতে সত্যি ভয় করছে।—বলেই আবার হেসে উঠলো—সশব্দে। মানসীর দিকে তাকিয়ে বাণীও হাসলো মুখ টিপে। মানসী গম্ভীর হয়েই রইল।

বাণী খাবার পরিবেশন করতে বসলো।

খেতে খেতে ওরা দু'জনে গল্প জুড়ে দিলে।

গল্পের ফাঁকে বাণী হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা জ্বালিয়ে দিলে একসময়।

সাদা আলোয় আলোকিত হল সারা ঘরখানি, ঘরের টেবিল, বুকসেলফ্‌টিও।

বুকসেলফের একখানি বই লক্ষ্য করে অরবিন্দ হঠাৎ বলে উঠলো—'সোসিয়লিজম্ অ্যাণ্ড ওয়ার'—আপনিও পড়ছেন!

—কেন? শুধু আপনাদেরই মনোপলি? ওসব বই পড়ার অধিকার আর কারো নেই নাকি?—বাণী ঠাট্টার ভঙ্গীতে উত্তর দিলে।

—নিশ্চয়ই আছে।—একটু কি যেন ভাবলো অরবিন্দ, তারপর বললে—সোসিয়লিজম্-এর কথা সবাইকেই আজ জানতে হচ্ছে—চরম সুবিধাবাদীকেও। একেই বলে ইতিহাসের পরিহাস!

মুখে একটা হাসি হাসি ভাব নিয়ে বাণী বললে—আমাদের দেশেও তো এখন সোসিয়লিজম্ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

বাণীকে কথা শেষ করতে দিলে না অরবিন্দ। টিপ্পনি কেটে

বললে—কিন্তু দেশের মূর্খ বুভুক্ষিত মানুষগুলো সে-কথা এখনও বুঝতে পারছে না।

অরবিন্দ হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে—কি যেন ভাবতে থাকে। একটু পরে নীরবতা ভেঙ্গে বলে ওঠে—সমষ্টিগতভাবে আমরা এখন তিনটা যুগের আবহাওয়ায় দিন কাটাচ্ছি।···কতগুলি ফিউডাল কুসংস্কার এখনও বলবৎ আছে—মনের অবচেতন-সচেতন স্তরে।···বুর্জোয়া-পাতিবুর্জোয়াসুলভ লোভেরও সীমা নেই। এর উপর যখন বর্তমান ছুনিয়ার সঙ্গে পোশাকী একটা মিল খাওয়ানোর চেষ্টায় সোসিয়লিজম্-এর বুলি আওড়ানো শুরু হয়, হিপক্রিসিটা তখন আরো প্রকট ও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।—অরবিন্দর দৃষ্টিটা বড় তীক্ষ্ণ-নিষ্ঠুর মনে হয়।

বাণী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, অরবিন্দ তার আগেই আবার বলে উঠল—উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা কার হাতে এবং সেটা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা দেখতে হবে তো?···সমাজব্যবস্থার তারতম্য এই একটি প্রশ্নের উপরই নির্ভর করে।···

টেবিলের উপর টাইম্‌পিস্‌-এর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ছটফট করে ওঠে সে —সাত-টা!

এক চুমুকে বাকী চা-টুকু নিঃশেষ করে উঠে পড়ে অরবিন্দ—চলি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বেরিয়ে যায়।

খানিক বাদে মানসীও উঠে পড়ল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে এসেছে, আকাশে তারা ফুটেছে—অনেকগুলো। তারা, না যেন জুঁইফুল!

দ্রুতপায়ে মানসী বাড়ীতে চলে এল। দোতলায় না গিয়ে কি ভেবে যেন অনুপের ঘরে গিয়ে বসলো সে।

টেবিলের সামনে বসে অনুপ বই পড়ছিল। মানসীকে দেখেই বই থেকে মুখ তুললো—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? হেসে জিজ্ঞেস করলে।

বলার ইচ্ছে হলেও কথাটা বলতে পারলো না মানসী।

বলতে পারলো না যে এতক্ষণ অরবিন্দদের সঙ্গে বসে সে আড্ডা দিয়েছে। অরবিন্দর নাম সে কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারলো না।

শুধু বললে—বাণীদের ওখানে বেড়াতে গেছলাম।

অনুপ তাতেই দারুণ খুশি। এক মুখ হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি বললে ?

—কি আর বলবে ? তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে—

—ধ্যেৎ—বইটা বন্ধ করে অনুপ মানসীর দিকে তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

মৃদু হেসে মানসী জিজ্ঞেস করলে—কি বই ওটা ?

উত্তর না দিয়ে অনুপ বইখানা এগিয়ে দিলে মানসীর হাতে।—'অরিজিন্ অব্ দি ফ্যামিলি'—এঙ্গেল্‌স্।

এসব বই ওদের বাড়ীতেও এসে ঢুকলো শেষ পর্যন্ত।...বই কেনা আর বই পড়ার অভ্যাস মানসীর বাবারও যে ছিল না, তা নয়। বাইরের ঘরে তিন তিনটে আলমারি তো বইয়ে বোঝাই হয়ে আছে। সেক্সপীয়র, মিলটন, শেলী, কিটস্ থেকে শুরু করে ইবসেন, ভিক্টর হুগো, জোলা, গোগল, বার্নাড শ, রোঁমা রোঁলা—সবার লেখাই আছে। খুঁজলে তাঁর আলমারিতে প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু পাওয়া যাবে না—শুধু মার্কসবাদী সাহিত্য।

ওসব বই মানসীর বাবা নিষ্ঠার সঙ্গে বর্জন করে চলেন। তাঁর মতে ওগুলো নাকি সাহিত্যই নয়।...

'অরিজিন্ অব্ দি ফ্যামিলি'—বইখানির পাতা উলটে চমকে উঠল মানসী। বইটা অরবিন্দর! প্রথম পাতাতেই তার নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে।

অনুপ তাহলে ওর কাছ থেকেই এসব বই নিয়ে আসে ? কি আছে এতে ?...

—তোমার পড়া হয়ে গেছে ?—মানসী জিজ্ঞেস করলে।

ঘাড় নেড়েই সম্মতি জানালো অনুপ।

—একটু নিয়ে যাচ্ছি।

—পড়বে ? মানসীর মুখের দিকে একটা বিস্মিত দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞেস করলে অনুপ।

—বই নিয়ে মানুষ আর কি করতে পারে ? মানসী হেসে ফেললো।

—তা-ও তো বটে। অনুপও হাসলো বোকার মতন।

আঁচলে বইটা ঢেকে নিজের ঘরে চলে এল মানসী—ওর বাবা এই বই দেখলেই হয়েছে !

বালিসের নীচে বইখানা এনে লুকিয়ে রাখলো মানসী। কিন্তু রাত্রে ঐ বইয়ের পাতায় মন বসাতে পারলো কি ?

খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল, অরবিন্দর নামটা দেখেই মেজাজ কেমন বিগড়ে গেল।···বড় বেশি অহঙ্কার ওর—সবজান্তা ভাব। বাণীই বা ওকে এত খাতির করে কেন ?

মুখে প্রতিবাদ করলেও মনে, মনে সে অরবিন্দকেই সমর্থন করে। যাকে বলে আপসে লড়াই। কেমন হেসে হেসে তর্ক করছিল।··· অরবিন্দর মতই অহঙ্কারী বাণী।

মেয়েদের গয়নাপরা, সাজ-পোশাক নিয়ে সব সময়েই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে সে।···

বড়মারও যেমন বুদ্ধি ! ওকে হাতে চুড়ি পরতে উপদেশ দিতে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—হাত দু'খানি অমন খালি করে রেখেছ কেন মা ?···বেশি না পর, একগাছি করে চুড়ি পরলে এমন কি দোষ হয় ?

উত্তরটা দিয়েছিল অনুপ।—কেন পরে না তা-ও জান না ? ঠাট্টার সুরে বলে উঠেছিল : গয়না পরলে পুরুষের সমান অধিকার দাবি করবে কি ভাবে ?

কাজের তাড়ায় মানসীর বড়মা ঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেছলেন। তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অনুপকে লক্ষ্য করে বাণী ভুরু কুঁচকে বলে উঠেছিল—ঠিকই তো, সমান অধিকার পেতে হলে সাজ-পোশাক নিয়ে মেয়েদের এতটা মাথা ঘামানো উচিত নয়।

কিন্তু ভাল পোশাক যে সৌন্দর্য বোধেরই পরিচয় দেয়, এটা বাণী অস্বীকার করে কি ভাবে?

হ্যাঁ, পোশাকের ব্যাপারে সে একেবারেই সেকেলে।...চুলবাঁধার ধরনটা পর্যন্ত ওর সেকেলে মেয়েদের মতন। এমন টেনে খোঁপা করে যে কপালখানা সম্পূর্ণ বেরিয়ে থাকে। কপালটা ওর একটু চওড়া বইকি মুখের তুলনায়!

কিন্তু সাদাসিধে ঐ মেয়েটিকে সবাই এত খাতির করে কেন? এমন কি, ঐ অহঙ্কারী লোকটি পর্যন্ত।

ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল মানসী। শিথিল হাত থেকে অনুপের ধার-দেওয়া বইখানি কখন যে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো সে টেরও পেল না।

সন্ধ্যেবেলায় দুই বন্ধুতে বসে গল্প করছিল।

ওদের গল্প করতে দেখেই না ললিতা এসে উপস্থিত হল! আর ললিতার পিছন পিছন বাণীও তখুনি ঘরে ঢুকলো। হাতে একটা মিষ্টির বাক্স।

বাক্সটার দিকে তাকিয়ে ললিতা জিজ্ঞেস করলে—কি ব্যাপার, মিষ্টি কিসের?

বাণী হাসলো একটু, কোন উত্তর দিলে না।

উত্তর দিলে বারীন। উৎসাহিত হয়ে বললে—নতুন রোজগারের টাকায় সবাইকে মিষ্টি খাওয়াতে ইচ্ছে হয়েছে।—ভূপেশকে লক্ষ্য করে বললে—গেল মাস থেকে ও চাকরিতে ঢুকেছে, শোন নি?

—না তো ?—ভূপেশ আশ্চর্য হয়ে যায়।

শুধু ভূপেশ নয়, ললিতাও। অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করেছে বাণী।···বারীন নিজেও তো পণ্ডিত মানুষ, মেয়েকে এম.এ. না পড়িয়ে হঠাৎ চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলে !

টিপয়ের উপর মিষ্টির বাক্সটা রেখে বাণী আস্তে বেরিয়ে গেল। অনুপ ওদের ঘরে গিয়ে এখন আড্ডায় বসবে নিঃসন্দেহ। বাপের মতই আড্ডাবাজ হয়েছে মেয়ে।

অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে ললিতা বারীনকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলো —চাকরি নিল কোন স্কুলে ?

—স্কুলে নয়, অফিসে।

—অফিসে ! ভূপেশ অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল : অফিসে চাকরি নিতে গেল কেন ?···একান্ত যদি চাকরি করতেই হয়, তাহলে শিক্ষার লাইনই তো ভালো মেয়েদের পক্ষে।

বারীন প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকে।—শুধু শিক্ষার লাইন আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে কেন ?···সমান অধিকার পেতে হলে সর্বপ্রকার সামাজিক শ্রমে মেয়েদের অংশ নিতে হবে।

কথাটা মানতে রাজী নয় ভূপেশ। বললে—সে তুমি যা-ই বল না কেন, অফিসের চাকরি মেয়েদের পক্ষে—

একটু থেমে বললে : মেয়েরা অফিসে ঢুকবার পর থেকে অফিস-গুলো শুনছি নাকি 'বৃন্দাবন' হয়ে উঠেছে।

—না, না, এ তুমি একেবারেই ভুল বলছো ভূপেশ। বারীন তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল : একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যদি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তাতেই বা দোষের কি আছে ?

—ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব !—ব্যঙ্গের সুর ভূপেশের গলায় : ওটা আত্মবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়।

বারীন এবার দস্তুরমত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে—এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা—ফ্রয়েডের যুগের কথা।

ফ্রয়েড-কে নিয়ে দুই বন্ধুতে তর্ক চললো কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় কথা থামিয়ে বারীন বললে—চলি, বাণীকে নিয়ে আবার নেমন্তন্নে যেতে হবে।

—নেমন্তন্ন! কোথায়? ললিতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেললো।

—সুলেখাদের ওখানে। বলেই উঠে পড়ল।

যাবার সময় অত অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল কেন ওঁকে?

এত কাল বাদে হঠাৎ আবার সুলেখার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, বারীন কি ভাবতে পেরেছিল কখনো?

ভাবতে সত্যিই পারে নি। ওর কথা তো একরকম ভুলেই গিয়েছিল সে। মনে রাখার মত ছিলই বা কি ওদের মধ্যে? এক সঙ্গে কয়েক বছর পড়েছে ছাড়া তো কিছু নয়। আরো মেয়েও তো পড়তো ওদের সঙ্গে! সহশিক্ষা তখন পুরোদমে চালু হয়ে গেছে।

একসঙ্গে পড়লেও ছেলেদের দিকে সুলেখা ফিরেও তাকাতো না। বরাবরই ও একটু গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। কালো ছিপছিপে গড়নের এই মেয়েটিকে কোনমতেই সুন্দরী আখ্যা দেওয়া চলে না। মুখের মধ্যে সুন্দর শুধু ওর চোখ দুটি। উজ্জ্বল-প্রশান্ত দুটি চোখে যেন সমুদ্রের গভীরতা!

ক্লাসে মাথা নীচু করে সুলেখা তন্ময় হয়ে লেকচার শুনতো, নোট নিত।···ভালবাসায় না পড়লেও ক্লাসের ছেলেরা ওকে শ্রদ্ধাই করতো মনে মনে।

এ হেন গম্ভীর মেয়ে একদিন কি একটা ছেলেমানুষি করে ফেললো! ঘটনাটা মনে হলে এখনও কেমন আশ্চর্য লাগে বারীনের।···

ভালো স্টুডেন্ট বলে প্রফেসর ঘোষ ওদের দু'জনকেই স্নেহ করতেন। নিজের বই দিয়েও সাহায্য করতেন। বই দেওয়া-নেওয়ার সূত্রেই ওদের পরিচয় হয়েছিল। পরিচয় হলেও ঘনিষ্ঠতা হয় নি।

এম, এ পরীক্ষার মাস কয়েক আগেকার সেই ছোট্ট ঘটনায় তাই বেশ কৌতুক বোধ করেছিল বারীন।

অনিমাকে তখনও বিয়ে করেনি সে।··· অনিমার আবদার রক্ষা করার জন্যেই না বারীনকে তার প্রাইভেট ছাত্রের কাছ দেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে নিজের একটা ছবি তুলে আনতে হল। জীবনে সেই তার প্রথম ফটো তোলা।

এক কপি অনিমা, এক কপি ভূপেশ, বাকীটা মডার্ন হিসট্রির একখানা বইয়ের ভেতর গুঁজে রেখেছিল। ভূপেশের কাছে বারীনের ফটো দেখে নির্মল এসে ধরে বসলো—তারও একখানা চাই।

নির্মলকে দেবার জন্যেই ছবিটার খোঁজ পড়লো। সামান্য একটা ছবি দিয়ে যদি কাউকে খুশি করা যায়।....

কিন্তু ছবিটা পাওয়া গেল না। হঠাৎ মনে পড়লো—যে বইখানা সে সুলেখাকে পড়তে দিয়েছে তার ভেতরই ছিল ছবিটা—তাড়াহুড়োয় বের করে নিতে ভুলে গেছে।

বইটা ফেরত আনতে গিয়েছিল সে।

চাইবার আগেই সুলেখা বইখানা এনে ওর হাতে এগিয়ে দিলে। কিন্তু পাতা উলটে ছবিটা খুঁজে পেল না বারীন।

—কিছু হারিয়েছে বুঝি?—স্মিত হেসে সুলেখা জিজ্ঞেস করেছিল।

—হ্যাঁ, একখানা ফটো—

—ফেরত চাই?

ইচ্ছে থাকলেও ছবিটা ফেরত চাইতে পারলো না বারীন।

মাস কয়েক বাদে সুলেখা নিজেই ডাক যোগে ফিরিয়ে দিয়েছিল ফটোখানা।

পরে লোকমুখে সুলেখার বিয়ের খবর পেয়েছিল বারীন—নেমন্তন্ন পায় নি।

দেখাও হয়নি আর। বিয়ের পরেই তো সে বাংলার বাইরে চলে গেছল—স্বামীর কর্মস্থলে।

বদলির চাকরি ভদ্রলোকের, কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছেন এক যুগ বাদে।

কলকাতায় এসে সুলেখাই খুঁজে বের করেছে বারীনকে।...স্বামী-পুত্র নিয়ে হঠাৎ একদিন বাড়ীতে এসে হাজির। চেনাই যায় না ওকে—দিব্যি গিন্নীবান্নি চেহারা।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে খুশিই হয়েছে বারীন—অতি অমায়িক লোক। যেমন স্বাস্থ্য, তেমন চেহারা। ছেলেটিও দেখতে সুন্দর, বাপের মতই। সুদর্শন নাম সার্থক ওর। বয়স এগার-বার—তার বেশি নয়। মাথায় এর মধ্যে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা হয়ে উঠেছে।

সুলেখার নির্দেশমত বারীনকে এসে প্রণাম করলে ছেলেটি।

বাণীকে দেখে কি খুশি সুলেখা।—দারুণ সার্প মেয়ে!...

ওদের বাড়ীতে যাবার জন্যে অনেক করে বলে গেছল সুলেখা। কাকুলিয়া রোডে বাড়ী। ঠিকানা নোটবুকে লেখা থাকলেও এক মাসের মধ্যে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি।....

আই. এ. ক্লাসের জন্যে ইতিহাসের একখানা নতুন বই লিখেছে বারীন—বইটা ছাপানো নিয়ে ঝামেলা চলেছিল পাবলিসারের সঙ্গে। নিজের মাইনেয় খরচ চলে না বলেই সে অবসর সময়ে পাঠ্যপুস্তক লেখে। শুধু তো নিজের খরচ নয়। বাণীর মেসোর এখন আর উপার্জন করার সামর্থ্য নেই। ওঁদের সংসারও দেখতে হয়। বাণীর চাকরিতে ঢোকার মূলেও এই কারণ—বাপকে সে বেশি খাটতে দিতে চায় না।

বিকেল বেলায় সেদিন বাণীই একরকম ধরে নিয়ে গেল সুলেখাদের বাড়ীতে। একদিন দেখেই সুলেখামাসীকে সে ভালবেসে ফেলেছে।

বেলা থাকতেই পৌঁছে গেল ওরা।

একতলা বাড়ী। বাড়ীর ভেতর দিকের বারান্দায় ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে সুলেখা বই পড়ছিল। বারীনকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো—আপনি!

গৃহস্বামী বাড়ীতে ছিলেন না।

সুদর্শন বাইরের ঘরে বসে রেডিও শুনছিল, বাণী তার কাছে গিয়ে বসলো।

বারীনকে পড়ার ঘরে নিয়ে এল সুলেখা।

ঘরে ঢুকে বললে—এই ঘরটি আমার একেবারে নিজস্ব।

ঘরতো নয়, ছোটখাট একটি লাইব্রেরি।

বইয়ের আলমারিগুলির দিকে তাকিয়ে ভারী ভাল লাগছিল বারীনের।

সুলেখাকে লক্ষ্য করে বললে—পড়াশুনার নেশাটা তাহলে এখনও ছাড়তে পারেন নি?

অল্প হেসে সুলেখা উত্তর দিলে—ও-নেশা কি ছাড়া সহজ? ধরাও যেমন, ছাড়াও তেমনি কঠিন—আপনাদের বর্মা চুরুটের চেয়ে কম কড়া নয়।

কথাটা শুনে বারীন কৌতুক বোধ করেছিল বইকি!

মৃদু হেসে অন্য একটি আলমারির দিকে এগিয়ে গেল সে। সোসিয়লজির বইয়ে ঠাসা আলমারিটি।

—ইতিহাস ছেড়ে এখন সোসিয়লজি নিয়ে গবেষণা সুরু করেছেন বুঝি?—ঠাট্টার ছলে বারীন জিজ্ঞেস করলে।

হালকা হেসে সুলেখা উত্তর দিলে—সোসিয়লজি ছাড়া ইতিহাসের ব্যাখ্যা যে অসম্পুর্ণ থেকে যায়।...

কথাটা নতুন নয়, তবু বাড়ী ফিরে এসে সুলেখার এই কথাটা কেন যেন বার বার মনে পড়েছে।

ভাবতে ভাবতে মাথায় হঠাৎ একটা নতুন আইডিয়া এসে গেল বারীনের। আইডিয়াটা মাথায় কিছুদিন থেকেই ঘোরাফেরা করছিল। ঠিক দানা বাঁধে নি, নেবুলা অবস্থায় ভাসমান ছিল বলা চলে।...ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা করতে হবে—ভারতবর্ষের ইতিহাস।

অরবিন্দর সঙ্গে দেখা করেই বাড়ী ফিরে আসবে, এই কথা ভেবেই তো সন্ধ্যেবেলায় বাড়ী থেকে বের হয়েছিল অনুপ।

কিন্তু অরবিন্দ ছাড়লো না ওকে—বাণীদের ওখানে টেনে নিয়ে গেল।—এত শীগগির বাড়ী ফিরে কি হবে? খানিকটা আড্ডা দিয়ে আসা যাক।

সন্ধ্যার দিকে কোন কাজ না থাকলেই অরবিন্দ আড্ডায় গিয়ে বসে। ঘরে বসে থাকা ওর ধাতে পোষায় না। কলকাতা শহরে বন্ধু-বান্ধবের ওর অন্ত নেই।

বাণীদের বাড়ী ওর আস্তানা থেকে কতই বা আর দূর! হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগে না।

সোজা বাণীর ঘরে গিয়ে বসলো দু'জনে। বাণী তখুনি ফিরেছে অপিস থেকে। বাসের জন্যে নাকি একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। বিকেলবেলায় মানুষের ভীড় ঠেলে ট্রামে বাসে জায়গা পাওয়া কি সহজ কথা!

—এই ফিরছেন?—বাণীকে লক্ষ্য করে অরবিন্দ বলে উঠলো। একটু থেমে বললে—অপিসটা তাহলে চালিয়ে যাচ্ছেন?

—এখনও যাচ্ছি তবে কতদিন পারবো জানি না।

অরবিন্দ উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল বাণীর দিকে।

আলগা হাসি হেসে বাণী বললে—উপরওয়ালার পায়ে তেল দেওয়া—

—তাহলে চাকরি করতে গেছেন কেন?—অনুপ হঠাৎ বলে ফেললো: উপরওয়ালার পায়েই যদি তেল দিতে না পারবেন—

কথাটা শুনে দৃষ্টিটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বাণীর। অনুপের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো—আপনি দেখছি অরবিন্দবাবুর শিষ্য হয়ে উঠলেন—সুযোগ পেলেই মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে এক চোট বক্তৃতা।

সুযোগ পেলেই বাণী অরবিন্দর উপর এক হাত নেয়। ভাবও

ওর বেশি অরবিন্দর সঙ্গে। অনুপ কলকাতায় আসার আগে থেকেই তো ওদের পরিচয়।

তবে অনুপকে সে অপছন্দ করে বলে মনে হয় না।···নিজের জন্মতিথিতে সে একলা অরবিন্দকেই তো নেমতন্ন করতে পারতো। কিন্তু তা করেনি।

অনুপকে লক্ষ্য করে একরকম আবদারের ভাবেই বলে উঠলো— কাল আমার জন্মদিন, আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি, না এলে ভীষণ রাগ করবো কিন্তু।

নেমতন্ন যখন করেছে যেতেই হবে।···কিন্তু খালি হাতে তো যাওয়া চলে না!

বাড়ী ফিরে ভাবতে বসলো অনুপ—কি উপহার দেওয়া যায় বাণীকে? ও তো সাধারণ মেয়েদের মত সৌখিন জিনিসে খুশি হবে না। এক দেওয়া যায় বই। কি বই দেবে?···

বই নয়, কবিতা। নিজের লেখা একটি কবিতা প্রেজেন্ট করা চলে না? আইডিয়াটা নতুন, নিঃসন্দেহ।

জন্মদিন মানুষের নবজন্মের উৎসবতিথি। প্রতি বছর এই দিনটিতে মানুষ নতুন মূল্যে—নতুন সম্ভাবনায় বিকশিত করতে চায় আপনাকে।···বাণীর জন্মতিথিও নতুন মূল্যে, নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে উঠুক।

অনুপ কাগজ-কলম নিয়ে বসলো—তখুনি। কবিতাটি লেখা শেষ না করে উঠলো না। "জন্মদিন"—হ্যাঁ, জন্মদিনে এই কবিতাটিই সে উপহার দেবে বাণীকে।··

আগে থেকে তোড়জোড় করলেও শেষ পর্যন্ত যাওয়াই হল না অনুপের। বেছে এই দিনটিতেই জ্বরে পড়ল সে। জ্বর এমন কিছু বেশি নয়, এইটুকু জ্বর নিয়ে সে অনায়াসেই যেতে পারতো।

কিন্তু যাবার উপায় আছে? বেরুনোর নাম করতেই মা হৈহৈ করে উঠলেন—পাগল হয়েছিস? জ্বর গায়ে—

যেতে না পেরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। খামে পুরে তাই-চাকরের হাতেই সে কবিতাটি পাঠিয়ে দিলে বাণীর কাছে। সঙ্গে চিঠিও।

সন্ধ্যেবেলায় মন খারাপ করেই শুয়ে ছিল অনুপ। কিন্তু থাকা গেল না। রাত আট-টা নাগাদ অরবিন্দ এসে উপস্থিত হল—আবার জ্বরে পড়েছ ?

বাণীর কাছেই নিশ্চয় ওর জ্বরের খবর শুনেছে।

অনুপের বিছানার উপরই এসে বসে পড়লো অরবিন্দ।

রমলা ঘরে ছিলেন না—পথ্য তৈরী করতে গেছেন।

অরবিন্দকে দেখে অনুপ উঠে বসলো বিছানার উপর।

—কত জ্বর ?—হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলে।

—সামান্য।

—খুব মিস্ করলে—প্রচুর আয়োজন করেছিল।

অনুপ চুপ করে রইল।

অরবিন্দ হঠাৎ অন্য কথা তুললো। বললে—তোমার কবিতাটা দেখলাম, চমৎকার লিখেছ।

মনটা খুশিতে ভরে গেল। নিজের লেখার প্রশংসা শুনলে কে না খুশি হয় !

অরবিন্দ মুচকি হাসলো। বললে—আজকের আনন্দটা তুমিই মাটি করে দিলে—

আনন্দ মাটি হল কিভাবে ?···পেট পুরে দিব্যি তো খেয়ে দেয়ে এসেছ।—অনুপ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল।

আগের কথার জের টেনে অরবিন্দ বললে—আমাদের : বাণী তো আজ ভাল করে কথাই বললে না—তোমার অসুখ শুনেই—।

বন্ধ ঘরে হঠাৎ এক ঝলক বসন্তের ওয়া ঢুকে পড়লো যেন। শরীর আশ্চর্য হালকা মনে হতে লাগলো পের—পাখীর পালকের মতন। অসুখের সমস্ত গ্লানি যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।···বাণী তাহলে কি—

চুরি করে এখন আর বাণীকে পড়তে হয় না অনুপের কবিতা।—অনুপ নিজেই এসে পড়ে শুনিয়ে যায়। লাজুক মুখে জিজ্ঞেস করে—কেমন লাগলো বল ?

ওরা আজকাল পরস্পরকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করে। প্রস্তাবটা অবশ্য এসেছে বাণীর তরফ থেকেই। অরবিন্দকেও সে 'তুমি' বলিয়ে ছেড়েছে। 'আপনি' ডাকটা সত্যি বড় দূরের—একটা পাঁচিলের মত খাড়া হয়ে থাকে বন্ধুত্বের মাঝখানে।

'তুমি' বলতে গিয়ে অনুপের মুখ এখনও কিন্তু লাল হয়ে ওঠে!··· সুকুমার মন। কিন্তু সুকুমার শান্ত ঐ ছেলেটির মধ্যে এত তেজ এল কোত্থেকে ?···ওর লেখা 'ফ্রাঙ্কেন্‌স্টাইন' কবিতাটি পড়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে বাণী।

বাস্তুহারা সমস্যাকে ও ফ্রাঙ্কেন্‌স্টাইন-এর সঙ্গে তুলনা করেছে।··· বাস্তুহারা জীবনের দুঃখ-বেদনা বীভৎসতা ছাপিয়ে কবিতাটির মধ্যে একটা সুস্থ-সবল প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে।···

'মধ্যাহ্নের খর-রৌদ্রতাপে,
কণ্ঠ তার বজ্রসম অভিশাপ হানে—।'

পড়তে গেলে গায়ের রক্ত যেন আগুন হয়ে ওঠে।

কবিতাটি বাবাকে না দেখিয়ে থাকতে পারলো না বাণী। বিকেল-বেলায় কলেজ থেকে ফিরে বারীন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন।

কবিতাটি পড়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। একবার পড়ে আশ মিটল না। জোরে জোরে আবৃত্তি সুরু করে দিলেন। এককালে খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন তিনি।

কবিতা পড়া শেষ না হতেই সুলেখা মাসিমা এসে ঘরে ঢুকলেন, বাণী ওঁকে মাসিমা বলেই ডাকে।

বিদুষী মহিলা, বর্তমানে ইতিহাসে অধ্যাপনা করছেন।

সুলেখাকে দেখেই বারীন থেমে গেলেন।—বসুন।

চেয়ারে বসে পড়লেন সুলেখা।

—একটা কবিতা শুনুন—অখ্যাত কবির রচনা।—বারীন আবার পড়তে সুরু করলেন গোড়া থেকে।

পড়া শেষ হলে সুলেখার দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগলো বলুন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তবে সুলেখা মুখ খুললেন। কড়া সমালোচনা করলেন কবিতাটির। বললেন—আমার মতে এটা ঠিক কবিতার পর্যায়ে পড়ে না। 'কবিতা' না বলে 'রাজনীতিক ইস্তাহার' বললেই ভালো হয়।···রাজনীতিকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তোলা—

বারীন কথাটা শেষ করতে দিলেন না। বললেন—হ্যাঁ। রাজনীতিকে সাহিত্যের পবিত্র অচলায়তনে ঢুকতে দেওয়া চলে না। কায়েমী স্বার্থ সর্বত্র এই ধরনের প্রচার কার্যই চালিয়ে থাকে। শ্রেণী সমাজের বেশির ভাগ সাহিত্যিকই তাই রাজনীতি বর্জিত নির্ভেজাল সাহিত্যের উপাসক।

—সাহিত্যেও ভেজাল মেশাতে চান?—সুলেখার কথায় ঠাট্টার সুর বাজলো।

বারীন তাঁকে আমলই দিলেন না। বললেন—হ্যাঁ, সাহিত্যিক যদি তাঁর কালের জীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক ব্যক্তিগত ভাব-বিলাসের ক্ষুদ্র পাঁকে ডুবে থাকতে চান, তাহলে অবশ্য রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও তাঁর চলতে পারে।···কিন্তু তাতে সাহিত্যের মূল্য অনেক কমে যায় না কি?

সুলেখা শান্ত গলায় প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন—সামাজিক কর্তব্য পালন করাই কি তাহলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য?

—কেন নয়?—বারীন দৃঢ়কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

একটু চুপ করে থেকে আপন আবেগে বলে চললেন—সাহিত্য-সৃষ্টি একটা সামাজিক ক্রিয়া। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর সামাজিক ক্রিয়া কখনো একটা ইম্‌পর্ট্যাণ্ট সোশ্যাল্ অ্যাক্ট্ বলে গণ্য হতে পারে

না।···বিগ্ সোশ্যাল্ কন্টেন্ট ছাড়া সাহিত্য বাঁচবে কি করে ?

সুলেখা গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন, বারীন সেদিকে খেয়াল না করেই অভিযোগের সুরে বলে উঠলেন—রাজনীতি বর্জিত বিশুদ্ধ শিল্পকলার আদর্শ আজ আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।···ব্যক্তিকেন্দ্রিক বুর্জোয়া সমাজেরই অভিশাপ এটা।—

রামলাল হঠাৎ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারলো—বাণীকেই খুঁজছিল সে।

চিংড়ির কাট্‌লেট্ ভাজতে বলা হয়েছিল ওকে, কিন্তু কি করে বসে আছে কে জানে—ভাজতে গিয়ে হয়ত পুড়িয়েই ফেলেছে।

বাণী রান্নাঘরের দিকে চলে এলো তাড়াতাড়ি।

চা-কাট্‌লেট্ নিয়ে সে যখন আবার বারীনের ঘরে ঢুকলো, ওদের আলোচনা তখনও শেষ হয়নি।

চায়ে চুমুক দিয়ে বারীন পুরানো কথার জের টানলেন—লিটারেচার্ ফর্ অল্ টাইম্‌স্—একটা অ্যাব্‌সোল্যুটিস্ট্ কন্‌সেপ্‌ট্।··· যুগের প্রতি সাহিত্যিকেরও একটা দায়িত্ব আছে, এ আপনি অস্বীকার করেন কি ভাবে ?

—যুগের প্রতি সাহিত্যিকের দায়িত্ব! আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।—সুলেখা মৃদু হাসলেন।

বারীন যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।—যুগের প্রতি সাহিত্যিকের দায়িত্ব নেই ?···বর্তমান যুগ আজ গর্ভবতী মায়ের মতই এক পরম জন্মলগ্নের অপেক্ষায় দিন গুনছে—দাসত্ব, শোষণ, দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে মানুষ আজ মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছে ···এই লড়াইয়ে সাহিত্য যদি মানুষকে প্রেরণাই না যোগাল, তাহলে সে-সাহিত্যের প্রয়োজন কি ?

তর্ক করতে গিয়ে কারো খেয়াল ছিল না যে আকাশটা মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে, হঠাৎ বিদ্যুতের চমক দেখে চমকে উঠলেন সুলেখা —ভীষণ মেঘ করেছে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন তিনি।

সুলেখা যেতে না যেতেই অনুপ এসে হাজির হল। অনেক দিন বাঁচবে। কিন্তু এই মেঘ-বাদলার দিনে ওর বেরুনো ঠিক হয়েছে কি?

অনুপকে বাণী নিজের ঘরেই এনে বসালো। যা লাজুক বারীনের সামনে খেতে দিলে হয়তো খেতেই পারবে না ভাল করে। চিংড়ির কাট্‌লেট্ দু-চারখানা বেশিই করেছিল বাণী, ওদের কথা মনে করে।

বিকেলে ওরা দু'টিতে প্রায়ই তো এসে হাজির হয়। অনুপ না এলেও অরবিন্দ আসে। খাবার দেখলে মহাখুশি, পাঁচ বছরের ছেলের মতই খুশি হয়ে ওঠে সে।

অনুপকে বসিয়ে রেখে চা-কাট্‌লেট্ নিয়ে এলো বাণী। অনুপের কিন্তু খাবারের দিকে লক্ষ্যই নেই। বাণীর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে—কতদিন যেন দেখেনি ওকে।

—আমার কবিতাটা পড়েছিলে?

—ঐ যা, একদম ভুলে গেছি।

—ভুলে গেছ!—মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে যায় অনুপের।

—চা-টা খাও আগে।—বাণী বলে।

—খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এলে আর খাওয়া যায় না?

—না।

বাণীর হাসি পায় ওর অভিমান দেখে। হাসি চেপে বলে—চা-না হয় না খেলে, কাট্‌লেট্-টা খাবে তো?

বড় বড় চোখ দুটো বাণীর মুখের দিকে তুলে ধরলো অনুপ—সত্যি বলছো, পড়নি কবিতাটা?

বাণী হেসে ফেললো—আচ্ছা ছেলেমানুষ তুমি,...এত জোরালো কবিতা লিখলে কি করে—তাই তো ভেবে পাই না।

চোখ-মুখ আলো হয়ে উঠলো অনুপের। সলজ্জ হেসে বললে—জোরটা হয়তো আমার নিজের নয়, আর একজনের কাছ থেকে পাওয়া।

—হয়েছে আর কবিত্ব করতে হবে না, খাওতো আগে।

অনুপ চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলে। আর তখুনি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো অরবিন্দ।—আগে-ভাগে এসেই বসে গেছ?—অনুপের দিকে চেয়ে বলে উঠলো।

মুখখানা অমনি বিমর্ষ হয়ে গেল অনুপের।

ক্ষুণ্ণ হল কথাটা শুনে? বন্ধুবান্ধব একটু ঠাট্টা-ইয়ারকিও করবে না?

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইন্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার ফল বের হল।

মানসীর রেজাল্ট্ দেখে সবাই অবাক—বারীন কাকা পর্যন্ত।··· নিজেদের দূরদর্শিতা প্রমাণ করবার জন্যে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন—আমরা আগেই জানতাম—

আগে মোটেই জানতেন না কেউ। মানসী নিজেই কি জানতো যে সে স্কলারশিপ্ পাবে?

জানতো না। ভেবেছিল, টেনেমেনে বড় জোর ফার্স্ট ডিভিশনে যেতে পারে।

স্কলারশিপের লিস্টে মানসীর নাম দেখে ভূপেশের আনন্দ ধরে না। বাবাকে এত খুশি হতে খুব কমই দেখেছে মানসী।

—কি চাই তোমার?—আদর করে জিজ্ঞেস করলেন।

মানসী কিছুই চায়নি। না চাইতেই সেদিন তিনি ওকে একটা 'পার্কার' পেন উপহার দিলেন—জুনিয়র পার্কার।

কিন্তু সমীর কোন গুরুত্বই দিলে না। বইয়ের পোকা বলেই নাকি মানসী স্কলারশিপ্ পেয়েছে। নিজে তো ফেল করতে করতে কোন রকমে পাস করেছেন।···ডিগ্রিটা নাকি নির্বোধের বুদ্ধির পাসপোর্ট।···লেখাপড়া সম্বন্ধে ওর মনে কোন রকম শ্রদ্ধা নেই।

কিসে যে ওর শ্রদ্ধা আছে! বিজয়ার পর গুরুজনকে প্রণামটা পর্যন্ত করতে চায় না। বলে—লোকের পায়ে মাথা খুঁড়ে মানুষ

নিজেকে কি করে যে অমন ছোট করে—

রমলা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—গুরুজনের সামনে মাথা নীচু করলে মানুষ ছোট হয় না, বড়ই হয়।

সমীর হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর কথা।

বড়মার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। মা-বাবার কথাই কি সে গ্রাহ্য করে?

করে না। তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা সম্বন্ধেও ওর মনে কোনো শ্রদ্ধা নেই। বলে—বাপ-মায়ের স্নেহ নিয়ে এত লাফালাফি করার কি আছে?…ও তো স্রেফ্ একটা ইন্‌স্টিটিউশন্যাল্ ব্যাপার।

মানসী অবাক হয়ে গেছে ওর কথা শুনে। সুবোধ কিন্তু হয়নি। হ্যাঁ, সুবোধের সামনেই তো বলেছিল কথাগুলো।

সুবোধ শুনে হেসে উঠেছিল। হাসির কথা নাকি এটা? মানসী দস্তুরমত চটে গেছল তাঁর উপর।…সমীরকে ও এমন করে লাই দেয় কেন?

মানসী স্কলারশিপ পেয়েছে, এ নিয়ে সুবোধেরও কোন উচ্ছ্বাস নেই। ব্যাপারটা যেন নজরেই পড়েনি তাঁর।

নজরটা তাঁর সর্বক্ষণ অন্য দিকে। মানসীর ব্লাউজের হাতাটা লক্ষ্য করে মুচকি হেসে বললো—একেবারে নান্ সেজে বসে আছ কেন?…এমন সুন্দর হাতখানা যদি ঢেকেই রাখলে—

হাতাটা সামান্য লম্বা ছিল ব্লাউজের—থ্রি কোয়ার্টারস্। লম্বা হাতা সুবোধের পছন্দ নয়। ওঁর ইচ্ছে, মলিদির মত হাত-কাটা জামা পরবে মানসী।

প্রায় ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপের মতই হাতা। না, মরে গেলেও মানসী ওরকম ব্লাউজ পরতে পারবে না। হাতকাটা জামা তো মানসীর মা-ও পরেন, কিন্তু ওরকম নয়। ইচ্ছে থাকলেও বাবার ভয়ে পরতে পারেন না।

মানসীকে আপ-টু-ডেট্ করতে অনেক চেষ্টা করেছেন মা। কিন্তু মানসীর ভালো লাগে না কাঁধ কাটা ব্লাউজ পরতে।

ওরকম ব্লাউজ পরলে কাঁধের উপর আঁচল তুলে সেই তো আবার হাতটা ঢাকতে হয়।

কিন্তু সুবোধের সামনে হাত ঢেকে রাখার উপায় আছে? এক টানে আঁচলটা সরিয়ে দেয়।…

মানসীর মা সেদিন প্রায় দেখে ফেলেছিলেন আর কি।…লজ্জা বলে কোনো পদার্থ নেই সুবোধের।

অস্বস্তি লাগলেও ওকে কিছু বলতে পারে না মানসী। দু'দিন বাদে ওর সঙ্গেই তো—

অসহ্য গরম। বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। বাতাসে মরুভূমির উত্তাপ।

পর পর দুটি সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। দু'সপ্তাহ আগে সুবোধ সে-ই যে একদিন দেখা করে গেল, তার পরেই হঠাৎ ডুব মারলো।

হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে সে এরকম উধাও হয় বইকি। আশ্চর্য খামখেয়ালী লোক। এই তো পূজোর ছুটিতে মানসীকে না জানিয়েই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দার্জিলিং ঘুরে এল—মলিদিও গেছল সঙ্গে।

মানসীকে লুকোতে চাইলেও খবরটা লুকোতে পারেনি সে। বড়মামাই ফাঁস করে দিয়েছেন।

কলকাতায় ফিরেই অবশ্য মানসীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। রাগ করে মানসী কথাই বলেনি অনেকক্ষণ।

হাত ধরে অনেক সাধ্যসাধনা করার পর তবে না কথা বলেছে।…

মানসী চুপ করে থাকতে পারেনি। দু'দিন আগে চুপি চুপি টেলিফোন করেছিল সুবোধকে। টেলিফোনে ওঁকে পাওয়া গেল না। ফোন ধরেছিল বেয়ারা। সে-ই দিলে খবরটা—সুবোধ নাকি পুরীতে বেড়াতে গেছে।

কথাটা শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। না, ওর কথা আর ভাববে না সে।

কিন্তু মানুষের মন তো একটা যন্ত্র নয়, যে চাবি টিপলেই নির্দিষ্ট আওয়াজটি বেরিয়ে আসবে! বিরক্ত হলেও সুবোধের কথা না ভেবে থাকতে পারে না মানসী। সত্যি কথা বলতে কি, ওর জন্যেই সে আজকাল পড়াশুনায় মন দিতে পারছে না।

বিকেলবেলায় কলেজ থেকে ফিরে ওর জন্যে অপেক্ষা করা একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে যেন।

একলা বসে থেকে থেকে মানসী অধৈর্য হয়ে উঠলো।

বাড়ীতে থাকার মধ্যে আছেন মানসীর জেঠাইমা আর ঠাকুর-চাকর। মা পর্যন্ত বেড়াতে বেরিয়েছেন।

মানসীই বা ঘরে বসে থাকে কেন!

—একটু ঘুরে আসছি।—জেঠাইমাকে বলে মানসী বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে। কোথায় যাবে, ভাবতে ভাবতে এক সময় দেখলো—বড়মামার বাড়ীর দিকেই রওনা হয়েছে সে।

কিছু দূরে এসেই মনটা ঘুরে গেল—কি হবে ওখানে গিয়ে? গেলে মলিদির সঙ্গে তো দেখা হবে না। তিনি তো দিল্লীতে—চাকরির ইন্টারভিয়ু দিতে গেছেন।...হঠাৎ ওঁর আবার চাকরি করার ঝোঁক চাপলো কেন?

মানসী অন্য রাস্তা ধরলো—সুবোধের বাড়ীর। এর মধ্যে ফিরেও তো আসতে পারে সুবোধ। ট্রাম থেকে নেমে দ্রুত পা চালালো সে। আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। দুপুর থেকে আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমা হয়েছে। সেই মেঘই এখন এক তাল পাথুরে কয়লার রূপ নিয়েছে—যে-কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে সুরু করলো হঠাৎ। মানসী আরো জোরে হাঁটতে লাগলো। বৃষ্টি নামার আগেই সুবোধের বাড়ীতে পৌঁছুতে হবে।

পৌঁছে গেল শেষ অবধি। ঝোঁকের মাথায় এসে পড়েছে।

বাড়ীতে ঢুকেই গা-টা কেমন ছমছম করে উঠলো। ভুতুড়ে বাড়ীর মত স্তব্ধ জনহীন মনে হল বাড়ীটাকে। মালিক না থাকে, বাড়ীর চাকর-বাকর তো আছে। তারাই বা সব গেল কোথায়?

এদিক-ওদিক তাকাতে নেপালী চাকরটির দেখা পাওয়া গেল। সামনে এসে সসম্ভ্রমে সেলাম ঠুকলো। একদিন দেখেই মানসীকে চিনে রেখেছে সে।

—বাবুজী কোথায়?—মানসী জিজ্ঞেস করলো।

—উপরে।

যাক বাঁচা গেল। বাড়ীতে ফিরে এসেছে তাহলে। না এলে মানসীর পরিশ্রমই বৃথা যেত। বৃষ্টি মাথায় করে ওকে এখুনি আবার ছুটতে হতো বাড়ীর দিকে। একা একা এই ভুতুড়ে বাড়ীতে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

সিঁড়ি বেয়ে মানসী দোতলায় উঠে এল। বুকটা কেমন দুরদুর করছিল।

আস্তে আস্তে সুবোধের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল সে। ঘরের পাশেই মোজায়েক-করা ঝলমলে চওড়া বারান্দা—টিপয়-ডেকচেয়ারে সাজানো।

বারান্দা থেকেই সূর্যাস্ত দেখা যায়। সূর্য তখন অস্ত গেছে।

ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মামসী—সুবোধের সঙ্গে কে কথা বলছে?

গলাটা চিনতে এক মুহূর্তও দেরি হল না মানসীর। মলিদি! কবে ফিরলেন কলকাতায়?···

বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে পড়লো মানসী। ঘরে ঢুকতে কেমন সঙ্কোচ লাগল যেন। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন মেঘের কালিমার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

সুবোধ কি মলির প্রশ্নেরই উত্তর দিলে?—খোঁজ নিশ্চয়ই পড়েছে।

—হাসতে হাসতে বললে: বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ফসকে না যায়।

—হঠাৎ এমন বিয়ের শখ দেখা দিল কেন ?—মলির গলা।

—রূপ দেখে।

—রূপ, না যৌবন ?

—রূপ-যৌবন দুটোই।

মলি এবার চটে গেল যেন। বললে—বিয়ে করে তোমার মত লোক সুখী হবে মনে করেছ ?···খুশিমত বান্ধবীদের হাত ধরে তখন আর পুরীতে হাওয়া খেতে যাওয়া চলবে না।

সুবোধ হো হো করে হসে উঠলো—তুমি দেখছি অত্যন্ত সেকেলে ভাবে চিন্তা করতে সুরু করেছ—বিয়ে মানে স্লেভারি নয়।···বিয়ের পরও দেখ ঠিক এমনি ভাবেই তোমাকে নিয়ে পুরীতে হাওয়া খেতে চলে যাবো।

—দেখা যাবে।

—ওকি, তোমার গেলাস খালি কেন ?—সুবোধ বলে উঠে।

—আর নয়, এই যথেষ্ট।— মলি উত্তর দেয়।

—সে কি !....তিন-চার পেগে তোমার তো কিছু হয় না !

ওরা কি তাহলে—! মানসী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

দু'জনে হঠাৎ চুপ করে গেল কেন ? আর ঝড়ো হাওয়ায় জানালার পরদাটা তখুনি সরে গেল।···দৃশ্যটা চোখে পড়তেই হৃৎপিণ্ড ধকধক করে উঠলো মানসীর। একি দেখলো সে !···

হাত দুটো যেন বরফ হয়ে গেছে তার। মানসী এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা করলো না—চেয়ার ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নিচে নেমে এল। ভাগ্য ভালো যে চাকর-বাকর-কারো সামনে পড়েনি। একরকম ছুটতে ছুটতেই সে রাস্তায় এসে নামলো।

বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই মানসী ট্রামে এসে উঠলো।

জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। মেঘগুলিও হু হু করে ছুটে চলেছে। কিন্তু ট্রামটা

এত আস্তে চলছে কেন? আরো জোরে স্পীড্ দিতে কি হয়েছিল?

সকালবেলায় ঘুম ভেঙ্গেই মনটা খুশিতে ভরে গেল অনুপের।

আজ আর আপিসে যাবার তাড়া নেই। আপিস করতে একটুও ভাল লাগে না ওর। সেই একঘেয়ে রুটিন ওয়ার্ক।...

আপিসে বেশি দিন কাজ করলে অনুপও হয়তো শেষকালে ফ্রাস্‌ট্রেশনের কবিতা লিখতে সুরু করবে। এত কষ্ট করে সেক্সপীয়র, মিলটন, শেলী, কিট্‌স্ পড়ে শেষে এই পরিণতি।

ভাল লাগে না একেবারেই।

ভাল না লাগলেও সকাল ন'টা বাজতে না বাজতে কোনরকমে দুটি নাকে মুখে দিয়ে সেই তো ছুটতে হয় আপিসে।

সপ্তাহে এই একটি দিনের শুধু বিশ্রাম। এই দিনটির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে অনুপ।

ঘুম থেকে উঠবার তাড়া নেই আজ।...ঘুম ভেঙ্গে গেলেও যতক্ষণ খুশি তুমি বিছানায় গড়াতে পার।

খোলা জানলা দিয়ে আকাশে উধাও হয়েও যেতে পার—যেখানে খুশি। কেউ মানা করবে না।

ইচ্ছে হলেও সাত-সকালে কারো বাড়ীতে গিয়ে তো আর হাজির হওয়া চলে না।

অরবিন্দ কিন্তু তা-ও পারে।

বেলা আটটা বাজতে না বাজতেই এসে উপস্থিত হল। অনাবিল হাসি হেসে বললো—ঘুম থেকে উঠেই চলে এলাম—চায়ের লোভে।

অনুপের মা ঘরে ছিলেন না—পুজোয় বসেছেন। নরহরি চা রেখে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে অরবিন্দ বললে—চা খেয়েই পালাতে হবে।... বিকেল পাঁচটায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিটিং আছে—ভুলে যেওনা কিন্তু।

চায়ের কাপ খালি হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লো সে—ব্যস্ত-

সমস্ত ভাবে। ওর যাবার ভঙ্গিটাই ঐরকম—এখুনি এই মুহূর্তে না গেলে যেন সে ট্রেন ফেল করবে।

বেরুবার মুখে দরজার সামনে মানসীকে দেখে পেছিয়ে এল অরবিন্দ।

মানসী বই ফেরত দিতে এসেছিল অনুপকে। অরবিন্দর কাছ থেকেই অনুপ নিয়ে এসেছিল এই বইখানা। গোর্কির লেখা।

—বাধা যখন পড়লো তখন আর একটু বসে যাও।—অনুপ হেসে বললে অরবিন্দকে।

অরবিন্দ চেয়ারে বসে পড়ল আবার।

টেবিলের উপর বইটা রেখেই মানসী চলে যাচ্ছিল, বইটা হাতে নিয়েই অরবিন্দ বলে উঠলো—কেমন লাগলো বলে গেলেন না?

মানসী ঘুরে দাঁড়ালো। অরবিন্দকে লক্ষ্য করে বললে—অপূর্ব লেখা।

কথাটা শুনে অরবিন্দ দারুণ খুশি। বললে—গোর্কি আমার অতি প্রিয় লেখক—অদ্ভুত রিয়ালিস্‌টিক্ রাইটার!···পড়েন তো আরো বই দিতে পারি।

—আছে?—বই চাইতে মানসী যেন সঙ্কোচ বোধ করে।

—ঠিক আছে, কালই নিয়ে আসবো।—বলেই অনুপের দিকে ফিরে তাকালো অরবিন্দ।—চলি।

মানসী দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো।

অরবিন্দ আর কোন কথা না বলেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মানসী অনুপের খাটের উপর এসে বসলো। কি যেন ভাবতে লাগলো নিজের মনে।

অনুপ খবরের কাগজ পড়ছিল চেয়ারে বসে।

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে মানসী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তোমার বন্ধু কি করেন?

—দেশের কাজ।

—চাকরি করেন না?

—না।

—কেন?

অনুপ ম্লান হাসল—চাকরি করতে গেলে সেরেফ চাকর বনে যেতে হয়—দেশের কাজ করার সময় থাকে না।

উত্তরটা মানসীর পছন্দসই হল না। একটু ভেবে নিয়ে বললে—চাকরি দেশের কাজ নয় বলতে চাও?

—চাইলেই বা শুনছে কে?—অনুপ হেসে ফেললো।

মানসী হাসতে পারলো না। চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে বেরিয়ে গেল আনমনা ভাবে।

মেয়েটা হঠাৎ এমন মনমরা হয়ে পড়লো কেন? বেশভূষারও পরিপাট্য নেই আগের মত। বেলা ন'টার মধ্যেও সে মাথায় একবার চিরুনী বুলিয়া নিতে পারেনি! ওর এই হঠাৎ পরিবর্তনটা এত স্পষ্ট যে নজর এড়াবার উপায় নেই।...ওদের বিয়ে নিয়ে কোন গোলমাল হয়নি তো?

বিশ্রি সেই ঘটনার পর সুবোধের সম্বন্ধে সমস্ত দুর্বলতা কেটে গেছে মানসীর।

দুর্বলতা কেটে গেলেও বিকেলটা বড় শূন্য লাগে যেন। সময় কাটতে চায় না। কলেজ করে এসে রোজ বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে যেতে কি ইচ্ছে করে?...এই সময়টা কেউ বরং বেড়াতে এলে ভালো লাগে। কিন্তু কার-ই বা এত সময় আছে! সর্বক্ষণ মানুষ বই নিয়ে... কাটাতে পারে কি?

শেষ পর্যন্ত সেই বই নিয়েই বসতে হল মানসীকে। সন্ধ্যা উত্তরে গেছে, আলো জ্বালিয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলো সে।

বই খুলতে না খুলতেই পাশের ঘর থেকে ভূপেশ ডাক দিলেন। শোবার ঘরে বসেই বারীনকাকার সঙ্গে গল্প করছিলেন তিনি।

মানসী ঘরে ঢুকতেই চায়ের ফরমাশ করলেন।—দু'কাপ চা। মানসী নিজেই চা নিয়ে এল। নরহরি কাজে আটকা ছিল।

কাপে চা ঢালছিল সে, খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে ভূপেশ হঠাৎ বলে উঠলেন—এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, লোকে কাজ করবে না, অথচ দাবির ফর্দ বাড়িয়েই চলেছে।

মানসী চায়ের কাপ এগিয়ে দিলে।

চায়ে হালকা চুমুক দিয়ে বারীন উত্তর দিলেন—লোকে কাজ করতে চায় না। দোষটা দেশের লোকের, না দেশের নেতাদের?··· দেশবাসীকে তাঁরা কাজে ইন্‌স্‌পায়ার করতে পারছেন না কেন?

—কিন্তু কাজে ফাঁকি দেওয়া—

—ফাঁকি দেবে না!—ভূপেশকে কথা শেষ করতে দিলেন না বারীন: কাজ আর আনন্দ—এ দুয়ের মধ্যে ফারাকটা যখন বেশি বড় হয়ে পড়ে, তখন মানুষকে দিয়ে কাজ করানো শক্ত বইকি!

—আর একটু পরিষ্কার করে বল।—বিচলিত-বিরক্ত হয়ে বললেন ভূপেশ।

—ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার।—জনকতক বড়লোকের সুখের জন্যে মানুষ খাটতে সুখ পায় না।

চায়ে আনমনা ভাবেই চুমুক দিলেন ভূপেশ। নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বারীনের দিকে। তারপর বললেন—কিন্তু কথায় কথায় ধর্মঘট করলে দেশে ইণ্ডাস্‌ট্রি গড়ে উঠবে কি ভাবে?···বিদেশী শিল্পপতিরা তো তাই চায়—ইণ্ডিয়ার মার্কেট তাহলে তাদের আর হাতছাড়া হবে না।

—কথায় কথায় ধর্মঘট করতে হবে কেন?—বারীন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন। গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন। খানিক পরে ভূপেশকে লক্ষ্য করে বললেন—মুশকিল হয়েছে কি জান?···দেশের বেশির ভাগ সম্পদই আজ মুষ্টিমেয় বড়লোকের হাতের মুঠোয়।

বড়লোক! বড়লোকের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্বেষ আজ সঞ্চিত

হয়ে উঠেছে বিষকুম্ভের মতই। মনের মধ্যে আশ্চর্য একটা আবেগ অনুভব করে মানসী। কিছুদিন আগে অরবিন্দর মুখেও সে এই ধরনের কথাবার্তা শুনেছে।

আষাঢ় মাস। বর্ষা স্নুরু হলেও বাতাস ঠাণ্ডা হয়নি।

আষাঢ় মাসেই তো বিয়ের কথা ছিল মানসীর। ললিতা অনেক আগে থেকেই তোড়জোড় স্নুরু করেছিলেন।

মানসীই সব ভেস্তে দিলে।

সোজা ভূপেশের কাছে গিয়ে বললে—আমাকে তাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছ কেন বল তো ?···বিয়ে আমি কিছুতেই করবো না।

কথাটা শুনে ভূপেশ আশ্চর্য হলেন বইকি ! অবাক হয়ে মানসীর মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বললেন—বেশ তো, এখন ইচ্ছে না হয়, পরীক্ষার পরেই না হয়—।

কিন্তু স্নুবোধকে বিয়ে করার ইচ্ছে যে ওর জীবনেও আর হবে না—মানসী তখনই তো বলতে পারতো। বলতে পারতো, অমন লোকের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে মরাও অনেক ভাল।

বলা উচিত ছিল। কিন্তু সব কথা মুখ ফুটে কি বলা যায় ?

যায় না। অনেক কষ্টে কান্না সামলে নিয়ে মানসী শুধু বলেছিল—না, আমি বিয়ে করবো না।

মানসীর চোখে জল দেখেই কি ভূপেশ নরম হয়ে পড়েছিলেন ?—কাঁদছিস কেন ?···তোর ইচ্ছে না হলে কে তোকে বিয়ে দিচ্ছে।···

মানসীর মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তবে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও ভূপেশের কথার উপর কথা বলতে সাহস পান নি।

পরীক্ষার নাম করেই তিনি হয়তো সময় নিয়েছেন স্নুবোধের কাছ থেকে। যা হক, বিয়েটা তো বন্ধ হল। কিন্তু স্নুবোধের আসা-যাওয়া বন্ধ হল কোথায় ? ওকে এড়িয়ে চলা ছাড়া এখন আর গত্যন্তর নেই মানসীর।

বার্ষিক পরীক্ষার পর কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। বিকেল হতে না হতেই মানসী বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে। সুবোধ এসেও ওর দেখা পায় না।···রাগ করেই হয়তো দিনকতক আসা বন্ধ করেছিল!

মায়ের কাছে এজন্যে কম বকুনি শুনতে হয়নি মানসীকে।···কিন্তু সব কথা মাকে সে বলেই বা কি করে?

বিকেলবেলায় বাইরে যাবার জন্যেই তৈরী হয়েছিল মানসী। লেডিস্-ব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে যাবে, ঠিক সেই সময়ে সুবোধ এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে।

বাধ্য হয়েই পেছিয়ে আসতে হল।

সুবোধ সোজা এসে ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওর রুমালের আতরের সেই গন্ধটা ছড়িয়ে পড়লো ঘরময়—কি কটু-ই না লাগলো গন্ধটা!

বিরক্ত-নিরুপায় হয়ে মানসী চেয়ারে বসে পড়লো।

সুবোধও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো দরজা আগলে।

ক্ষুধার্ত চোখে মানসীর সর্বাঙ্গ লেহন করতে করতে বললে—ব্যাপার কি বল তো? তোমাকে আজকাল পাওয়াই যায় না বাড়ীতে এসে!···কালও এসে কতক্ষণ অপেক্ষা করলাম—

—কি প্রয়োজন ছিল অপেক্ষা করার?

সুবোধ যেন চমকে উঠলো।—আই সি—।—ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবলো একটু। তারপর মন্তব্য করলে—নতুন বন্ধুবান্ধব জুটেছে মনে হচ্ছে।

—জুটলেই বা আপনার কি?

সুবোধ হো হো করে হেসে উঠলো—আমার কিছু নয়?—হাত বাড়িয়ে মানসীর হাতটা ধরতে যাবে, মানসী আচমকা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। রাগের ভঙ্গিতে বললে—পথ ছাড়ুন, আমাকে বাইরে যেতে হবে।

সেদিনকার মত পথ ছাড়লেও মানসীর আশা ছাড়লো না সুবোধ।

দু'দিন যেতে না যেতেই আবার এসে হাজির হল।

ঘুম থেকে সবে উঠে বসেছে মানসী। ছুটি থাকলে সে দুপুর-বেলায় কিছুটা সময় ঘুমিয়ে নেয়।

ঘুমের আমেজ তখনও ভাল করে কাটেনি তার। সুবোধকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠলো। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

—মুখ দেখবে না নাকি ?—নির্লজ্জের মত হাসলো সুবোধ। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

খাট থেকে নেমে মানসী দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সুবোধ খপ করে ওর হাতটা ধরে ফেললো—কোথায় যাচ্ছ ?

চেষ্টা করেও মানসী হাতটা ছাড়াতে পারলো না। জোর করেই চুমু খেতে যাচ্ছিল, বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে ছেড়ে দিলে।

ঝড়ের মত সমীর ঘরে ঢুকলো।—আরে, আপনি ?—এমন সময়ে দোতলায় সুবোধকে দেখবে সে ভাবতেই পারেনি।

মুহূর্তের মধ্যে সুবোধ অন্য মানুষ হয়ে গেল। সমীরকে দেখে যেন কত খুশি।—তোমার খবর কি বল ? অজ্ঞাতবাস সুরু করেছ শুনলাম।

সমীর মুচকি হাসে। কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বলে—অনেকদিন সিনেমা দেখিনি, চলুন না একদিন—

—বেশ তো যাওয়া যাবে—বোনকে আগে রাজী করাও।

মানসী অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। বললে—আমার সময় হবে না।

—দেখলে তো ?—সমীরকে সাক্ষী মেনে সুবোধ বললে : বোনটি তোমার একেবারেই বেরসিক।

আলোচনা থেমে গেল আচমকা। মানসীর মা ঘরে এসে ঢুকলেন।

রেকাবিভরা খাবার আর শরবৎ সুবোধের সামনে রেখে হেসে জিজ্ঞেস করলেন—শরীর ভাল তো ?···কেমন যেন শুকনো দেখছি মুখখানা।

কথাগুলো শুনে রাগ ধরে গেল মানসীর মা কি তোয়াজ করতেই না পারেন মানুষকে।

সমীরকে নিয়ে কি যে করবে ভূপেশ! বই নিয়েই বসতে চায় না। অথচ অন্য সব ব্যাপারেই ওস্তাদ, কাজকর্ম, খেলাধূলা—যা বল।

এই তো সেদিন ফুটবল খেলে কত বড় একটা কাপ নিয়ে এল। প্রাইজ দেখে ললিতা তো আহ্লাদে আটখানা।···খেলাধূলা করে করুক, কিন্তু তাই বলে পড়াশুনা ছেড়ে দেবে! গ্রাজুয়েট না হলে লোয়ার ডিভিশন্ ক্লার্কের চাকুরিও জোটে না আজকাল্।

অথচ একটু পড়াশুনা করলেই কিন্তু ও ভালোভাবে পাস করতে পারে। শত হলেও ভূপেশের তো ছেলে, মাথা ওর কোন ছেলের চেয়ে কম নয়। কিন্তু মাথা থাকলেই হয় না, পড়াশুনাও করা চাই। বিকেলবেলায় কলেজ থেকে ফিরে বেরিয়ে যায়, রাত নটার আগে ছেলে বাড়ী ঢোকেন না।

এত রাত অবধি থাকে কোথায়? সন্ধ্যার পর তো আর খেলার মাঠে লাফালাফি করে না কেউ।

ললিতাই ধরে ফেললো ব্যাপারটা। মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সত্যিই শক্ত। ভূপেশের কাছে সে-ই এসে জানালো একদিন—আড্ডার নেশায় পেয়েছে তোমার ছেলেকে—রোজ সন্ধ্যেবেলায় অরুণবাবুদের বাড়ীতে গিয়ে নাকি বসে থাকে।

ভূপেশেরই প্রতিবেশী অরুণবাবু, সমবয়সীও! কিন্তু সমীরের সমবয়সী কে আছে ওদের বাড়ীতে?

ভূপেশ হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা।—অরুণবাবুর ওখানে যাবে কি করতে?

সকালবেলায় বাড়ী বয়ে এসে অরুণবাবুই জানিয়ে গেলেন ব্যাপারটা। উপদেশের ভঙ্গিতে বললেন—বিকেলে ছেলেকে কোন ক্লাবে গিয়ে খেলাধূলা করতে বলবেন, ওতে ওর শরীর, মন ছুটোই সুস্থ থাকে।

কি বলতে চাইছেন ভদ্রলোক? ভূপেশ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল।

গলার স্বর কিছুটা খাদে নামিয়ে অরুণবাবু বললেন—আমার গিন্নী তো নিজের শরীর নিয়েই অস্থির—সব দিকে নজর রাখতে পারেন না—যূথীর সঙ্গে অতটা মেলামেশা—। চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলি বলে অরুণবাবু চুপ করে রইলেন।

ভূপেশ মহা দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। যূথী—যূথিকা? অরুণবাবুর সেই বিধবা ভাগনী। মেয়ে না যেন এক খাপরা আগুন, এমন রূপ ও পেল কোথায়? কিছুদিন আগে বেড়াতে এসেছিল ভূপেশের বাড়ীতে। সমীরই নিয়ে এসেছিল। গায়ে পড়ে মেয়েটা সবার সঙ্গে আলাপ করে।...বয়সেও সে সমীরের চেয়ে অনেক বড়।...

অনেক ভেবেচিন্তে ভূপেশ ললিতার উপর ছেড়ে দিলে ব্যাপারটা —তুমিই ওকে বুঝিয়ে বল—।

বুঝিয়ে বলতেই তো গিয়েছিল ললিতা। কিন্তু ফল হল উল্‌টো।..

মায়ের মুখের উপরই ছেলে বলে বসলো—বিধবা মেয়েকে ভালবাসা নাকি কোন অপরাধই নয়।...

ছেলের কথা শুনে ললিতা একেবারে হা হয়ে গেছে।

মাকে তখন যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে সমীর। বলেছে —বিধবা মেয়েরও তো একটা মন আছে মা, মন থাকলেই তার ভালবাসার অধিকারও রয়েছে।

—কিন্তু ও যে তোর চেয়ে বয়সেও বড়—বিপন্ন হয়ে ললিতা বলেছিল।

সমীর তাতেও দমেনি। বলেছে—বড় তাতে হয়েছে কি? এ-ও তোমাদের একটা অন্ধ সংস্কার।

ললিতা ওর কথার উত্তর দিতে পারেনি।

উত্তর দিতে না পেরেই সে ছুটে এসেছে ভূপেশের কাছে। সন্ধ্যা-

বেলায় সারাদিনের খাটুনির পর ভূপেশ ড্রয়িংরুমে সোফায় লম্বা হয়ে বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করছিল তখন।

ছেলের ব্যবহারে এমন রাগ হতে ললিতাকে আর কখনো দেখেনি ভূপেশ : আর জন্মে ও আমার শত্রু ছিল নিশ্চয়।—আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে ললিতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ললিতা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বারীন উপস্থিত হল।

মুখ দেখেই সে ভূপেশের মেজাজটা আন্দাজ করে নিয়েছিল।

—কি ব্যাপার ? ব্যবসায়ে মার খেয়েছ নাকি ?

—ব্যবসায়ে মার খেলে তবু সামলানো যায়—জীবনে মার খেলে—

কথা শেষ না করেই ভূপেশ থেমে যায়—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বারীন চিন্তিত হয়ে পড়ে। প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে থাকে ভূপেশের দিকে।

ভূপেশ বলে—ছেলে দিয়ে মানুষের কোন সুখ নেই।…তুমিই ভাল আছ।

বারীন তেমনি নির্বাক প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। সিগারেট ধরিয়ে বলে—সমীর কোথায়?…অনেকদিন তাকে দেখি না।

—তাকে এখন দেখবে কি করে ?—ভূপেশ মনের জ্বালায় বলে ফেললো : বিধবা মেয়ের ভালবাসার অধিকার নিয়ে তিনি এখন গবেষণা সুরু করেছেন।

বারীনের গম্ভীর চোখে হঠাৎ একটা কৌতুক খেলে গেল যেন। গাম্ভীর্য যথাসম্ভব বজায় রেখেই ঠাট্টার সুরে বললে—বিধবা কেন, সধবা মেয়েও এখন নতুন করে ভালবাসায় পড়তে পারে—ডিভোর্স আইন তো—

ভূপেশের মুখের দিকে তাকিয়েই আচমকা থেমে গেল সে।

কথাটা শুনে সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল ভূপেশ। ক্ষুব্ধ স্বরে বললে—নিজের ছেলে হলে এই ধরনের রসিকতা করতে পারতে কি?

বারীন সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো যেন!

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ভূপেশের দিকে চেয়ে আপসের সুরে বললে—ব্যাপারটা কি জান?···দিন পালটাচ্ছে, পুরোনো নিয়মে তাই আর ছেলে-মেয়েকে শাসন করা চলে না।

শাসন করা তো চলে না। কিন্তু ছেলে উচ্ছন্নে যাবে, বাপ হয়ে মানুষ সহ্য করে কি ভাবে?

সমীরের ব্যবহারে মনটা এমনিতেই অস্থির হয়ে আছে ললিতার, তার উপর মানসী ওকে আরো পাগল করার যোগাড় করেছে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে লোকে মিথ্যেই সুখের কল্পনা করে। আঁটকুড়ো—বাঁঝা লোকই সংসারে সবচেয়ে সুখী।

বিকেলবেলায় আজকাল বেশির ভাগ দিনই তো মানসী বাড়ীতে থাকে না। বেরিয়ে যায়—হয় বাণী, নয় মীরাদের বাড়ীর নাম করে।

বেড়াতে যাবে যাক্, কিন্তু সুবোধ আসার আগে ফিরে এলেই তো পারে। সুবোধ পর পর ক'দিন এসে ঘুরে গেছে—ওর দেখা পায়নি। বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও যেন বেড়ে গেছে ওর। পড়াশুনা চুলোয় গেছে, রাত-দিন আড্ডা আর আড্ডা। এত আড্ডা দিয়ে বেড়ালে আর অনার্স পেতে হচ্ছে না।

কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ এমন বেয়াড়া হয়েই বা উঠল কেন?···বাপকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করে না!···

শরীর ভাল ছিল না বলেই সেদিন বিকেলে বাড়ী ফিরে দোতলায় শোবার ঘরে এসে শুয়ে ছিল ভূপেশ। ললিতাও বেরুতে পারেনি। শরীর খারাপ বলে উনি ঘরে শুয়ে আছেন, ললিতা বেড়াতে গেলে রক্ষে আছে!

নলিনাক্ষ অবশ্য অনেক করে বলে গেছল যাবার জন্য। এমন কি, গাড়ী পাঠাতেও চেয়েছিল। ওর বড় মেয়ের জন্মদিন। ললিতা যেতে রাজী হয়নি। ওসব অনুষ্ঠানে যেতে আজকাল আর ভালো লাগে না ওর। তার চেয়ে যদি গাড়ী করে কিছুটা সময় গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবার কথা বলতো—

ভূপেশের খাটের পাশেই চেয়ারে চুপচাপ বসেছিল ললিতা।

ঘরের ভেতরটা তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালিয়ে দিলো মানসী।

এমন সময়ে মানসী আজকাল সাধারণতঃ বাড়ীতে থাকে না—কোথাও-না-কোথাও বেড়াতে যায়।

সন্ধ্যেবেলায় মানসীকে বাড়ীতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছল ভূপেশ। —কি সংবাদ? তুমি না বেরিয়ে বাড়ীতে বসে আছ?

মানসী মিষ্টি করে হাসলো একটু। খানিক ইতস্ততঃ করে আসল কথাটা খুলে বললে।...

'রঙমহল'-হলে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে—মানসী তাতে অভিনয় করতে যাবে, ফিরতে রাত হবে। সাজ-পোশাক করার আগেই তাই বাবাকে জানাতে এসেছে কথাটা।

কথাটা শুনেই মেজাজ গরম হয়ে উঠলো ভূপেশের।

বিছানার উপর উঠে বসলো সে।—থিয়েটার করে বেড়ানো ভদ্রঘরের মেয়েদের পক্ষে শোভা পায় না।

বিহ্বল দৃষ্টি মেলে মানসী উত্তর দিলে—কিন্তু ভদ্রঘরের ছেলে-মেয়েই তো ওখানে অভিনয় করছে—আর আমি যে ওদের কথা দিয়েছি—

—কথা দেবার আগে আমাকে জানানো উচিত ছিল।—ধমকের সুরেই বললে ভূপেশ।

সামান্য বিচলিত হলেও মানসী সামলে নিলে সে-ভাবটা। ভূপেশের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে অবিচলিত ভাবে বললে—তুমি কিছু

চিন্তা কোর না, ওরা আমাকে গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দেবে—বাণীদিও সঙ্গে যাচ্ছেন।

ভূপেশ গুম হয়ে বসেছিল। মানসী সেদিকে লক্ষ্যও করলো না। আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।...

কিন্তু এত সাহস মানসী পায় কোত্থেকে?

ঐ ভবঘুরে ছোকরাটা আজকাল বড় বেশি যাতায়াত করতে স্বুরু করেছে। মানসীর হাতে সেদিন ওকে কি একটা বই দিতে দেখলো না? বলি, বইয়ের দরকার হলে লাইব্রেরিই তো আছে, ওর কাছ থেকে নিতে যাস কেন?...

হ্যাঁ, অরবিন্দর পাল্লায় পড়েই মাথাটা বিগড়ে গেছে মানসীর। তা নইলে স্নবোধের সঙ্গেই বা সে অমন ব্যবহার করবে কেন?...

ওর ব্যবহারে দুঃখিত হয়ে স্নবোধ তো সেদিন চা না খেয়েই চলে যাচ্ছিল।...অশান্তির ভয়ে ব্যাপারটা চেপে গেছে ললিতা।

কিন্তু চাপা দিলেই তো আর সবকিছু চাপা পড়ে না।...

আজ বিকেলেই বা মানসী কি কাণ্ডটা-করলো!

চা খেয়েই মীরাদের বাড়ীর নাম করে বেরিয়ে গেল।

মীরাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা থাকলেও ললিতার আজ সেখানে যাবার কোন কথাই ছিল না আগে থেকে। সেকরা হঠাৎ এসে উপস্থিত না হলে সত্যিই যেত না। মীরার মা ললিতার সেকরার কাছে বালা গড়াতে দেবার কথা বলেছিলেন—অন্য সেকরার তুলনায় সে মজুরি কম নেয়। হাতের কাজও তারিফ করার মতন। ঢাকার কারিগর।

সেকরাকে সঙ্গে নিয়েই ললিতা মীরাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছল। ভেবেছিল, মেয়েকে নিয়ে এক সঙ্গেই ফিরে আসবে। কিন্তু কোথায় সে?

মানসীর কথা জিজ্ঞেস করলে ভদ্রমহিলা তো হা হয়ে গেলেন। বিস্মিত দৃষ্টি তুলে বললেন—কই না, মানসী তো আসেনি এখানে।—

একটু চুপ করে থেকে অনুযোগের সুরে বললেন—আমাদের তো সে আজকাল একরকম ভুলেই গেছে।

—ভুলে যাবে কেন?—মেয়ের দোষ ঢাকবার জন্যে ললিতা তখন ব্যস্ত হয়ে পড়লো: পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই আসতে সময় পায় না।

কিন্তু কি সাহস! বাপ-মায়ের কাছে পর্যন্ত মানসী মিথ্যে বলতে সুরু করেছে!

সত্যি কথা বলে যেখানে বেরুনো যাবে না, সেখানে মিথ্যে না বলে উপায়?

দোষ তো মানসীর নয়, মানসীর মা-বাবার। সব ব্যাপারেই তাঁরা নাক গলাতে আসেন। নির্দোষ আমোদ-আহ্লাদ করতে দেখলেও তাঁদের চোখ টাটায়।...

ভদ্রঘরের মেয়েরা নাকি কখনো থিয়েটার করে না।...রঙমহল-হলে রবীন্দ্রনাথের 'রাজারানী' নাটক অভিনয় করবে ওরা। বাণী, অরবিন্দ ওরাই অরগ্যানাইজ করেছিল অনুষ্ঠানটি। বাণীর অনুরোধ এড়াতে না পেরেই মানসী অভিনয় করতে রাজী হয়েছিল, রানীর ভূমিকায়। রাণী হবার মত মেয়ে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

সবাই প্রশংসা করেছে ওর অভিনয়ের। সত্যি কথা বলতে কি, মানসীরও খারাপ লাগেনি ব্যাপারটা। লাগবে কেন?...আর্ট হিসাবে থিয়েটারের তুলনা আছে?

বাবা অবশ্য অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আগে থেকে কেন তাঁর মত নেওয়া হয়নি। বয়স আঠারো বছর পার হয়ে গেছে মানসীর। সব ব্যাপারেই যে মা-বাবার মত নিতে হবে এমনই বা কি কথা আছে?

মত আজও নেয়নি মানসী। মত না নিয়েই মিটিং-এ গেছল সে। মেয়েরা সভা-সমিতিতে যায়—ওঁরা একেবারেই পছন্দ করেন না।

বেলা পাঁচ-টা নাগাদ অরবিন্দ এসে হাজির হয়েছিল। অনুপকে

নিয়ে মিটিং-এ যাবে। কথাটা শুনে মানসীরও ইচ্ছে হল যাবার। বললে—আমিও যাবো।

অনুপ তো প্রথমটা রাজীই হয়নি। বলেছিল—মিটিং-এ গিয়ে তোমার কাজ নেই—কাকা জানতে পারলে—

—জানানোর দরকার কি?—অরবিন্দই উৎসাহিত করলো। বললে—এত ভয় করলে আর রাজনীতি করা চলে না।

মানসীকে লক্ষ্য করে বললে—কি, যাবেন তো চলুন।

যাবার জন্যে মানসী তো পা বাড়িয়েই ছিল।

বাড়ী থেকে অবশ্য একসঙ্গে বেরুল না। কায়দা করে সামান্য আগে-পিছে বেরিয়ে এলো। অরবিন্দর সঙ্গে বেরুতে দেখলেই হয়েছিল।

মানসীর মা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না ওকে।···ওকে লক্ষ্য করেই তো সেদিন বলে উঠেছিলেন—যত সব ছোটলোকের আড্ডা হয়েছে বাড়ীতে।

ছোটলোকের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব, ও-ও ছোটলোক বইকি।···

বিকেলবেলায় মায়ের সঙ্গে সেদিন গাড়ী করে জামা-কাপড় কিনতে বেরিয়েছিল মানসী। নিউমার্কেটের জিনিস ছাড়া মায়ের আজকাল পছন্দই হয় না।

ফেরার মুখে এস্প্লানেডের মোড়ে গাড়ীটাকে রুখতে হয়েছিল কিছুক্ষণ। অফিস-টাইমের ভিড়। গাড়ীর অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিল অরবিন্দ। এক ফেরিওয়ালার কাঁধে হাত রেখে গল্প করছিল মশগুল হয়ে।

বিস্ময়ে মানসীর মায়ের চোখ বড় হয়ে উঠেছিল। অরবিন্দ কিন্তু লক্ষ্যও করলে না ওদের।

আন্তরিকতার হাসি হেসে ফেরিওয়ালার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে গেল—ট্রাম ধরবার জন্যে।

ট্রাম-বাস পিছনে ফেলে মানসীদের গাড়ীটা ছুটে চললো। চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে মা তাকিয়ে ছিলেন রাস্তার দিকে।···

মানসীও কম আশ্চর্য হয়নি ঐ ব্যাপারটায়। পরের দিন অরবিন্দ বেড়াতে এলে সে তাই বলে ফেললো—কাল বিকেলে এস্‌প্লানেডের মোড়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে গল্প হচ্ছিল ?

কথাটা তুলতেই অরবিন্দ একেবারে লাফিয়ে উঠলো—হ্যাঁ, এস্‌প্লানেডের মোড়ে, কালো-বেঁটে মতন লোকটি ?···আমার বিশেষ বন্ধু।

মানসী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল।—আশ্চর্য লাগছে ?—অরবিন্দ ওর চিন্তাটা ধরে ফেললো : আশ্চর্য হবার কিছু নেই—ও আমাকে নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশী ভালবাসে।

মানসী নির্বাক হয়ে অরবিন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

নিজের মনেই অরবিন্দ বলে চললো—আশ্রয় হারিয়ে যখন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি বড়লোক বন্ধুরা কেউ ফিরেও তাকায়নি। ঐ লোকটিই আমাকে ডেকে নিয়ে গেছল নিজের আস্তানায়—বস্তিতে।··· দড়ির খাটিয়াখানা আমাকে ছেড়ে দিয়ে মাটিতে নিজের বিছানা বিছিয়ে নিয়েছিল—একজনের খাবার সেদিন তু'জনে ভাগ করে খেয়েছি।

বিস্ময়ে-শ্রদ্ধায় মানসী অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

প্রদীপ্ত তুটি চোখ মানসীর মুখের উপর রেখে অরবিন্দ বলেছিল—ওর হাত ধরে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য লেগেছে, না ?···হাতে ওদের ময়লা থাকলেও মনে ওদের ময়লা নেই।

কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এসেছিল অরবিন্দর। দরিদ্র মানুষের প্রতি কি দরদ ওর মনে !···

ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে ওরাই আজ সভা ডেকেছিল ময়দানে। অনুপ সঙ্গে যাচ্ছে শুনেই না—

ফিরতে রাত ন'টা বেজে গেল।

বাড়ী ফিরে এলে মা একটা কথাও বললেন না মানসীর সঙ্গে।

রাগ করেছেন নিঃসন্দেহে। রাগ করলে মানসী কি করতে পারে ! এমন কিছু অন্যায় কাজ করেনি সে।···

পড়ার টেবিল ছেড়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল মানসী।

গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। দৃষ্টিটা আকাশে ছড়িয়ে দিলে সে। অরবিন্দর কণ্ঠস্বর তখনও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কানের কাছে। সেই কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে হঠাৎ আওয়াজ উঠল—সমবেত কণ্ঠের।—ত্নুনিয়ার মজুর এক হও, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।—কি জমায়েতটা-ই না হয়েছিল ময়দানে!

মানসীর মিটিং-এ যাবার ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াতে পারে, অনুপ ভাবতেই পারেনি আগে। তাহলে এ হাঙ্গামার মধ্যে যেতে কিছুতেই রাজী হত না সে।

অনুপ তো নিষেধই করেছিল যেতে। মানসী শুনলো না কিছুতেই। বললে—বাড়ীতে না জানালেই হবে।

কিন্তু মানসী জানাতে না চাইলে কি হয়!

খবরটা চাপা থাকেনি—বাতাসের আগে এসে কানে পোঁছে গেছে সবার।

সুবোধবাবুকে বলিহারি। কিন্তু এসব খবর তো ওঁর জানার কথা নয়। সভা-সমিতির ধারপাশ দিয়েও উনি ঘেঁষেন না কোন কালে!··· অথচ—

রাত ন'টায় ওরা যখন বাড়ী ফিরলো তখনও কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গ টের পায়নি।

মানসী সোজা দোতলায় চলে গেছে।

প্রতিদিনের মত খাওয়া-দাওয়া সেরে অনুপও কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসেছে।

আজ সকাল থেকেই মানসীর মুখটা কেমন গম্ভীর হয়েছিল। এরকম গম্ভীর তো সে কতদিনই হয়। অসম্ভব ভাবপ্রবণ মেয়ে।

বিকেলবেলায় সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

মানসী চুল বাঁধতে এসেছিল রমলার কাছে।

খাটের উপর বসে অনুপ খবরের কাগজ দেখছিল—সকালে আপিসের তাড়ায় ভালো করে কাগজ পড়বার সময় পায় না। ওর পাশে বসেই রমলা চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন মানসীর।

—মে আই কাম্ ইন্?—আসতে পারি?—ধোপ-দুরস্ত সাহেব সুবোধ প্রবেশ করলেন। অনুপদের ঘরে এই হয়তো ওর প্রথম পদক্ষেপ।

পোশাক থেকে সুরু করে আচার-ব্যবহার সব কিছুতেই একটা কৃত্রিমতার ছাপ ভদ্রলোকের। এমন কি, হাসিটা পর্যন্ত পোশাকী ব্যাপার। চেহারা নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও তাই ওকে এমন শ্রীহীন মনে হয়।

বসতে বলার আগেই সুবোধ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

মানসীর চুল বাঁধা তখন শেষ হয়েছে। রমলা থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মানসী যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল অনুপের পাশে—উঠবার নামও করলে না।

কথা বললেন আগে সুবোধই।

মানসীর দিকে একটা বাঁকা দৃষ্টি রেখে ঠাট্টার সুরে বললেন—কালকের মিটিং-এ আমাকে কেউ না দেখলেও আমি কিন্তু—

কথা শেষ না করেই টেবিলের উপরকার একটা মাসিক পত্রিকায় হঠাৎ মনোযোগী হয়ে পড়লেন। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে যাবার পর আবার আচমকা বলে উঠলেন—অরবিন্দবাবুর বক্তৃতা পর্যন্ত শুনে এসেছি।

নিছক ভদ্রতার খাতিরেই অনুপ প্রশ্ন করলে—কেমন লাগলো?

জোর করে একটু হেসে সুবোধ বললেন—রাগ করবেন না। আমি স্পষ্ট কথাই বলতে ভালবাসি—অরবিন্দবাবুর বক্তৃতা আমার একেবারেই ভাল লাগেনি।···বক্তৃতা সুরু করার আগে থেকেই যেন

তিনি উত্তেজিত হয়ে ছিলেন—নিউরটিক্ রোগীর মত।—একটু থেমে বললেন—রাজনীতিকদেরই বোধহয় বৈশিষ্ট্য ওটা।

কথাগুলো শুনে রাগ হলেও অনুপ উত্তর দিলে ঠাণ্ডা ভাবেই—আপনি ভুল করছেন সুবোধবাবু। ওটা নিছক উত্তেজনা নয়, আদর্শ-বাদী মনের একটা গভীর আবেগ—ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে এথিক্যাল্ প্যাশন্।

—আই অ্যাম্ সরি—দুঃখিত।···একমত হতে পারছি না।—সুবোধ সেই কৃত্রিম হাসি হাসলেন: একটা বড় নাম দিয়েই কোনো জিনিসকে বড় করা যায় না অনুপবাবু।···আমার কি মনে হয় জানেন? যারা ছেলেবেলা থেকে খেতে পায় না, তারাই সামান্য কারণে অতটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

গুনে গুনে কথাগুলো যেন উচ্চারণ করলেন সুবোধ।

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়'—অরবিন্দ হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকলো।

ঢুকেই কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। এ ঘরে সুবোধকে সে দেখবে, ভাবতেই পারেনি।

ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল অনুপ। তবু মেজাজটা যথাসম্ভব গোপন রেখেই বললে—'সামান্য কারণে' আপনি উত্তেজিত হতে দেখলেন কাকে?···ময়দানে কাল হাজার হাজার লোক কেন এসে জমা হয়েছিল জানেন?

—তা—জানি না?—সুবোধ বিজ্ঞের হাসি হাসলেন: 'ছাঁটাই বন্ধ কর'—বললেই কি বন্ধ করা যায়?···প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতকগুলি লোককে মালিক পুষতে যাবে কেন?···ছাঁটাই নিয়ে উত্তেজিত হবার যুক্তিযুক্ত কোনো কারণই নেই।

অরবিন্দ অনাহুত ভাবেই ওদের তর্কে যোগ দিলে। বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে—ছাঁটাই নিয়ে মানুষ উত্তেজিত হবে না তো কিসে হবে বলুন? আপনার গলার টাই বাঁধা নিয়ে?

সুবোধ এবার চটে গেলেন।

অরবিন্দ সেদিকে খেয়ালও করলে না। কথার ঝোঁকেই বলে চললো—মানুষের দুঃখ-কষ্ট আমরা দূর করতে পারছি না সত্য, কিন্তু তা নিয়ে রসিকতা করা শোভা পায় না—হৃদয়হীনতার-ও একটা সীমা আছে।

সুবোধের মুখ ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। ফর্সা লোকের মুখ লালচে হয়ে উঠলে নাকি তাকে আরো সুন্দর দেখায়, কথাটা একেবারেই মিথ্যে মনে হল অনুপের।

আচমকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুবোধ। অরবিন্দর দিকে একটা বিদ্বেষভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললেন—আপনার কাছে আমি উপদেশ নিতে আসিনি।…ইম্‌পার্টিনেন্স্‌-এরও একটা লিমিট্‌ থাকা উচিত।—রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মানসী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

অরবিন্দকে লক্ষ্য করে অনুপ বললে—ব্যাপারটা ভালো হল না, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই পারতে।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটা অস্ফুট আওয়াজ করে অরবিন্দ উঠে চলে গেল। মানসীর দিকে একবার ফিরেও তাকালো না।

ব্যাপারটা এখানেই মিটলো না।…

অরবিন্দ চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ললিতা ঘরে ঢুকে যা মুখে আসে তাই বলে গেলেন।…অনুপই যেন দায়ী সব কিছুর জন্যে।

মানসীও রেহাই পায়নি গালাগালি থেকে।

উত্তর না দিলেও ভীষণ চটে গেল সে। কাকীমার-ই তো মেয়ে, মেজাজ ওর-ও খুব ঠাণ্ডা নয়।

রাগের ভঙ্গিতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

নিজের মনে গজ গজ করতে করতে ললিতাও চলে গেলেন।

ভাগ্য ভালো, রমলা তখন উপস্থিত ছিলেন না—ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসেছেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে অনুপ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। ঘরে বসে থাকলে মন-মেজাজ ভালো রাখা সত্যিই শক্ত।...মা এখুনি এসে বিমর্ষ মুখ দেখে হয়তো পাঁচটা প্রশ্ন করবেন।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় এখন ?...

সার্টটা গায়ে চড়িয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো অনুপ।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত অরবিন্দর আস্তানায় এসে হাজির হল সে।

রাত ন'টা বেজে গেছে তখন।

—কি ব্যাপার ?

ওকে দেখে অরবিন্দ তো অবাক। অবাক হবারই কথা। ঘণ্টা কয়েক আগেই তো সে ওদের বাড়ী থেকে ঘুরে গেছে।

—মনটা ভালো লাগছিল না।—অরবিন্দর পাশে তক্তপোশের উপর বসে অনুপ বললেঃ ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করে আসি।

—তারপর হোম-ফ্রণ্টের লেটেস্ট্ খবর ?

অনুপ সব কথাই বলে ফেললো একে একে।

ললিতার কথাগুলো শুনে অরবিন্দ কিন্তু এতটুকু বিস্মিত হল না। বরং হেসে বললে—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? চটাই তো স্বাভাবিক ওঁদের পক্ষে।—একটু থেমে বললে—ছু'ছুটো মিলের মালিক সুবোধ চৌধুরী। ওকে হাতছাড়া করা চলে না—দে ক্যানট্ অ্যাফ্ফোর্ড্ টু লুজ্ হিম্।

অনুপের দিকটা একটুও ভেবে দেখলো না অরবিন্দ। মধ্যবিত্তের ক্লাস-বেসিস্ বিশ্লেষণ করতে বসে গেল। কটাক্ষ করে বললে—স্বল্পবিত্তের ধর্মই হল বিত্তবানের সৌধচূড়োর দিকে তাকিয়ে থাকা।

তা থাকুন। কিন্তু অনুপকে দুষছেন কেন সবাই ?

মেয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ললিতা এবার অন্য বছরের তুলনায়

একটু ঘটা করেই জলযোগের আয়োজন করেছেন। চেনা-জানা অনেককেই চা-এ নেমন্তন্ন করা হয়েছে। সুবোধকেও বাদ দেননি।

রমলার ঘরে বসে সেই কথা কাটাকাটির পর সুবোধ আর এবাড়ীমুখো হয়নি।

আশ্চর্য ব্যাপার। নেমন্তন্ন রক্ষা করতে সে-ই সবার আগে এসে হাজির হল—বিকেল হতে না হতেই। সোজা দোতলায় উঠে মানসীর ঘরে ঢুকলো এসে।

হাত-মুখ তখনও ধোওয়া হয়নি মানসীর।

ঘরে ঢুকে মানসীর দিকে এগিয়ে এল সে। খাটের পাশেই চেয়ারে বসে পড়লো।

মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে—লোভীর মত অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছি, তাই না?

মানসী চুপ করে রইলো।

সুবোধ যেন জোর করে হাসলো একটু—আগে না এলে তোমাকে একলা পাওয়া সম্ভব হত কি?

মানসী কোনো উত্তর দিলো না।

সুবোধ তার হাতের প্যাকেট-টা খুলে ফেললো। নেক্‌লেসের বাক্স!

বাক্সটা সযত্নে খুলে মানসীর দিকে এগিয়ে ধরলো সে—দেখ তো পছন্দ হয় কিনা?

জড়োয়ার নেক্‌লেস্! নেক্‌লেস্-টা দেখেই মেজাজ গরম হয়ে উঠলো মানসীর—গয়না দিয়ে মানসীর মন ভুলাতে চায়!···

নেক্‌লেস্ স্পর্শও করলে না সে। গম্ভীর ভাবে বললে—এসবের কি দরকার ছিল?

—কেন, অন্যায় করেছি কিছু?—অভিমানের ভান করলেন সুবোধ।

অসহ্য লাগছিল মানসীর। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠলো।

খাটের উপর নেক্‌লেস্‌টা রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল সুবোধ, মানসী বাধা দিলে—এটা রেখে যাচ্ছেন কেন?—নেক্‌লেসের বাক্সটা সে এগিয়ে দিলে সুবোধের দিকেঃ কোন বান্ধবীকে প্রেজেণ্ট করবেন, খুশি হবে।

সুবোধ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। চোখ দুটো কুঁচকে এল তার। রাগের ভাবে বললে—এর মানে? ··আমাকে তুমি এইভাবে অপমান করতে চাও?

—যা মনে করেন।—নিস্পৃহ ভাবে ছোট্ট জবাব দিলে মানসী।

সুবোধ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো একটু। তারপর মানসীর মুখের উপর একটা ক্ষুব্ধ=শানিত দৃষ্টি রেখে বললে—আর একটু ভেবে দেখলে ভালো করতে।

মানসী অবজ্ঞার হাসি হাসলো—ওর সঙ্গে আর তর্ক করতে প্রবৃত্তি হল না।

নেক্‌লেসের বাক্সটা হাতে তুলে সুবোধ বললে—পরে আপশোস করতে হবে—ইউ শ্যাল হ্যাভ্‌ টু রিপেণ্ট্‌ লেটার অন্‌।—বলেই গটগট করে চলে গেল।

না, চলে যাবার লোক নয় সে। নিচে ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসেছিল। কি নির্লজ্জ! দিব্যি বসে চা খাচ্ছিল। একতলায় গিয়ে ওকে দেখে মানসী তো অবাক!

ব্যাপারটা সুবোধ চেপে গেছে সবার কাছে। না চেপে উপায় কি? অপমানের কথা বলতে গেলে ওর নিজের মুখেই তো চুনকালি পড়তো।

নেক্‌লেস্‌টা সে রেখে গেল মায়ের কাছে।

বিরক্ত হলেও মানসী চুপ করে রইল। একবাড়ী লোকের সামনে এ নিয়ে তো চেঁচামেচি করা চলে না।

আত্মীয়-বন্ধু অনেকেই এসেছিলেন। মীরা-বাণীও এসেছে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।···এল না কেবল অরবিন্দ। আজকাল আর আসে কোথায়! অনুপ ওর বাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছে। কিন্তু

এল না কেন? বিনা নেমন্তন্নে বড়মার ঘরে কতদিনই তো খেতে বসে যায়।...ভুলে গেছে? মিটিং-এ গিয়ে নেমন্তন্নের কথা হয়তো বেমালুম ভুলে গেছে সে। কিছুই আশ্চর্য নয় অরবিন্দর পক্ষে।

কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় ওদের বাড়ীতে এসেও কি কথাটা মনে পড়লো না? এসে অনায়াসেই দুঃখ প্রকাশ করতে পারতো। বলতে পারতো, কাজে আটকে পড়েছিলাম, তাই আসতে পারিনি।

এসব কথার ধার দিয়েও গেল না সে। বারান্দায় সামনা-সামনি পড়ে গিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করলে—খবর ভালো?

উত্তরটা শোনার জন্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করলো না—হন হন করে বড়মার ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

রাগ করে মানসীও গিয়ে কথা বলেনি ওর সঙ্গে। সোজা দোতলায় চলে এসেছে। কি দরকার যেচে কথা বলতে যাবার!

তারপর একটি সপ্তাহ কেটে গেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে অরবিন্দ আর আসেনি মানসীদের বাড়ীতে।

ক'দিন থেকেই বর্ষার সমারোহ জমে উঠেছে। তাপে-পোড়া শহরের বুক ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ঝলসানো গাছপালাগুলো তাজা হয়ে উঠেছে আবার।

নোটিশ না দিয়েই যখন-তখন বৃষ্টি নামছে, আবার রোদ দেখা দিতেও দেরী হয় না—নিরভিমানিনী কিশোরী মেয়ের হাসির মতো।

বিকেলের দিকে এক টুকরো ঝকঝকে রোদ উঠেছে। মানসীর ঘরের জানলা দিয়ে রোদের ফালি মেঝে ছুঁয়েছে এসে।

চারটের আগেই কলেজ থেকে ফিরে এসেছে মানসী। সেই থেকে বাড়ীতেই বসে আছে। বেরুতে ইচ্ছে করলো না কেন যেন।

অনুপ ফিরে এল অফিস থেকে।

মানসীর বাবা তখনও ফিরে আসেন নি। মা বেড়াতে গেছেন।

দোতলায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল মানসী। অরবিন্দ! গেট খুলে সোজা এগিয়ে আসছে দোতলায়। জানালার দিকে একবার

তাকিয়েও দেখলো না। ভালো কথা, ওর বইখানা তো ফেরত দেওয়া হয়নি।

বইখানা ফেরত দেবার জন্যেই না মানসী নিচে নেমে এল! কি দরকার ওর কাছ থেকে বই ধার নিয়ে পড়ার?

বইটা রেখেই চলে আসবে ভেবেছিল, কিন্তু তা হল না।

—বোস।—অনুপ বসতে বলার সঙ্গে সঙ্গে মানসী বসে পড়লো খাটের উপর। তবে গম্ভীর হয়েই ছিল। যেচে কথা বলতে যায়নি অরবিন্দর সঙ্গে।

অরবিন্দই কথা বললে প্রথম—ভীষণ চটে আছেন দেখছি?

উত্তর দিলে অনুপ।—চটবে না কেন বল?—গলায় ঠাট্টার স্বর: তুমিই তো যত অনর্থের মূল—তোমার জন্যেই তো সুবোধবাবু—

অরবিন্দ হো হো করে হেসে উঠলো। আড়=চোখে মানসীর দিকে তাকিয়ে বললে—মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু ঝগড়াঝাঁটি হওয়া ভালো—নিরবচ্ছিন্ন সন্ধি বন্ধুত্বে একঘেয়েমি এনে দেয়।

অনুপ দুষ্টমির হাসি হেসে বললে—দুঃখের বিষয়, আমার ভগ্নীটি ঝগড়াঝাঁটি একেবারেই সহ্য করতে পারে না—একটুতেই বিচলিত হয়ে পড়ে।

—এত অল্পে বিচলিত হলে চলবে কেন?—অরবিন্দ তেমনি হাসির ছলে বলে যায়: ইংরাজদের একটা সদগুণ, তারা কিছুতেই বিচলিত হয় না।…নেপোলিয়নের কাছে একটার পর একটা যুদ্ধে হেরে গিয়েও অবিচলিত ছিল।

অনুপ উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে।

আগের কথার জের টেনে অরবিন্দ বললে—গত যুদ্ধে ডানকার্ক-এ পরাজয়ের পরেও তারা ঘাবড়ায়নি।…লড়াইয়ে অবিচলিত থাকাই জয়ের মূলমন্ত্র।—মানসীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো অরবিন্দ, ঠাট্টার হাসি।

সব কিছু নিয়েই যেন ওদের হাসি-ঠাট্টা।

মানসীও হেসে ফেললো শেষ পর্যন্ত।

ছুটির দিন।

একটু বেলা করেই আজ বিছানা থেকে উঠেছে বাণী। ব্রেক-ফাস্ট সারা হতে না হতেই অনুপ এসে হাজির হল।

ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলে—বিকেলে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখনি তো?

প্রশ্নভরা চোখে বাণী তাকিয়ে ছিল অনুপের দিকে।

অনুপ বললে—শান্তিনগরে যেতে হবে মনে আছে তো?

গ্রামটির প্রতি অনুপের আকর্ষণ যেন দিন দিন বেড়ে উঠছে।··· জায়গাটি সত্যিই সুন্দর। দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠের শ্যামশোভায় চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। বেড়ানোর পক্ষে আইডিয়াল জায়গা। অনুপের সঙ্গে বাণী এর মধ্যে একদিন গিয়ে বেড়িয়ে এসেছে ওখান থেকে।

সেখানে গিয়ে অনুপ মাঠে-ঘাটে বন-বাদাড়ে ঘুরেই তো সময়টা কাটিয়ে দেয়, দিদির কাছে থাকে আর কতক্ষণ?

শান্তিনগরে যাবার উৎসাহ অরবিন্দরও কম নয়। তবে মাঠ-আকাশ দেখার সময় কোথায় তার! ওখানেও সে রাজনীতি সুরু করে দিয়েছে। বাস্তুহারা-পুনর্বাসনের কাজে লেগে গেছে। সর্ব-স্বান্ত ঐ মানুষগুলোর মধ্যে নাকি এক বিরাট বৈপ্লবিক সম্ভাবনা আছে।···

বাণীকে চুপ করে থাকতে দেখে অনুপ যেন চিন্তায় পড়ে গেল। বললে—কি, যাবে না?

—ভাবছি।

—ভাববার কি আছে?···না গেলে অরবিন্দ ভীষণ রাগ করবে।

রাগ করবে নিঃসন্দেহ। আজ বিকেলে শান্তিনগরে বাস্তুহারা-সম্মেলন ডেকেছে ওরা। অরবিন্দ দু'দিন আগেই জানিয়ে গেছে

খবরটা। বিশেষ করে বলে গেছে যাবার জন্যে।...মানসীকে ইচ্ছে করেই হয়তো সে যেতে বলেনি। বললেই কি ভূপেশ কাকা ওকে যেতে দিতেন? কিছুতেই দিতেন না—গোঁড়ামিতে মনুমহারাজকেও হার মানাবেন তিনি।

দুপুরের পর অনুপ আর বাণী এক সঙ্গেই রওনা হল। ট্রেনে নয়, বাসে।

মিটিং আরম্ভ হবার আগেই ওরা পৌঁছে গেল শান্তিনগর কলোনীতে। বেলা পড়ে এলেও গাছের ডালপালায় বিকেলের রোদ ঝিকমিক করছিল।

চাষীদের মোড়ল হারাণ মণ্ডলের বাড়ীর সামনে খোলা জায়গাটায় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সভার একদিকে সস্তা কাঠের ছোট একটা পুরানো টেবিল। টেবিলের আশেপাশে খানকতক চেয়ার।

হারাণ এক রকম জোর করেই ওদের দুজনকে চেয়ারে বসিয়ে দিলে।

কয়েক শ' লোক এর মধ্যেই এসে জড়ো হয়েছে।

দেখতে দেখতে জায়গাটা ভরে গেল।

হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত সভা। শান্তিনগরের পুরানো মুসলমান বাসিন্দা—দাঙ্গার ভয়ে যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল—তাদেরও ডেকে আনা হয়েছে সভায়।

গ্রামের চাষী, কারখানার মানুষ কেউ বাদ যায়নি। শহরতলির শিল্প অঞ্চল থেকেও অনেকে এসেছে শোভাযাত্রা নিয়ে। হাতে তাদের ইউনিয়নের পতাকা—লাল শালুর ফেস্টুন। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় পতাকা ও ফেস্টুনগুলি আগুনের মতই জ্বলজ্বল করছিল।

বক্তৃতা দেবার জন্যে অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালো। সমবেত জনতা অমনি হাততালি দিয়ে উঠলো প্রচণ্ডভাবে! শান্তিনগরে অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে অরবিন্দ।

কথা বলতে বলতে সুর চড়ে গেল তার।...জ্বলন্ত ভাষায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষময় পরিণতির কথা বলে গেল সে। বলে গেল, কায়েমী স্বার্থের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।

বলতে বলতে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অরবিন্দর।

মুহুর্মুহুঃ হাততালি আর শ্লোগানের আওয়াজে বক্তার কণ্ঠ ডুবে যাচ্ছিল থেকে থেকে।

মিটিং ভেঙ্গে গেলেই বাণী চলে আসতে চেয়েছিল, অনর্থক রাত করে লাভ কি!

অনুপই দিলে বাধা। বললে—এখুনি ফিরবে? দিদিদের ওখানে যাবে না?

যেতেই হল। না গেলে সেই তো আবার মুখ কালো করে থাকতো।

গৌরীদেবীর বাড়ীতে গিয়েই যত ফ্যাসাদ বাঁধলো।

—আজ ফেরা চলবে না।—সবাই ধরে বসলো থাকার জন্যে।

বাণীর নিজেরও যে একটু লোভ হয়নি, তা নয়। পূর্ণিমা তিথি। জ্যোৎস্নারাত তো কলকাতায় চোখেই পড়ে না।

এক চিন্তা বাবাকে নিয়ে। তা, তাঁকে তো সে বলেই এসেছে—রাত হলে এখানেই থেকে যাবে আজ। অনুপের দিদির যখন এখানে বাড়ী আছে, থাকার অসুবিধাই বা কি?

অবিনাশবাবুর মেয়েরা তো ওদের দেখে নাচানাচি সুরু করে দিল। শুধু মেয়েরা কেন, ওঁর ভগ্নীটিও।...আশ্চর্য হাস-খুশি স্বভাব ভাগ্য-বিড়ম্বিত ঐ বিধবা মেয়েটির।

বাড়ীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে ওদের নিয়ে মেতে উঠলো। অতটুকু সময়ের মধ্যেই তিন-চার পদ রান্না করে ফেললো।

খাওয়া-দাওয়ার পরেই অরবিন্দ খাটিয়ায় চিত হয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল।

অনুপ প্রতিবাদ করে উঠলো—ওকি, শুয়ে পড়ছো কেন?...বেরুবে না?

—কোথায় ?—ক্লান্ত গলায় অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলে।

—বাইরে।—অনুপ বললে: জ্যোৎস্নারাতে যদি ঘরেই বসে থাকবো তা হলে এখানে থেকে লাভ ?

—চল।—ইচ্ছে না থাকলেও অরবিন্দ উঠে পড়লো।···কয়েকদিন সত্যিই বড় খাটুনি গেছে ওর উপর।

তিন জনে বেড়াতে বেরুল।

বেড়াতে বেরিয়েও অরবিন্দ সেই রাজনীতির কথা তুললো—আজকের জমায়েতটা সত্যিই দেখবার মতন—।

অনুপ সে-কথায় কান দিলে না। জ্যোৎস্না দেখলে সে যেন পাগল হয়ে যায়। গলা ছেড়ে আবৃত্তি সুরু করলো—"শুক্লপক্ষ হতে আনি রজনীগন্ধার বৃন্তখানি—যে পারে সাজাতে অর্ঘ-থালা কৃষ্ণপক্ষরাতে—"

পথ থেকে সোজা মাঠে গিয়ে নামলো সে।

বাণীই ডেকে ফেরালো ওকে। রাত্রে মাঠে নামায় বিপদের আশঙ্কা আছে বইকি। পাড়া-গাঁ, মাঠের খানাখন্দ থেকে এক আধটা সাপ বেরিয়ে পড়া কিছু আশ্চর্য নয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাণী কলকাতায় চলে এল অনুপের সঙ্গে। এসে আপিস করতে হবে তো !

অরবিন্দ রয়ে গেল শান্তিনগরে—পরে আসবে বলে। ঠেকা-ই বা কি ? কলকাতায় এসে ওকে তো বেলা দশটার মধ্যে আপিসে হাজিরা দিতে হবে না !

শ্রাবণ সন্ধ্যা। আকাশ কিন্তু পরিষ্কার, সদ্যোস্নাতা বিধবা বেশ। অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ! তা সত্ত্বেও বারীন বাড়ীতেই বসে আছে। সন্ধ্যার পর নতুন এক পাব্‌লিসার দেখা করতে আসবেন, ইচ্ছে থাকলেও তাই বেরুতে পারে নি। ললিতাদেবীর চায়ের নেমন্তন্নটা পর্যন্ত রাখা গেল না !

বাণী বেড়াতে বেরিয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় একটু বেড়ানো ভালো। বাড়ী ফিরে সেই তো আবার বইয়ের উপর উপুড় হয়ে পড়বে!… বইয়ের মত সঙ্গী নেই মানুষের জীবনে—একলা হতে দেয় না কখনো।

ইজিচেয়ার থেকে উঠে বুক-সেলফ্-এর ধারে এগিয়ে গেল বারীন। আর তখুনি সুলেখা এসে উপস্থিত হল।

ওদের পাড়াতেই এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল, খেয়ালের মাথায় বারীনের আস্তানায় ঢুকে পড়েছে।

চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলে—বাণী নেই নাকি?

মাথা নেড়ে অস্বীকার করলে বারীন। হেসে বললে—একলা যে বড়?

—একলা চলার অভ্যাস থাকা ভাল।—সুলেখাও হেসে উত্তর দিলে।

দোরগোড়ায় পায়ের আওয়াজ পেয়ে দুজনেই সেই দিকে তাকালো।

তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। ব্যাপারটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত।

ললিতা ঘরে ঢুকলো এসে—হাতে একটা টিফিন্ ক্যারিয়ার।

এর আগে ললিতা যেদিনই এসেছে, ভূপেশ সঙ্গে রয়েছে, একলা আসেনি কখনো।

ওরা আসেই বা কবে? কালে-ভদ্রে ছাড়া। বছর খানেক আগে দু'জনে একদিন ওর অসুখ দেখতে এসেছিল।

বলতে গেলে বারীন এক তরফাই ওদের ওখানে যাতায়াত করে। হিসাব কষে দু'পক্ষের যাওয়া-আসার রীতিটাকে বারীন মেনে চলে না কোন ক্ষেত্রে।…এসব রীতিনীতির মূলে রয়েছে বুর্জোয়া সমাজের একটা অস্বাস্থ্যকর কম্‌প্লেক্‌স্।

ঘরে ঢুকে সুলেখাকে দেখে ললিতা অমন অপ্রতিভ হয়ে পড়লো কেন?

বারীন ওদের আলাপ করিয়ে দিলে।

আলাপ করিয়ে দিলেও ললিতা মুখ খুললো না।

বারীনই কথা সুরু করলো।—ওতে কি? টিফিন-কেরিয়ারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—খাবার মনে হচ্ছে!

সলজ্জ মুখে ললিতা উত্তর দিলে—নিজেই তৈরী করেছি। আপনি আসবেন না শুনে ভাবলাম—।

—বেশ তো, নিজের কেরামতিটা এবার দেখিয়ে দিন।—

বারীনের অনুরোধে ললিতাই খাবার ভাগ করতে বসলো।

রামলাল ডিশ, জলের গেলাস এগিয়ে দিলে।

খাবারের বহর কম নয়—কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পানতুয়া, মাংসের চপ আর চিংড়ির কাট্‌লেট্।

সুলেখার দিকে একখানা ডিশ এগিয়ে দিতেই সে স্মিত হেসে বললে—আমি তো হিসাবের বাইরে, ভাগ বসানো ঠিক হবে কি?

বারীনই ওর কথার উত্তর দেয়—এসে যখন পড়েছেন, সুযোগ ছাড়বেন কেন? এসব সুযোগ আমি কখনো মিস্ করি না।

মৃদু হেসে সুলেখা খাবারে হাত দেয়।

খেতে খেতে বারীন ঠাট্টার ছলে বলে—এই একটা দিক ছাড়া স্ত্রী-স্বাধীনতার সব কিছু আমি সমর্থন করি—রান্নার ব্যাপারে সত্যি আপনাদের হাত না পড়লে খিদেই মেটে না।

—কান টানলেই মাথা আসে।—বারীনের দিকে চেয়ে সুলেখা হাসলো একটু: হেঁশেল নিয়ে পড়ে থাকলে আমাদের স্বাধীনতার দৌড়-ও ঐ হেঁশেল পর্যন্ত।

—দোষটা তো আপনাদেরই—তোয়াজ করতে না পারলে আপনাদের যে ভাত তল্ হয় না।—বারীন টিপ্পনী কাটলো।

গম্ভীর হয়ে সুলেখা কি যেন ভাবতে থাকে। ওর স্বভাবটাই ঐরকম, হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে—শ্রাবণের রৌদ্র-মেঘের খেলা যেন।

অন্যমনস্ক ভাবে কাঁচাগোল্লা-টাকে টুকরো করতে করতে বলে—তোয়াজ কি সাধে করে মেয়েরা ?···পুরুষ=প্রধান সমাজে—স্বামী অর্থাৎ মালিকের তোয়াজ না করে উপায় আছে ?

—'স্বামী' কথাটা সত্যিই বড় অসম্মানজনক।—বারীন বলে ঃ আপনাদের আপত্তি করা উচিত।

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটলো সুলেখার। বললে—কিন্তু মেয়েরা অনেকেই এতে সায় দেবে না।···পরাধীনতা যখন আদর্শের রূপ নেয়, তখন তার মোহ কাটিয়ে ওঠা শক্ত বৈ কি !

কথাটা শুনে ভারী ভাল লাগলো বারীনের। উৎসাহের ঝোঁকে বলে উঠলো—মেয়েরা সবাই যদি এমন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারতো !

ললিতা হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠেছিল মনে মনে। এসব আবার কি আলোচনা সুরু করেছে, ভাবটা এই রকম।

খাওয়া হয়ে গেলেই সে বারীনকে লক্ষ্য করে বললে—আমাকে এবার যেতে হবে—আপনার বন্ধুর আসার সময় হয়ে গেছে।

গাড়ী সঙ্গেই ছিল। আর কোনো কথা না বলেই গম্ভীর মুখে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

ওদের দু'জনের কোনো কথায় ললিতা ক্ষুণ্ণ হয় নি তো ?

মাসখানেকের মধ্যে সুলেখার আর খবর পায়নি বারীন। খবর নেওয়ার কথা মনেও হয়নি। ইতিহাসের নতুন বইটা লিখতে সুরু করেই কেমন মশগুল হয়ে পড়েছিল সে।

সুলেখাদের বাড়ীতে যাবার আগে থেকে কোন কল্পনা-ই ছিল না মনে।

ছুটির দিন। দুপুরে বালীগঞ্জে নেমন্তন্ন ছিল শচীনের বাড়ীতে। ওখানে গিয়েই সুলেখার কথা মনে পড়লো। ফেরার পথে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হল।

বেলা তখন চারটা বেজে গেছে।

বাড়ীতে ঢুকে অবাক হয়ে গেল বারীন। মানুষের সাড়া-শব্দ নেই—ছাড়া-বাড়ীর মতই স্তব্ধ।

ঘর-দরজা খোলা ফেলেই বা সবাই গেল কোথায়!

বারীন ভেতরে এগিয়ে গেল। একেবারে সুলেখার শোবার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আসতে পারি?

দরজাটা ভেজানো ছিল। বারীনের গলা শুনেই সুলেখা ভেতর থেকে উত্তর দিলে—আসুন।

ঘরে ঢুকে বারীন আরো অবাক।

চাদর গায়ে চড়িয়ে সুলেখা শুয়ে আছে খাটের উপর। এক রাশ রুক্ষ চুল বালিসের উপর ছড়ানো।

—অসুখ!

—হয়েছিল। এখন ভালো হয়ে গেছে।—দুর্বল হাসি সুলেখার মুখে।···মুখখানা শুকিয়ে শুধু লম্বাটেই হয়নি, ফ্যাকাশেও হয়েছে।

—বসুন।—খাটের পাশেই একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে সুলেখা।

চেয়ারে বসে বারীন জিজ্ঞেস করলে—অসুখটা হল কবে?

—তা প্রায় মাস খানেক হবে—

—খুব বাড়াবাড়িই হয়েছিল মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, ম্যানিন্‌জাইটিস্ রোগটা তো সোজা নয়।—সুলেখা ম্লান হাসলো।

ম্যানিন্‌জাইটিস্ হয়েছিল! অথচ বারীনকে একটা খবর পর্যন্ত দেয়নি। অভিমান চেপে রাখতে পারলো না বারীন। বললে—এতখানি অসুখ করেছে, আমাকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল।

সুলেখা কোন উত্তর দিলো না। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো যেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসলো বিছানার উপর। বালিসটা

লম্বালম্বি খাটের গায়ে রেখে তার উপর মাথাটা হেলিয়ে দিলে। সোজা হয়ে বসে থাকতে এখনও কষ্ট হয় ওর!

বিছানা ছেড়ে যে রোগী উঠতে পারে না, তাকে একলা ফেলে ছুজনেই বেরিয়ে গেছেন! বারীন হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেললো: বাড়িতে কেউ নেই নাকি?

কথাটা শুনে স্থলেখা বললে—এই একটা মাস যা গেছে ওদের উপর দিয়ে। দিন নেই, রাত নেই, ঠায় রোগীর বিছানার পাশে বসে থাকা।…বলে-কয়ে আজ তাই বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

কথা বলার পরিশ্রমেই হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়লো সে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বারীনের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞেস করলে—চা খাবেন?

—খাওয়াবে কে!

—কেন, আমরা খাওয়া-দাওয়ার পাট তুলে দিয়েছি নাকি বাড়ি থেকে?—স্থলেখা ছেলেমানুষের মত হেসে ওঠে।

হাতের কাছেই টেবিলের উপর কলিং বেল্।

বেল্ টিপতেই চোদ্দ-পনর বছরের এক ছোকরা ছুটে এল চোখ রগড়াতে রগড়াতে।

স্থলেখার বাড়ীতে কাজ করে সে।

—এখনও ঘুমুচ্ছিলি?—ছেলেটিকে লক্ষ্য করে স্থলেখা বলে: যা, বাবুর জন্যে এক কাপ চা করে নিয়ে আয়।

ছোকরা ছুটে বেরিয়ে গেল।

চা নিয়ে মিনিট পাঁচেক বাদেই ফিরে এল আবার।

চা রেখেই চলে যাচ্ছিল, স্থলেখা ডেকে ফেরালো তাকে। বললে: ওষুধের শিশিটা এখানে রেখে যা।

টিপয়ের উপর স্থলেখার হাতের কাছে ওষুধ এগিয়ে দিয়ে ছেলেটি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সোজা হয়ে বসে গেলাসে ওষুধ ঢালছিল স্থলেখা। হাতটা

কাঁপছিল দেখেই না বারীন ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিল।—আমি ঢেলে দেব ?

—না, থাক।—সুলেখা আপত্তি করলো। বললে: অন্যের সেবা যতটা না নিয়ে পারা যায়, কি বলেন ?—বলেই হাসলো একটু—অভিমান-মিশ্রিত আশ্চর্য হাসি !

ওষুধ খেয়েই সুলেখা আবার বালিসে হেলান দিলে।

সুদর্শন তখুনি এসে মায়ের ঘরে ঢুকলো হন্ত-দন্ত হয়ে।

ঢুকেই বেরিয়ে গেল। হয়তো বারীনকে দেখেই। পাশের ঘরে গিয়ে রেডিও খুলে বসলো।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বারীন বললে—এবার যেতে হয়।··· সকালবেলায় বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, মেয়েটা হয়তো আবার ভাবতে সুরু করেছে।

—আমার জন্যে কেউ ভাবছে, এভাবনাটাও মিষ্টি।—সুলেখা বললে।

—আমার কিন্তু ভারী তেতো লাগে ঐ চিন্তাটা।—বারীন ঠাট্টার ভাবে উত্তর দিলে: কেউ আমার জন্যে ভাবছে, মনে হলেই একটা দায়িত্ব যেন কাঁধে চেপে বসে।

—এই দায়িত্বটুকু না থাকলে জীবনটা তো মরুভূমি হয়ে উঠতো। —ক্ষীণ হাসি হেসে বললে সুলেখা। খনিক চুপ করে থেকে কতকটা খাপছাড়া ভাবেই আবার বললে: মেয়েরাই বাপ-মাকে বেশি ভাল-বাসে। ছেলেগুলো আজকাল বড় স্বার্থপর হয়ে উঠেছে।

—আজকাল নয়, চিরকালই ওরা স্বার্থপর।

কথাগুলো সুলেখা যেন শুনতেই পেল না। হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে পড়লো কেন ?

কঠিন একটা বর্ম দিয়ে নিজেকে যেন ঢেকে রেখেছে সুলেখা। ওর মনের নাগাল পাওয়া শক্ত !

বারীনের ওখানে ললিতা খাবার নিয়ে গিয়েছিল, তা প্রায় মাস দুয়েক হতে চললো।

বিয়ের বাৎসরিক তিথি উপলক্ষ করেই খাবারগুলি তৈরী করেছিল সে। অন্যবার দোকানের মিষ্টি দিয়েই কাজ সারে। এব্যাপারে উৎসাহ ওর একার। ভূপেশের কাছে এসব অনুষ্ঠানের কোন দামই নেই। বলেঃ বুড়ো বয়সে কে আবার বিয়ের বার্ষিক উৎসব করে?

বয়স হয়েছে বলে মানুষ কোন উৎসব-আনন্দ করবে না?

তবে হ্যাঁ, শাড়ী হোক, গয়না হোক, একটা কিছু প্রেজেণ্টেশন্ ও দেয় ঐ দিনটিতে। নিজের হাতে অবশ্য খুব কমই কিনে আনে। টাকা দিয়ে বলেঃ তোমার পছন্দমত কিছু কিনে নিও।

পছন্দমতই তো ললিতা কিনেছিল শাড়ীখানা। ঢাকাই শাড়ী—সাদা খোল, কমলা রঙের পাড়=বুটি।

শাড়ীখানা পেয়ে মন খুশি হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল, সকালে স্নানের পর শাড়ীটা পরে সে ভূপেশকে—।

কিন্তু সকালে উঠেই তো তিনি বেরুনোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

চা খাওয়া শেষ হতে না হতেই বিরাট গাড়ী করে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাজির হলেন। ভূপেশকে তিনি তাঁর কারখানা দেখাতে নিয়ে যাবেন। ভদ্রলোক আর দিন পেলেন না আসার।

—কারখানা দেখে লাভ!—ললিতা সামান্য আপত্তি জানিয়েছিল।

ভূপেশ আমলই দিলো না! বললে—কারখানা দেখে লাভ নেই? ...তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলেই টাকা আসবে?

টাকা টাকা করে মানুষটা যেন পাগল।

কোন রকমে ব্রেকফাষ্ট শেষ করেই উঠে পড়ল সে। ভদ্রলোকের সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে বসলো। কারখানাটা নাকি কলকাতার বাইরে—সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবে না।

কথাটা শুনেই মন খারাপ হয়ে গেছল ললিতার। কিন্তু মন

খারাপ করে বসে থেকে লাভ? সারা দুপুর সেদিন তাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল সে। খাবার তৈরী করেছে বসে বসে।

চপ্, কাট্‌লেট্ করতে গিয়েই বারীনের কথা মনে পড়েছিল। নোনতা খাবার সে বড় পছন্দ করে।

কারণটা গোপন রেখেই ওকে চা-এ নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছিল ললিতা। ভজুয়ার হাতেই পাঠিয়েছিল চিঠিটা।

কিন্তু বারীন আটকা আছে বলে পাঠালো। কি এমন কাজ যে পাঁচ মিনিটের জন্যেও আসতে পারলেন না!

ঝোঁকের মাথায় টিফিন ক্যারিয়ারে কিছুটা খাবার পুরে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলো ললিতা।···বারীন বাড়ীতে না থাক, বাণী তো আছে। বাণীর কাছে খাবারটা রেখেই চলে আসবে সে।

কিন্তু ওদের বাড়ীতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। সুলেখা দেবীর সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে গল্প করছে বারীন। কোন কাজের তাড়া আছে দেখে তো মনে হল না।···খাবারটা রেখে তখুনি চলে আসতে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু আসতে পারেনি। ভদ্রতা বলে তো একটা জিনিস আছে।···

ভদ্রতাজ্ঞান একেবারেই নেই বারীনের। নিজের হাতে খাবার বয়ে নিয়ে গেল ললিতা, তারপর ওঁর একবার আসা উচিত ছিল না কি? এমনিতে তো দিনের পর দিন এসে বসে থাকেন—বন্ধুর মুখোমুখি হয়ে।

না, ললিতাকে উনি মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না।

—আসতে পারি?

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল ললিতার। নলিনাক্ষ ড্রয়িং-রুমে এসে ঢুকলো।—চল, ঘুরে আসি খানিকটা।

সন্ধ্যা উতরে গেছে, ললিতার খুব যে একটা যাবার ইচ্ছে ছিল তা নয়, তবু রাজী হয়ে গেল। বেচারা এত কষ্ট করে গাড়ী নিয়ে এসেছে, তাছাড়া ললিতাকে নিয়ে কে-ই বা আর বেড়াতে যেতে চায়? সবাই যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

ললিতা চটপট তৈরী হয়ে নিলো। বেড়াতেই যখন যাচ্ছে, গেঁয়ো ভূতের মতন তো আর যেতে পারে না। মুখে হালকা একটু মেক্-আপ। পরনে মাইসোর সিল্ক। দামী শাড়ীগুলো শুধু শুধু বাক্সে পচিয়ে লাভ?

গাড়ীতে উঠতে যাবে, এমন সময়ে বারীন এসে সামনে দাঁড়াল। হা করে খানিক তাকিয়ে থেকে হেসে বললে—মহারাণী চললেন কোথায়?···বিয়ে বাড়ী?

রাগ ধরে গেল ললিতার।—যা মনে করেন।—বলেই গাড়ীতে উঠে বসলো—নলিনাক্ষের পাশের সীটেই। নলিনাক্ষ নিজেই ড্রাইভ্ করে।

আশ্চর্য লোক, ওদের দিকে একবার ফিরেও তাকালো না! সোজা বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে ললিতা যখন বাড়ী ফিরলো ড্রয়িং রুমে বারীন তখনও ঠায় বসে গল্প করছে ভূপেশের সঙ্গে। গল্প মানে তো সেই রাজনীতির কচকচি। কি তর্কই না করতে পারে দু'জনে। বন্ধুত্ব থাকলেও চিন্তাধারায় কোন মিল নেই ওঁদের।

ললিতা সোজা দোতলায় চলে গেল। জামা-কাপড় বদলে খানিক বাদেই আবার নিচে নেমে এল সে। উপরে একা একা বসে থেকে করবেই বা কি?

ড্রয়িং-রুমের বাইরে বারান্দায় এসে বসলো ললিতা—ডেক চেয়ারে। হাতে নিজের গায়ের অসমাপ্ত উলের ব্লাউজ। ঘরের মধ্যে তখনও তর্ক চলেছে দুই বন্ধুতে। তর্ক-ঝগড়া যাই করুক না কেন, বারীন এলে বিষণ্ণ ভাবটা কিন্তু কেটে যায় ভূপেশের।···বিষয়-আশয়ের ভাবনা ভেবে ভেবেই ব্লাডপ্রেসার বাধিয়ে বসেছে। ডাক্তারবাবুর মুখে অসুখের নামটা শোনার পর থেকে হাঁড়ির মত মুখ করে থাকে। বারীন এলে ওঁর মুখে তবু একটু হাসি ফোটে।···বাড়ীর হাওয়াটাই যেন বদলে যায়।

আকাশের দিকে দৃষ্টিটা হঠাৎ মেলে দিলে ললিতা—শরতের নির্মেঘ আকাশ তখন ঝলমল করছে তারার আলোয়। অকারণেই মনটা কেমন খুশি হয়ে উঠলো তার।

পূজার ছুটি শুরু হয়েছে। উৎসবের মহড়া চলছে পাড়ায় পাড়ায়। সর্বজনীন দুর্গোৎসব। পূজার সময় কেউ এই আনন্দ-উৎসব ফেলে কলকাতার বাইরে বেড়াতে যেতে চায় না।

মানসী কিন্তু চায়। নালান্দা দেখার নামে নেচে উঠলো—কাকাবাবুর সঙ্গে নালান্দা দেখতে যাবে। ইতিহাসের রসদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বারীন নালান্দা যাবার উদ্যোগ করেছে, বাণীও যাচ্ছে সঙ্গে। এ সুযোগ মানসী ছাড়তে রাজী নয় কিছুতেই।

কিন্তু ভূপেশ যেতে দিলে তো! ললিতার মুখে প্রস্তাবটা শুনেই বেঁকে বসলো। বললে—ক্ষেপেছ! বড় মেয়েকে কখনো বাপ-মায়ের কাছ-ছাড়া করতে আছে!

ললিতা চুপ করে গেল।

মানসী তবু হাল ছাড়লো না। জিদ ধরে বসলো। যেতে না দিলে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেবে।

ললিতা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল—তোর পড়াশুনার ক্ষতি হবে না?

—কেন, বই তো সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি।

—বই নিয়ে গেলেই কি পড়া হবে সেখানে গিয়ে?

—হয় কিনা দেখে নিও। পরীক্ষা খারাপ করলে তখন ব'লো।

ললিতা নরম হয়ে পড়লো। নরম না হয়ে করেই বা কি! যা একখানি মেজাজ মেয়ের!

শুধু চেহারা নয়, মেজাজটাও মানসী পেয়েছে তার বাপের মত। ওকে চটিয়ে কোন ফল হবে না। ললিতা তাই এখন আপসের পথ বেছে নিয়েছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিয়েতে রাজী করাতে হবে তো।

সুবোধের মত গুণী ছেলে লাখে একটা পাওয়া যায় না। মানসীর ব্যবহারে দুঃখিত হয়েই সে এখন এ বাড়ী আসা বন্ধ করে দিয়েছে। বড়দার ওখানে বেড়াতে গিয়ে সেদিন দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে।

সবার অসাক্ষাতে ললিতা তাকে অনেক করে বুঝিয়েছে। বলেছে —তুমি কিছু মনে কোর না—বাপের আদুরে মেয়ে, তাই বড্ড খামখেয়ালী।···পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বিয়ের দিন-তারিখ স্থির করে ফেলবো—কারুর কথা শুনবো না।

সুবোধ বিনীতভাবেই উত্তর দিয়েছিল—আপনাদের স্নেহ আমি কোন দিনও ভুলতে পারবো না।···

নালান্দায় যাবার জন্যে মানসী বায়না ধরেছে। তা নিয়ে এত ভাববারই বা কি আছে? সাত দিনের তো মামলা। সাত দিনের বেশি বারীন থাকবে না ওখানে।···বাপ-মা সঙ্গে না থাকুক, বারীন তো থাকবে। তাছাড়া, বাণী সঙ্গে যাচ্ছে। ভূপেশের সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

বয়সের ছেলে-মেয়ে। একটু-আধটু স্বাধীনতা না দিলে চলবে কেন?···ললিতাই শেষ পর্যন্ত বলে-কয়ে রাজী করলো ভূপেশকে।

মহা-উৎসাহে মানসী রাজগীর রওনা হয়ে গেল। রাজগীর হয়ে ওরা নালান্দা যাবে।

মেয়েটা চলে যাবার পর বাড়ীটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল যেন— দুপুরবেলায় যেন গিলতে আসে ললিতাকে। একা একা সময় কাটে না।

একা ছাড়া কি! ঠাকুর-চাকর নিয়েই তো এখন ললিতার সংসার। ভূপেশ বাড়ীতে থাকা, না-থাকা সমান। বাড়ীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, শুধু খাওয়া আর ঘুমানোর সময়।···রমলাও নেই—তাঁর মেয়ের ওখানে গেছেন।

গিয়ে ভালোই করেছেন। কলকাতায় ইদানীং স্বাস্থ্যটা টিকছিল না ওঁর। ছেলে তো মায়ের ধারই ধারতো না।···রাতদিন জপের মালা

হাতে নিয়ে বসে থাকতেন রমলা—বসে থেকে থেকেই হাঁটুতে বাত ধরেছে। বয়সও তো কম হয় নি।

এই বয়সে বৌদিকে অন্য কোথাও পাঠাতে ভূপেশের খুব যে ইচ্ছে ছিল, তা নয়। কিন্তু কি করবে সে! মেয়ের কাছে যখন ওঁর যাবার ইচ্ছে হয়েছে, তখন আর বলবার কি আছে!···মেয়ে চলে যাবার পর থেকেই রমলা কেমন গম্ভীর হয়ে থাকতেন। দরকার ছাড়া কারো সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না। সবাই যেন ওঁর কাছে একটা মস্ত বড় অপরাধ করে বসেছে।

অথচ গৌরীর জন্যে ভূপেশ কি না করেছে? এই দুর্দিনের বাজারে ওদের বাড়ীর জন্যে জমির ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়েছে। অনেক ঘোরাঘুরি করে অবিনাশ এখন ওদিকে একটা চাকরিও যোগাড় করে নিয়েছে। কারখানার চাকরি, সামান্য মাইনে। আস্তানাটা ছিল তাই রক্ষে, ঘরভাড়া দিয়ে থাকতে গেলে উপোস করে মরতে হতো।

বেশ তো, জামাইয়ের চাকরি হয়েছে, শাশুড়ীকে নিতে এসেছে, ঘুরে আসুন, কে বাধা দিচ্ছে!

কিন্তু যাবার সময় কি কাণ্ডটাই না করলেন রমলা। কেঁদে চোখমুখ ভাসিয়ে দিলেন। যেতে এতই যদি কষ্ট, তাহলে যাবার দরকার ছিল কি? কে যেন ওঁকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল যাবার জন্যে!

বৌদির চোখে জল দেখে ভূপেশও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহ গলায় বললে—কাঁদছো কেন? জামাই-বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছ—যেদিন খুশি আবার চলে আসবে।

উচ্ছ্বাস দেখে ললিতা অবাক হয়ে গেছে। এমনিতে দিনের পর দিন ভূপেশ কিন্তু বাক্যালাপও করে না বৌদির সঙ্গে।

হাতের চেটোয় চোখের জল মুছতে মুছতে রমলা অবিনাশের সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ীটা ছেড়ে দিলে ভূপেশ বিপন্ন দৃষ্টিতে ললিতার মুখের দিকে

তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—বৌদি কি রাগ করে চলে গেলেন ?···তুমি কিছু বল নি তো ওঁকে ?

কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। আমি বলতে যাবো কেন ? তোমার বাড়ীতে তোমার আত্মীয়স্বজন থাকবে, আমি তাতে বলার কে !···· নিজের বৌদিকে নিজে চেনে না। কান্না দেখে আশ্চর্য হবার কি আছে ? ভূপেশ নিজেই তো গল্প করেছে—দেশে থাকতে ভূপেশের কলকাতায় আসার দিন উনি নাকি সকাল থেকেই কাঁদতে শুরু করতেন। কড়াইয়ে তরকারি চড়িয়ে দিয়েও নাকি চোখের জল ফেলতেন।···

সেকেলে মেয়েদের কাঁদুনে স্বভাব মরলেও যাবে না।

বাণীর চিঠি পেল অনুপ। নালান্দা নয়, রাজগীর থেকে। ওরা রাজগীরে আছে, মানসীর চিঠিতেই জেনেছিল।

বাণী লিখেছে ঃ জায়গাটি দেখতে অপূর্ব। নীল পাহাড়ে-ঘেরা, এক উপত্যকা বিশেষ।

বাড়ীটা আশ্চর্য খোলামেলা। পূবদিকে চওড়া বারান্দা। বারান্দার সামনে অবারিত আকাশ—নীলকান্ত মণির মতই স্বচ্ছ-উজ্জ্বল। ধরণী শস্যশ্যামলা।···নিজের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে বসার অনুকূল পরিবেশ।

জায়গাটি নিঃসন্দেহে তোমার ভাল লাগবে। চাই কি, এখানে এসে দু-চারটে উচু দরের কবিতাও লিখে ফেলতে পার। ছুটি পেলে চলে এসো।···আমাদের ফিরতে আরো দিন পনের দেরি হবে।—বাণী।

শুধু অনুপকে নয়, অরবিন্দকেও যাবার জন্যে চিঠি দিয়েছে বাণী।

অরবিন্দ প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল প্রস্তাবটা।—হ্যাঁ, আর কাজ নেই, রাজগীর যাচ্ছি !

নেমন্তন্ন পেলেও একলা যাবার কথা ভাবতে পারে নি অনুপ। বলেছে—তুমি না গেলে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ওর সঙ্কোচ দেখে অররিন্দ মুচকি হাসলো। ঠাট্টা করে বললে—ভয়টা কিসের শুনি ?···চুরি-ডাকাতি করতে যাচ্ছো না তো ?

অনুপ তবু রাজী হয় নি একলা যেতে। বলেছে—চল না। সাত দিনের তো ব্যাপার—এমন সুযোগ কি সব সময় পাওয়া যায় ?

একটু ভেবে অরবিন্দ বলেছিল—তা ঠিক, স্রেফ্ যাওয়া-আসার খরচটা যোগাড় করতে পারলেই হল।—

যাবার সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছিল অনুপ। আপিসে ছুটির দরখাস্ত দেওয়া, এমন কি, ট্রেনের টিকিট কাটা অবধি হয়ে গেছল।

কিন্তু যাওয়া হল না শেষ পর্যন্ত।···মা সব ভেস্তে দিলেন। কাকার জ্বরের খবর পেয়েই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার জন্যে বৃষ্টি ভিজে ওর ছুটে আসার কি দরকার ছিল ? দোষটা অনুপের জামাইবাবুর—মাকে অসুখের খবর না জানানোই উচিত ছিল। হাঁটু টান করে যে মানুষ হাঁটতে পারেন না, তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির হলেন।

এসেই বিছানা নিলেন। বৃষ্টি ভিজেই বাতের ব্যথাটা অমন বেড়ে গেল।

বাতের ব্যথা বলেই ওঁর অসুখটা নিয়ে কেউ তেমন চিন্তিত হলেন না। কিন্তু মাকে এই অবস্থায় রেখে অনুপ রাজগীর যায় কি করে ? আর যেতে চাইলেই কি ওর মা ছেড়ে দিতেন ?

অরবিন্দ কিন্তু দিব্যি হাসতে হাসতে চলে গেল।

গিয়ে একটা চিঠি দেওয়া উচিত ছিল না কি ?···মায়ের অসুখ সে তো দেখেই গেছে।

নতুন জায়গায় গিয়ে সব ভুলে গেছে।

বাণী ওদের নিয়ে খুব বেড়াচ্ছে নিশ্চয়। বাণীর কথাতেই তো সে শেষ পর্যন্ত কাজকর্ম ফেলে যেতে রাজী হয়েছে। মনে মনে ওকে যথেষ্ট খাতির করে সে। বাণীও কি কম খাতির করে অরবিন্দকে ?

কথা দিয়েই মাত করে দেয় অরবিন্দ।···মেয়েদের দেখলে ওর যত

লড়াই-বীরত্বের গল্প মনে পড়ে যায়। কোথায়, কবে মানুষ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, সেই সব উপাখ্যান শুরু করে দেয়।…বাণী তন্ময় হয়ে ওর কথা শোনে—শুনতে শুনতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পুরুষের বীরত্ব সম্বন্ধে মেয়েদের মনে একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে। বীরত্ব—অ্যাড্‌ভেনচারের কাহিনী শুনে সেক্স্‌পীয়রের ডেস্‌ডিমনা পর্যন্ত কাত হয়ে গেল! বাণীর আর দোষ কি?

রাজগীর শহর। ষ্টেশন ছাড়িয়ে নাক বরাবর কিছুটা হেঁটে গেলেই বাড়ীটির দেখা মিলবে। মনোরম এই বাড়ীখানি এক মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছেন বারীন। শুধু মানসী নয়, বাড়ীটা দেখে সবাই খুশি।

নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা রঙের ঝক্‌ঝকে এই একতলা বাড়ী-খানাকে, শরতের আকাশে রৌদ্রে উজ্জ্বল এক স্তূপ সাদা মেঘ বলেই ভুল হয়।

বাড়ীর সামনেই ল্যান। রংবেরং-এর বিলিতি ফুলের বেড। প্রজাপতি পাখনা মেলে নেচে বেড়ায় ফুলে ফুলে।

বাগানের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে যায় মানসী।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই বারীন নালান্দায় রওনা হয়ে গেছেন—বিকেলের আগে ফিরবেন না।

ওরাও দুজনে এর মধ্যে একদিন গিয়ে বেড়িয়ে এসেছে সেখান থেকে।

ব্রেকফাস্ট করে বাণী বাজার করতে বেরুল থলি নিয়ে। এ সব ব্যাপারে মানসীর উৎসাহ বরাবরই কম। অভ্যাসও নেই। মেয়েরা মাছ-তরকারির দোকানে সওদা করতে যাবে, মানসীর বাবা ভাবতেই পারেন না।

স্নান সেরে মানসী বাইরে বেরিয়ে এল। সকালের রোদে ল্যানে

পায়চারি করতেও ভালো লাগে। গোলাকার বেশ খানিকটা জায়গা ঘিরে মরসুমী ফুলের গাছ। গাছগুলি প্রায় বুক সমান লম্বা। ফুলগুলো এক একখানা প্লাসটিকের রঙিন রেকাবির মতন। কত রকম যে রঙ— লাল, নীল, গোলাপী, হলদে, বেগুনী—। বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে ইচ্ছে করে ফুলগুলোকে।

ল্যানে ঘাসের উপর গা ছড়িয়ে বসে পড়লো মানসী। নিজের মনে গুন গুন করে গান ধরলো—

"শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,

মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো॥"

গল্প করতে করতে দুটি ছেলে-মেয়ে এগিয়ে আসছে—ওদের বাড়ীর দিকেই।

বাণী! বাণীর পাশে?···অরবিন্দ! লাল সুরকির রাস্তাটা পেরিয়ে ওরা একেবারে বাগানের কাছে এসে গেল।

অরবিন্দ এখানে হঠাৎ! ওকে দেখে বুকের স্পন্দন কেন যেন বেড়ে গেল মানসীর।

অরবিন্দ আরো কাছে এগিয়ে এল ওর। মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে—খুব আশ্চর্য লাগছে, না?

বাণীও হাসলো—কেমন মজা করলাম, এই জন্যেই তো আগে থেকে জানাই নি।

অরবিন্দর আসার কথা বাণী তাহলে আগেই জানতো!

—ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল—বাণীকে লক্ষ্য করে অরবিন্দ বললে: তা নইলে কতক্ষণ রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম, কে জানে!

বাড়ীর ভেতরে এসে ঢুকলো সবাই। কিন্তু এসেই বাণী অমন গম্ভীর হয়ে পড়লো কেন?

অরবিন্দর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—অনুপ এল না যে বড়?

—বলছি।—স্মিতমুখে মাথা নেড়ে অরবিন্দ উত্তর দিলে: আগে জিরোতে দাও।—বলেই বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে পড়লো।

অনুপেরও তাহলে আসার কথা ছিল!···মানসী চেয়ারে বসে পড়লো। অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আমাদের বাড়ীর সবাই ভাল আছেন তো?

—হুঁ।—ছোট্ট উত্তর।

বারান্দার এক কোণে স্টোভ জ্বেলে বাণী ততক্ষণে চা তৈরি করতে লেগে গেছে। শোবার ঘরের সামনে এই বারান্দাটি হলঘরের সামিল। শোয়া-বসা দুটো কাজই চলে। আলো-হাওয়া বেশি বলে বারীন কাকা এখানেও একখানি তক্তাপোশ পেতে নিয়েছেন। বাড়ীতে থাকলে দিনের বেলায় তিনি এখানে বসেই পড়াশুনা করেন। বই থেকে মুখ তুললেই নীল পাহাড়ের চূড়ো চোখে পড়ে।

পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ খুশি হয়ে উঠলো—বেশ জায়গাটি তো।

চায়ের কাপ অরবিন্দর হাতে এগিয়ে দিলে বাণী।

চায়ে চুমুক দিয়ে অরবিন্দ বললে—অনুপের আসার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ছুটি মিললো না।—চুপ করে কি যেন ভাবলো একটু। তারপরেই অন্য কথা তুললো। রাজনীতির কথা।···

শান্তিনগরে বাস্তুহারা-আন্দোলন নাকি এখন দানা বেধে উঠেছে—অরবিন্দকে বেশির ভাগ সময় ওখানেই কাটাতে হয় আজকাল।···

কথা বলতে বলতেই হাই তুলছিল অরবিন্দ। খানিকবাদেই তক্তাপোশে গিয়ে চিত হয়ে পড়লো—একটু টান হয়ে নেওয়া যাক।

টান হতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো শেষ পর্যন্ত।

বাণীও কাপড়-জামা নিয়ে স্নান-ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মানসী এখন করে কি! রান্নার ব্যাপারে হাত দিতে যাওয়া ঠিক হবে না, ওকাজে সে কোনদিনই তেমন পটু নয়। রান্না শেখবার সুযোগই বা পেল কবে? উনুনের কাছে গেলেই তো ওর বাবা হৈচৈ বাধিয়ে দিয়েছেন।···

স্নান সেরে বাণী রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। চুলের ডগা দিয়ে জল

ঝরছিল, ভাল করে চুলটা মোছবারও ধৈর্য নেই। অথচ মানসীকে সে কোন কাজে হাত দিতে দেবে না, একাই সব করবে। আসল কথা, ভরসা নেই ওর উপর।

হাতের কাছে কোন কাজ না পেয়ে মানসী বই নিয়ে উঠোনে এসে বসলো—বাড়ীর ভেতর দিকের। শরতের আকাশ তখন আরো নীল, আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল-মুগ্ধ চোখে যেন চেয়ে আছে সবুজ আচলে-ঘেরা পৃথিবীর দিকে।…বাড়ীর সামনে কাঁটা তারের ওপারে খোলা মাঠে সবুজের জোয়ার—ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ।

বই নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করলো মানসী, কিন্তু পড়ায় মন বসলো না কিছুতেই। কোলের উপর বইটা খোলা পড়ে থাকলেও সেদিকে দৃষ্টি ছিল না ওর। বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে যে নিমগাছটা ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারই এক ডালে এসে বসলো সবুজ রঙের একটি পাখি। টিয়ার মত রঙ, কিন্তু গড়ন নয়। বার কয়েক শিস দিয়ে উড়ে গেল হঠাৎ।…মনের মধ্যে গানের সুর ঘনিয়ে এল মানসীর। বই বন্ধ করে নিজের মনে গান গাইছিল সে গুন্ গুন্ করে!

—খেতে হবে না?—বাণীর ডাকে চমক ভাঙ্গলো।

লজ্জিত হয়ে মানসী তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে এল। খাবার টেবিল বাণী এর মধ্যেই সাজিয়ে ফেলেছে।

তিনজনে খেতে বসলো একসঙ্গে। অরবিন্দ খেতে পারে বেশ। খাবার পরিবেশন করছিল বাণী। হাতা করে দ্বিতীয়বার অরবিন্দর প্লেটে মাংস তুলে দিতে গেলে অরবিন্দ স্মিতমুখে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—খাওয়ানোর ব্যাপারে তোমরা সবাই দেখছি একরকম। দিদিমা-ঠাকুরমার যুগের মেয়েরাও যা—

মুচকি হেসে বাণী অমনি টিপ্পনি কাটলো—আর মেয়েদের দিয়ে খাবার তৈরি করানোর ব্যাপারে তোমরা সবাই কিন্তু সমান—টিকিধারী পণ্ডিতদের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই তোমাদের।

—তা যা বলেছ।—অরবিন্দ এক ঝলক হেসে উঠলো। হাসতে

হাসতে বললে—যুগ যুগ ধরে এক্সপ্লয়েট করে আসছি, ওটা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অভ্যাস মাত্রেই একটা ইনারসিয়া আছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় বারীন কাকার সেই তক্তাপোশেই গিয়ে আবার শুয়ে পড়লো অরবিন্দ।

মানসী আর বাণী ঘরে এসে ঢুকলো—খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে বেড়াতে যেতে হবে তো।

বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো বাণী। শুধু বাণী নয়, অরবিন্দও। মানসীর ঘুম এল না কিছুতেই।

দরজাটা সটান খোলা—ঘরে শুয়েও বারান্দার সব কিছু নজরে আসে। বাণীর এটা একটা বাতিক বিশেষ। দরজা-জানলা সে পারত-পক্ষে বন্ধ করবে না। প্রচণ্ড শীতের রাতেও সে নাকি ঘরের সব জানলা খুলে রাখে।

অক্টোবর মাস। রাজগীরে এর মধ্যেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। হাওয়ায় অরবিন্দর চুলগুলো উড়ে কপালের উপর এসে পড়ছে। অরবিন্দ কিন্তু অঘোরে ঘুমচ্ছে, গায়ে কম্বল জড়িয়ে এক ভাবেই ঘুমিয়ে আছে। কেমন অসহায় মনে হয় ওকে। অহঙ্কারের সেই ভাবটা গেল কোথায়?

একটানা চারটে পর্যন্ত ঘুমলো অরবিন্দ। বাণী ডেকে না তুললে আরো কতক্ষণ ঘুমতো কে জানে!

বাণী অনেক আগেই উঠে পড়েছে, উঠে চা-লুচি-হালুয়া তৈরি করে ফেলেছে। এত চটপট ও কি করে যে কাজ করে!

জলযোগের পরেই বেরিয়ে পড়লো ওরা। আকাশে তখনও রুপো রোদ ঝিকমিক করা

জরাসন্ধের 'ওয় ., টাওয়ার' থেকে নেমে ওরা এগিয়ে গেল 'অজাত-শত্রুর গড়ে'র দিকে।

'গড়ের' পাথুরে দেওয়ালের উপর দিয়ে চলতে চলতেই বাণী অরবিন্দর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে, পুরানো কাহিনীর সত্যতা নিয়ে।...

সুদূর দিগন্তে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিয়ে বললে—উপকথা হলেও এসব কাহিনীর মধ্যে বেশ একটা কবিত্ব আছে—মনটাকে যেন কোন এক অজানা পুরানো আমলে টেনে নিয়ে যায়।—

বাণীর মধ্যে যে এত কবিত্ব আছে মানসী আগে টের পায় নি কোনদিন।

অরবিন্দর মনেও সেই ভাবের স্পর্শ লাগলো যেন। ভাবুকের দৃষ্টি মেলে বললে—হ্যাঁ, পুরানো উপকথার মধ্যে কিছুটা কবিত্ব আছে বইকি!···

মানসী নির্বাক হয়েই ওদের কথা শুনছিল।

কালের পাখাতেও আণবিক হাওয়া লেগেছিল কি? সাতটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। হাসি-গল্প, আর পাহাড়ে-জঙ্গলে ছুটোছুটি করে সময়টা যে কোথা দিয়ে চলে গেল, মানসী বুঝতেই পারলো না। দিন, রাত্রি নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে এক অখণ্ড আনন্দময় মুহূর্তের রূপ নিয়েছিল যেন। কিন্তু আনন্দের আয়ু এত স্বল্প কেন?

আর মাত্র একটি দিন। একদিন বাদেই ওরা চলে যাবে এখান থেকে। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে সবাই মিলে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অরবিন্দ একলাই বেরিয়ে গেল। ইচ্ছে করেই ওদের সঙ্গে নিলে না। বললে—আমার একটু কাজ আছে—স্টেশনের ওদিকে।

বেশ তো, যেখানে খুশি যাও না। তোমাকে ছাড়াও ওরা বেড়াতে যেতে পারবে!

গেল বইকি! বাণীকে নিয়ে মানসী বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে।

যাবার আগে শ্রীমতীর আত্মবলিদানের স্মৃতিস্তম্ভটি আর একবার দেখে যাবে সে। দেহে-মনে যেন রোমাঞ্চ জাগে ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে। রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি মনে পড়ে যায়ঃ

"সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে

প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে

স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।”

স্মৃতিস্তম্ভটির সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মানসী। বাণীর কথায় চমক ভাঙলো—বাড়ী যাবে না ?

বাড়ী ফিরেই জিনিসপত্র গুছোতে বসলো বাণী—কাজ ফেলে রাখা ওর স্বভাব নয়। সময়ই বা কোথায় ? কাল সকালের ট্রেনেই রওনা হতে হবে।

বেলা চারটে বাজতে না বাজতেই অরবিন্দকে নিয়ে সে বাজার করতে বেরিয়ে গেল। কালকের খাবারের ব্যবস্থা আজ রাত্রেই ঠিক করে রাখতে হবে। কাকাবাবু তো আগেই বেরিয়ে গেছেন নিজের কাজে। সংসারের সব ভার তিনি মেয়ের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

বাজারে যেতে পছন্দ করে না বলেই হয়ত বাণী ওকে যাবার জন্যে অনুরোধ করলো না। যাবার মুখে শুধু বললে—তুমি ততক্ষণ বাগানে বেড়াও, আমরা চট করে বাজারটা সেরে আসি।

আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে।—মানসী অনায়াসেই বলতে পারতো তখন।

কিন্তু বললে না মুখ ফুটে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারলো না ইচ্ছেটা।

বিকেলের আলোয় ল্যানে চুপচাপ বসে রইল সে। মরসুমী ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে মনটা হু-হু করে উঠলো—কাল বিকেলে ও আর এখানে এসে বসতে পারবে না—অনেক দূরে চলে গেছে এতক্ষণে।...

হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, অরবিন্দকে দেখে নিজের মধ্যে ফিরে এল আবার।

—শেলী-কিটস্‌কেও হার মানালে দেখছি।—

মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ হাসলো একটু।

জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকাতেই বললে—তুমি একলা থাকবে বলে বাণী আমাকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিলে।

হ্যাঁ, মানসীকে এখন 'তুমি' বলেই সম্বোধন করে অরবিন্দ। বাণীকেই যখন করে, ওকেই বা করবে না কেন ?

মানসী চুপ করেই ছিল।

সামনের পাহাড়টা দেখিয়ে অরবিন্দ বললে—চল না, ঐ পাহাড়টায় ঘুরে আসি।—চলুন।—মানসী উঠে দাঁড়াল।

দেখতে কাছে হলে কি হয়, পাহাড়ের তলায় পৌঁছুতে বেশ সময় লাগলো। রোদের রঙ তখন লালচে হয়ে এসেছে।

দুজনে আস্তে আস্তে পাহাড়ে গিয়ে উঠলো।

অরবিন্দ আগে আগে চললো, মানসী পিছনে। পিছনে অবশ্য পড়ে থাকতে দেয় নি ওকে, হাত ধরে উপরে টেনে তুলেছে।

অনেকটা উপরে উঠে এসেছে ওরা।

নির্জন পাহাড়—কাছে-পিঠে লোকজনের চিহ্নও নেই। লতা-গুল্ম আর কয়েকটা ছাড়া-ছাড়া গাছ। জনবিরল সেই পাহাড়ে একটা বড় পাথরের উপর দুজনে বসে পড়লো। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। অস্ত-সূর্যের আলোয় সারা অঞ্চল ঝল্‌মল্‌ করছিল। পাহাড়ের উপর থেকে ওদের বাড়ীটা স্পষ্ট দেখা যায়। বাড়ীর কাছাকাছি সমস্ত পথটাই নজরে আসে। এয়োতির রাঙা সিঁথির মত লাল সুরকির সঙ্কীর্ণ পথরেখা সোজা গিয়ে মিশেছে পিচ-ঢালা বড় রাস্তায়।

সেই পথটা লক্ষ্য করে অরবিন্দ হঠাৎ বলে উঠলো—বাণী আমাদের না দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে।

সর্বক্ষণ বাণী আর বাণী। বাণীর কথা এক মুহূর্তও না ভেবে থাকতে পারে না যেন। রাগ করেই অরবিন্দর কথার কোন উত্তর দিল না মানসী। খানিক পরে আস্তে আস্তে বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, রাগ করবেন না তো ?

—রাগ করার মত হলে নিশ্চয়ই করবো।—অরবিন্দ হাসলো একটু : আচ্ছা, বল।

সামান্য ইতস্ততঃ করে মানসী বলে ফেললো—বাণীদিকে আপনি খুব ভালবাসেন, না ?

ভীষণ একটা মজার কথা যেন বলেছে মানসী, এইরকম ভাব করে অরবিন্দ তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দৃষ্টিটা মানসীর মুখের উপর রেখেই হেসে বললে—কেন, তোমার আপত্তি আছে নাকি ?

—ধ্যেৎ।—মানসী লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে অন্যদিকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল, মনে নেই। অরবিন্দ হঠাৎ ওকে টেনে নিলে নিজের কাছে—

বিহ্বল ভাবটা কেটে যেতেই মানসী মুক্ত করে নিলে নিজেকে। সারা শরীরে তখনও একটা আশ্চর্য শিহরণ খেলে যাচ্ছে তার।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল ত্বজনে। তারপর অপরাধীর মত অনুনয় করলো অরবিন্দ—আমাকে ক্ষমা করো।...

মানসীর মুখে কোন কথা যোগাল না।

অরবিন্দ বললে—আমার সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গেছে মানসী—

মানসী নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। ওর হাঁটুতে মাথা নামিয়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগলো...বুকের ভেতর এত কান্নাও সঞ্চিত হয়ে ছিল !

—কেঁদো না লক্ষ্মীটি—অরবিন্দ জোর করেই ওর মুখটা তুলে ধরলো। মুগ্ধ চোখে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—বাঃ, ভারী স্থন্দর দেখাচ্ছে তো—শিশির-ভেজা পদ্মফুলের মত।

মানসী লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়।

অরবিন্দ বলে—সত্যি এখান থেকে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

চোখের জল তখন শুকিয়ে গেছে মানসীর। অরবিন্দকে একপলক দেখে নিয়ে অভিমানের ভাবে উত্তর দিলে—কলকাতায় গিয়েই তো সব ভুলে যাবেন।

অরবিন্দ মিষ্টি করে হাসলো একটু। বললে—'যাবেন' নয়, 'যাবে'।—একটু থেমে বললে—কিন্তু ভুলতে পারলে তো—

কথা বলতে বলতে ছুজনেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অপরাহ্নের গায়ে কখন সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে, খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল অরবিন্দর প্রথমে। সচকিত হয়ে বলে উঠল—সন্ধ্যা হয়ে এল—চল, এবার ওঠা যাক।

অরবিন্দর হাত ধরে আস্তে আস্তে পাহাড় থেকে নেমে এল মানসী।

ছুজনে পথ চলছিল পাশাপাশি। যেতে যেতে অরবিন্দ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো—একসঙ্গে চলতে পারবে তো?…পাহাড়ের চেয়েও কিন্তু কঠিন আমাদের পথ।

মানসী কোন উত্তর দেয় না—অরবিন্দর হাতটা শুধু চেপে ধরে শক্ত করে।

গভীর রাত্রি।

বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে রাত্রির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল ভূপেশ। মাথার উপর বনবন করে ইলেকট্রিক পাখা ঘুরছে, তবু ঘুম আসে না ভূপেশের চোখে। গরমটা এবার কিছুতেই কমছে না যেন।

না, গরমে নয়, ছুশ্চিন্তাতেই ঘুমোতে পারছে না ভূপেশ।…যা গোঁয়ার ছেলে, শেষ পর্যন্ত ঐ বিধবা মেয়েটার হাত ধরে বাড়িতে এসে না ওঠে।…শাসন করেও কোন ফল হয়নি। মেয়েটাকে নিয়ে নাকি এখনও এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। ছু'দিন আগেও ছুজনকে দক্ষিণেশ্বরে দেখা গেছে। কালীবাড়ী পূজো দিতে গিয়ে ললিতার দিদিই দেখে এসেছেন স্বচক্ষে। খবরটা তিনিই আজ জানিয়ে গেলেন। মেয়েটার চেহারার যা বর্ণনা দিলেন, হুবহু ঐ যূথীর সঙ্গে মিলে যায়।

এই ছেলেকে নিয়েই না ভূপেশ কত আকাশ-কুসুম রচনা করেছিল। না, ভগবান ওর কপালে শান্তি লেখেন নাই।…তা নইলে কি ছুঃখ ছিল ওর? জীবনে মানুষ যা কামনা করে—ঘর-সংসার, বাড়ী-গাড়ী মান-সম্মান—সবই তো পেয়েছিল সে।…

বেড স্থইচ টিপে ললিতা হঠাৎ আলোটা জ্বালিয়ে দিলে।

ঘুম ভেঙে জল খেতে উঠেছিল সে। ভূপেশকে সজাগ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল—ওমা, তুমি এখনও ঘুমোওনি!

ছেলেকে হাতের কাছে না পেয়ে ভূপেশের রাগটা গিয়ে পড়লো ছেলের মায়ের উপর। বললে—ঘুমবার উপায় আছে? যা গুণধর পুত্র তোমার!

আড়মোড়া ভেঙ্গে ললিতা বিরক্তির স্থরে উত্তর দিলে—ত্বপুর-রাতে এসব আবার কি আরম্ভ করলে?

বেড্ স্থইচ টিপে আলোটা আবার নিবিয়ে দিলে। বিছানায় চিৎ হয়ে বললে—এখন ঘুমোতে দাও, সকালে শোনা যাবে।

কিন্তু সকালে অন্য খবর শুনতে হল ললিতাকে।

কথাগুলো সমীর নিজের মুখেই বলেছে তার মাকে। কিন্তু বললো কি করে! লজ্জা বলে কি কোন পদার্থ নেই ওর মধ্যে! হ্যাঁ, ঐ বিধবা মেয়েটাকেই সে বিয়ে করবে! বিয়ে ছাড়া নাকি এখন আর উপায় নেই—মেয়েটার গর্ভে নাকি ওর—

কথাগুলো শুনে ভূপেশের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল।—কোথায়, কোথায় সে হতভাগা—? ভূপেশ ঝড়ের মতো ছেলের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বেলা ন'টা বেজে গেছে, কিন্তু তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি সমীর। খাটের ওপর আধশোয়া অবস্থায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিল, ভূপেশকে ঘরে ঢুকতে দেখেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

—স্কাউণ্ড্রেল!—ভূপেশ দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলে।

আশ্চর্য ব্যাপার, এতটুকু মাথা নীচু করলো না সমীর। সোজা ভূপেশের দিকে তাকিয়ে রইলো—নির্ভীক চোখে।

—কি ভেবেছিস তুই? জুতিয়ে গায়ের চামড়া তুলে দেব।—রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভূপেশ বললে।

অবজ্ঞার হাসি হেসে সমীর উত্তর দিলে—জুতোনোর দিন আর নেই, ভুলে যাচ্ছো কেন? বলতো এখনই চলে যাচ্ছি—

—হ্যাঁ, যা, তাই যা—রাগে-ঘৃণায়-উত্তেজনায় ভূপেশ হাঁফাতে লাগলো: নিজে না গেলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

কথাগুলো বলেই ভূপেশ তার ঘরে চলে এলো। ইজিচেয়ারে বসে হাঁপাচ্ছিল। এমন সময় ললিতা এসে ফুঁপিয়ে উঠলো—ও যে সত্যিই চলে যাচ্ছে।

—যেতে দাও।

কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেল ললিতা।

ভূপেশ তেমনি বসে রইলো। বসে থাকা ছাড়া করার ছিলই বা কি!

সমীর সত্যিই চলে গেল। ঘাড় ধরে যাকে বের করে দিতে চেয়েছিল ভূপেশ, সে আপনা থেকেই চলে গেল। কিন্তু সেই চলে যাওয়ায় কথা ভাবতে গিয়ে মন এমন হু হু করে উঠছে কেন? ইচ্ছে করলেই তো এগিয়ে গিয়ে বাধা দিতে পারতো ওকে। হাত দুটো জাপটে ধরে বলতে পারতো—কোথায় যাচ্ছিস হতভাগা! বাপ-মাকে ফেলে কোথায় যাবি তুই?···যাওয়া চলবে না।

কিন্তু তা তো বলতে পারলো না ভূপেশ। বলা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। অত বড় অপরাধ সে ক্ষমা করে কি ভাবে!

ইজিচেয়ার থেকে উঠে ভূপেশ বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলে। রবিবার, সারাদিন আজ সে চুপচাপ বিছানাতেই পড়ে থাকতে পারবে। বসে থাকতে সত্যি আজ কষ্ট হচ্ছে ভূপেশের—সমীর ওর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে গেছে যেন।

কলিংবেল বেজে গেলেও ভূপেশ নীচে নামলো না—দেখা করতে এসে অনেকেই ফিরে গেলেন। নিজের মনে একটু শুয়ে থাকারও কি উপায় নেই ভূপেশের! ললিতা কাঁদতে কাঁদতে সেই যে বেরিয়ে গেছে আর ঘরে ঢোকে নি। বেলা দশটা নাগাদ বারীন এল—সোজা উপরেই উঠে এল।

ঘরে ঢুকে ভূপেশকে শুয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল—শুয়ে আছ !

—বোস।—ভূপেশ উঠে বসলো।

ভূপেশের মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে বারীন জিজ্ঞেস করলে —তারপর কি খবর বল ?

—খবর ?—ভূপেশ দুঃখের হাসি হাসলো : সমীর বিয়ে করছে—সেই মেয়েটাকেই—।

একটু চুপ করে থেকে বললে—বাপ-মায়ের কথা একবারও চিন্তা করলো না ! কত বড় অকৃতজ্ঞ—

বারীন নির্বাক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো।

বেয়ারা চা রেখে গেল। ভাবতে ভাবতেই চায়ে চুমুক দিলে বারীন। ভূপেশের দিকে একটা অন্যমনস্ক দৃষ্টি ফেলে বললে—কৃতজ্ঞতা জিনিসটা আমাদের বর্তমান আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না।...এ যুগের মানুষ তাই পুরানো আমলের ঐ সব নীতিবোধকে জঞ্জালের মতই ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে।—

ভূপেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বারীনের মুখের দিকে। আশ্চর্য লোক। ব্যক্তিগত সমস্ত অপরাধের জন্যও ও বর্তমান সভ্যতাকে দায়ী করতে চায়।...ব্যক্তিগত কথা ওর কাছে বলতে যাবার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু একজনের কাছে না বলেই বা মানুষ থাকে কি করে ?

দুর্ঘটনাটা ঘটলো বড় আকস্মিক ভাবেই। রাত্রে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ হার্টফেল করলেন অনুপের মা। কেউ বুঝতেই পারলো না !

মায়ের মৃত্যুর পর অনুপ একেবারে ভেঙে পড়েছে। অরবিন্দ কাছে থাকলে হয়তো এতটা ভেঙ্গে পড়তো না। কিন্তু সে তো আজকাল বেশির ভাগ সময় শান্তিনগরেই কাটায়। রাজগীর থেকে ফিরেই শান্তিনগরে চলে গেছে। সেখানেই পড়ে থাকে—বাস্তুহারা-আন্দোলন নিয়ে মেতে আছে।

আঘাতটা কিছুতেই যেন সামলে উঠতে পারছে না অনুপ।... মা-ও ছিলেন মায়ের মত। অমন প্রাণ আজকাল আর চোখে পড়ে না—ফিউডাল যুগের ফাইন্ স্পেসিমেন।

অনুপের মুখের দিকে তাকাতে পারে না বাণী, বড় কষ্ট হয়। বাণীর বকুনি খেয়েই আবার আপিস যেতে সুরু করেছে অনুপ। না গিয়ে উপায়ও ছিল না। মা মারা গেছেন বলে কি কেউ চাকরি ছেড়ে দিতে পারে!

কিন্তু আপিস থেকে ফিরে অনুপ এখনও বালিসে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বাণীকে দেখলে অবশ্য উঠে বসে, কথাবার্তাও বলে। কিন্তু বাণীর পক্ষে রোজ যাওয়া তো সম্ভব হয়ে ওঠে না। তারও তো কাজকর্ম আছে! ললিতা কাকীমা যদি একটু নজর দিতেন ওর দিকে!...তা ওঁকে দোষ দেওয়া চলে না। ছেলে ঐ ভাবে চলে যাবার পর ওঁর মাথার কি ঠিক আছে!

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ওঁদের ওখানে যেয়ে উঠতে পারে নি বাণী। আপিস থেকে ফিরেই তাই রওনা হল।

অনুপের ঘরে ঢুকে সেই একই দৃশ্য দেখলো বাণী—চুপচাপ শুয়ে আছে অনুপ—মুখ কালো করে।

খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে বাণী এক ধমক লাগালো—বিকেল বেলায় শুয়ে আছ?

ধমক খেয়ে উঠে বসলেও চোখ দুটো কেমন ছলছল্ করছিল তার।

—চল বেড়িয়ে আসি।—বাণী প্রস্তাব করলে।

—ইচ্ছে করছে না—।

—বেরুলেই ইচ্ছে করবে।—চেয়ার ছেড়ে বাণী উঠে দাঁড়ালো: চট করে জামা-কাপড় বদলে নাও, আমি কাকীমার সঙ্গে দেখা করে আসছি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাণী ওর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা দোতলায় চলে গেল। ললিতার সঙ্গে দেখা করেই মানসীর ঘরে গিয়ে

ঢুকলো সে। ইচ্ছে ছিল ওকেও সঙ্গে টেনে নেবে। কিন্তু মানসী যেতে রাজী হল না, তার নাকি মাথা ধরেছে। যখন তখন মেয়েরা সত্যি বড় মাথা ধরাতে জানে, কোন কাজে অনিচ্ছা হলেই বলে বসে মাথা ধরেছে—

থাক, ইচ্ছে না হলে যাবার দরকার নেই।

একতলায় নেমে বাণী আবার অনুপের ঘরে এসে ঢুকলো। আশ্চর্য ব্যাপার, সুবোধ বালকের মতই তৈরী হয়ে আছে সে বেড়াতে যাবার জন্য!

দেরি না করেই দু'জনে বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে।

বাসে চেপে এসপ্ল্যানেডে এসে নামলো। গোধূলির আলো মিলিয়ে গেছে তখন। আসন্ন সন্ধ্যা। রাস্তার দুপাশে ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর প্রহরী। কার্জন পার্ক পেরিয়ে লাটসাহেবের প্রাসাদ ডাইনে ফেলে ওরা হাঁটতে লাগলো।

হাঁটতে হাঁটতে এ্যাসেম্‌ব্লির সামনে দিয়ে ইডেন-গার্ডেন-এর দিকে এগিয়ে এলো ওরা। পার্কে ঢুকে নিরালা একটা জায়গা দেখে নিয়ে বসে পড়লো—ঘাসের উপর।

কুয়াসামাখা আকাশে সন্ধ্যাতারা টিমটিম করছে। মলিন আলো —বিধবা মায়ের হাসির মতন।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল অনুপ।—কি ভাবছো?—বাণী জিজ্ঞেস করলে।

বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুপ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে—কি লাভ শুনে?

—লাভ না-ই বা থাকলো।

—তবু শুনবে?—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুপ বললেঃ ভাবছিলাম, একমাস আগে এমন সময়েও মা বেঁচে ছিলেন।

এমন করুণ লাগলো কথাগুলো, বাণীর মত শক্ত মেয়ের চোখেও জল এসে পড়লো।

অনুপ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

বাণী আস্তে ওর হাত ধরলো। বললে—অমন করলে আমার বড় খারাপ লাগে।

বাণীর মুখের উপর দৃষ্টিটা রেখে অনুপ কি যেন ভাবতে থাকে।

বাণীর হাতটা নাড়াচাড়া করতে করতে জিজ্ঞেস করে—আমাকে তুমি ভালবাস, না?

—ভাল না বাসলে কেউ এমনি করে বসে থাকে?—যা মনে এলো তাই বলে ফেললো বাণী।

—তুমি না বললেও আমি জানতাম—খুশির হাসি অনুপের মুখে। মুহূর্তের মধ্যে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল সে। বাড়ী ফেরার পথে বাণীর সঙ্গে রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে চা খেতে পর্যন্ত আপত্তি করলো না।

দেখতে দেখতে দুটি সপ্তাহ কেটে গেল।

বিকেলবেলায় খেয়ালের মাথায় অনুপ আপিস থেকে সোজা চলে এলো বাণীদের বাড়ীতে।

মিনিট কয়েক আগেই বাণী বাড়ী ফিরেছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে অনুপকে দেখে খুশি হলেও বিস্ময়টা ঢেকে রাখতে পারে না সে।

—আরে তুমি! এসো, এসো।

অনুপ যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে একটু। চেয়ারে বসে বলে—আপিস থেকে সোজা চলে এলাম।

—দোষ করনি কিছু। বাণী হেসে উত্তর দেয়। একটু থেমে বলে ঃ একা একা চা খেতে ভালো লাগে না।

বিকেলে বাড়ী ফিরে বেশির দিনই তো বাণী একা একা চা খায়।

য়ুনিভারসিটি থেকে ফিরে বাণীর বাবা কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন।

দুজনে ওরা একসঙ্গে চা-খাবার খেতে বসলো।

পরিবেশন করছিল রামলাল।

আশ্চর্য ব্যাপার, গল্প করতে করতে অনুপ প্রায় খান দশেক লুচি খেয়ে ফেললো। অথচ বিকেলে বাড়ী ফিরে ও নাকি কিছুই খেতে চায় না।

রামলাল আরো লুচি ভেজে আনবে কি-না প্রশ্ন করার আগে ওর খেয়ালই হয়নি। হঠাৎ লজ্জা পেয়ে হেসে ফেললো—অনেক খেয়ে ফেলেছি, না ?

চা রেখে রামলাল রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বাণীর দিকে তাকিয়ে অনুপ বললে—সত্যি, তুমি ছিলে, তাই মায়ের অভাব ভুলে থাকতে পারছি।—মুখে স্নিগ্ধ-করুণ একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠলো অনুপের। খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, তোমার মাকে এখনও মনে পড়ে ?

মাকে তার মনে পড়বে কি করে ? মাকে তো সে জীবনে দেখলোই না !

—তাঁকে তো আমি দেখিনি কখনো।—কথাটা বলতে গিয়ে গলাটা কেমন ভারী হয়ে এসেছিল। সেটা লক্ষ্য করেই হয়তো অনুপ বললে—তাঁর কোন ছবি নেই ?

—কেন, দেখনি ? বাবার ঘরে ঐ যে অয়েল পেন্টিং খানা—

—ও, হ্যাঁ।

—ও ছবিটা ঠিক ওঠেনি, মা নাকি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর ছিলেন।

বাণী দেরাজ খুলে তার পুরানো অ্যাল্‌বাম্ বের করে আনলো। অ্যাল্‌বাম্ খুলে মায়ের একখানি ছবি দেখালো অনুপকে—দেখ তো, আমার মা বলে মনে হয় ?

ছবি থেকে অনুপ চোখ তুলে তাকালো বাণীর দিকে। মিষ্টি হেসে বললে—তুমি আরো সুন্দর।

—সত্যি বলছো ?—বাণী হেসে ফেললো।

অ্যালবামের পাতা উলটে চললো বাণী। কত ছবিই যে

তুলেছিল সে। জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে একটা কোডাক্ ক্যামেরা কিনে ফেলেছিল। ছবি তোলা ওর একটা 'হবি' ছিল একসময়ে। অশোকেরও ছিল এই নেশা।...তার মৃত্যুর পর থেকে বাণী আর ক্যামেরার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।...

কথায় কথায় বাণী এর মধ্যে একদিন অশোকের কথা বলে ফেলেছে অনুপের কাছে। অ্যালবামে ওদের বাড়ীর একখানি গ্রুপ ফটো আছে। ফটোখানি অনুপের সামনে ধরে সে আঙুল দিয়ে অশোককে চিনিয়ে দিলে—এই সেই অশোক—আমার ছেলেবেলার বন্ধু!

অনুপ কোন উত্তর দিলে না। মুখ কালো করে বসে রইলো।

চায়ের পাট তখন শেষ হয়েছে।

বাণী অ্যালবাম দেখছিল নিজের মনে।

অভিমান ভরা গলায় অনুপ হঠাৎ বলে উঠলো—অশোককে তুমি আমার চেয়েও বেশি ভালবাসতে, না?

এই ধরনের প্রশ্নের জন্যে মোটেই তৈরী ছিলো না বাণী।

দীন-দুঃখীর মতো মুখ করে অনুপ তাকিয়ে ছিল ওর দিকে, রাগতে গিয়েও তাই রাগ করতে পারলো না সে। ওর দৈন্য দেখে লজ্জা হল, মায়াও লাগলো খানিকটা। গম্ভীর মুখে বাণী উত্তর দিলে—ছিঃ, মরা লোকের সঙ্গে হিংসে করতে আছে!

অনুপ মাথা হেঁট করে বসে রইলো।

কথাটা বলে ফেলে সে নিজেও হয়তো লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। কান দুটো তা নইলে ওর অমন রাঙা হয়ে উঠবে কেন?

রবিবার। সকালবেলা অনুপ শান্তিনগরে যাচ্ছে শুনে মানসীরও ইচ্ছে হলো যেতে। কলকাতার বাইরে গ্রাম-গাঁয়ে মধ্যে মধ্যে এক-আধ বেলার জন্যে ঘুরে আসতে কার না ইচ্ছে হয়। দাদা চলে যাবার পর বাড়ীতে তো শান্তি নেই।...গৌরীদির সঙ্গেও অনেকদিন দেখা হয়নি, তাদের সঙ্গেও দেখা হবে। তাছাড়া, আর একজনও তো

আছে ওখানে।" কাজের জন্যেই তাঁকে এখন শান্তিনগরে থাকতে হয়।

হ্যাঁ, বাস্তুহারা সমিতির কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে অরবিন্দ। পঞ্চাশ সালের দাঙ্গার পর থেকেই তো আবার পূর্ব বাংলার লোক দলে দলে পশ্চিম বাংলায় ছুটে আসতে সুরু করেছে।...

শান্তিনগরেও পূর্ব বাংলার বহু চাষী পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সংগঠিত করা দরকার। অরবিন্দ ঠিকই বলে—সংগঠনই বঞ্চিত মানুষের সমস্ত শক্তির উৎস। অবিনাশবাবুর বাড়ীতেই সমিতির আপিস। বাইরের ঘরটা নাকি তিনি সমিতির কাজে ছেড়ে দিয়েছেন। সত্যিকারের ভালো মানুষ।

শান্তিনগরে বাস্তুহারা আন্দোলনের টেমপো বেড়ে উঠেছে হঠাৎ। আশপাশের গ্রামগুলিতেও আন্দোলনের সাড়া পড়ে গেছে।

অরবিন্দর তাই এখন সময় নেই ঘন ঘন কলকাতা আসার।

সময় পেলেই অবশ্য চলে আসে। এলে ওদের সঙ্গেও দেখা করে যায়। তবে ওকে ঢুকতে দেখলেই মা যেরকম কটমট করে তাকান। ইচ্ছে হয়, তখুনি ওর হাত ধরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু ইচ্ছে হলেই কি যাওয়া যায়?

অরবিন্দ মত করলে অবশ্য মানসী এই মুহূর্তেই তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে রাজী। মা-বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করেও সে চলে যেতে পারে।

কিন্তু অরবিন্দর যে মত নেই। বলে—ঝোঁকের মাথায় কিছু করতে নেই—সব কাজেরই একটা প্ল্যান থাকা দরকার।...পরীক্ষাটা আগে দাও তো—

ক্ষুণ্ণ হয়ে মানসী বলেছিল—বুঝেছি, আমার কাছ থেকে দূরে থাকতেই তোমার ভাল লাগে।

—খুব বুদ্ধি তো তোমার।—মিষ্টি হেসে অরবিন্দ উত্তর দিয়েছে। আচমকা গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবলো খানিক। তারপর মানসীর

দিকে একটা সস্নেহ দৃষ্টি রেখে বলেছিল—আমার ঐ কুড়েঘরে রাজকন্যাকে আমি রাখবো কোথায় ?…

রাগ তখনি জল হয়ে গেছল মানসীর। সত্যিই তো, যে লোক দেশের কাজ করে—সংসারের সব দায়িত্ব সে নেয় কি ভাবে !

দায়িত্ব নিতে হবে মানসীকে। চাকরি করে নিজেদের খরচ চালাতে হবে। মানসী তাতে খুশি মনেই রাজী আছে। পরিশ্রম হলেও তাতে সম্মান আছে। মেয়েদের সমস্ত অসম্মানের মূলেই তো অর্থনৈতিক পরাধীনতা। ঘরকন্নার কাজে উদয়-অস্ত গাধার খাটুনি খেটেও তারা সমাজে সম্মান পায় না।

অরবিন্দর উপদেশ মতই মানসী মন দিয়ে পড়াশুনা সুরু করেছে। অনার্স নিয়ে পাস করতে হবে।

কিন্তু অরবিন্দকে একদিন না দেখলেই যে মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। ঘুরে ফিরে কেবল ওর কথাই মনে পড়ে।

দু'দিন আগেই তো সে দেখা করে গেছে মানসীর সঙ্গে। তবু অনুপ যাচ্ছে শুনেই যেতে ইচ্ছে হল। আর বাধাও দিলে না কেউ। নিজের দিদির বাড়ি বেড়াতে যাবে, এতে বাধা দেবার আছেই বা কি !

অবিনাশ বাবুর বাড়ী পৌঁছুতে বেলা এগারটা বেজে গেল। গিয়ে শুনলো, অরবিন্দ অনেক আগেই নাকি বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে। দুপুরে ফিরবে কিনা ঠিক নেই। পাশের গ্রামে ওদের মিটিং আছে আজ।

মনটা খারাপ হয়ে গেল মানসীর। এত কষ্ট করে যার জন্যে ছুটে আসা, তার সঙ্গে দেখা না করেই—।

অনুপ ওর মুখ দেখেই যেন বুঝে নিলে ভাবটা। বললে—না, এসেছি যখন, অরবিন্দর সঙ্গে দেখা না করে ফিরছি না।

শুয়ে, বসে, গল্প করেও দিনটা যেন কাটতে চায় না মানসীর।

সন্ধ্যে হয়ে গেল ; তবু অরবিন্দ বাড়ী ফিরলো না। আজ ওখানেই থেকে যাবে নাকি—যে গ্রামে মিটিং করতে গেছে ?

অরবিন্দর ঘরে বসেই সবাই গল্প করছিল। হ্যারিকেনের টিমটিমে

আলো জ্বলছে। ঝড়ো হাওয়ায় আলোর শিখা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

ঝড়ো হাওয়ার মতই হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকলো অরবিন্দ। ঢুকে বিস্ময়ে অবাক!

বিস্ময় মানসীকে দেখেই। সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ঢুকে মানসীকে ওর ঐ পায়াভাঙ্গা চৌকিটায় বসে থাকতে দেখবে, সে ভাবতেই পারেনি।

বসে ছিল তো ওর জন্যই। না হলে অনেক আগেই চলে যেত।

অরবিন্দকে দেখে সবাই সরে পড়ল, এক অনুপ ছাড়া।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে অনুপকে লক্ষ্য করে অরবিন্দ বললে—কি ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ?

—কি আর করা যায়।—অনুপ হেসে উত্তর দিলে: না এলে তো তোমার দেখা মিলবে না। একটু থেমে বললে—আর দেরী করলে আমাদের সঙ্গে দেখা হত না।…ট্রেনের সময় হয়ে এল প্রায়।

রমা চা রেখে গেল।

চা খাওয়া শেষ হলেই অনুপ উঠে পড়ল। মানসীর মুখের দিকে একটা কৌতুকভরা দৃষ্টি ফেলে বললে—কি, বাড়ী যাবে না?

যাবে না তো করবে কি? গৌরীদির কাছে বিদায় নিয়ে ওরা রাস্তায় এসে নামলো। ওদের সঙ্গে অরবিন্দও এল স্টেশন অবধি। গাড়ীটা ছেড়ে দিলেও প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে রইল সে—বড় ক্লান্ত-বিষণ্ণ লাগছিল ওকে।

অনুপের আপিস ছুটি থাকলেও বাণীর আপিস ছুটি ছিল না। তা সত্ত্বেও সকালবেলায় অনুপ এসে বায়না ধরলো: চল, দিদির ওখান থেকে বেড়িয়ে আসি।

—আপিস যেতে হবে না আমাকে?

—একদিন না-ই বা গেলে?

বাণী দোটানায় পড়ে যায়। কি যে হয়েছে তার! ওর মা মারা

যাবার পর থেকে, একটা কথাও ঠেলতে পারে না। ওর আবদার রাখতে গিয়ে বাণী কখনও কখনও যে বিরক্ত হয় না, তা নয়। তবু ওকে দুঃখ দিতে কষ্ট হয়।

বাণী তাই সোজা অস্বীকার করতে পারলো না। একটু ভেবে নিয়ে বললে—আপিসের পরেই না হয় যাওয়া যাবে।—শনিবারের আপিস, কামাই করলে শুধু শুধু দুটো দিনের ক্যাজুয়াল্ লিভ্ কাটা যাবে।

অনুপ তাতেই খুশি।

আপিস থেকে ফিরেই সে রওনা হল অনুপের সঙ্গে। যাবার আগে বাবাকে বলে গেল—শান্তিনগরে বেড়াতে যাচ্ছি, ফিরতে রাত হতে পারে।

হলও তাই।···

ট্রেন থেকে ব্যারাকপুর স্টেশনে এসে যখন ওরা নামলো, সূর্য তখন অস্ত যায়-যায়। ইচ্ছে করলে একটা রিক্সা নিয়ে ওরা দশ মিনিটের মধ্যেই অবিনাশবাবুর আস্তানায় পৌঁছে যেতে পারতো।

কিন্তু তা করলো না। করতে দিলে না অনুপ।···স্টেশনের বাইরে এসেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—কি গ্রাণ্ড্ রঙ হয়েছে, দেখেছ?···হেঁটেই যাওয়া যাক, কেমন?

—চল।

দু'জনে হাঁটতে আরম্ভ করলো। সূর্য তখন ডুবে গেছে। মাঠের ওপারে দিগন্তে সবুজ বনরেখা নীলাভ হয়ে এসেছে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। আকাশে মেঘ জমতে দেখেও ওরা কিন্তু বৃষ্টির আশঙ্কা করেনি। গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছিল, আচমকা বৃষ্টি নামলো। বেশ জোরেই।

কাছে-পিঠে কোথাও যান-বাহন পাবার সম্ভাবনা নেই। স্টেশন থেকে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে ওরা।

পথের পাশে একখানি খড়ো ঘরের দিকে তাকিয়ে বাণী ঢুকবে কিনা

ভাবছে, এমন সময়ে ঘরের দাওয়া থেকে একজন আধা বয়সী জোয়ান লোক চেঁচিয়ে উঠলো ওদের লক্ষ্য করে—চলে আস্থন বাবু।

না বললেও যেত।...বাণীর ভয় অনুপকে নিয়েই। যা ডেলিকেট্ হেল্‌থ্, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই হয়তো আবার জ্বরে পড়বে।...এক রকম ছুটে গিয়েই ওরা দাওয়ায় উঠলো।

চাষী পরিবার। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে জোয়ান মানুষটি হুঁকো টানছিল। পরনের ধুতি হাঁটুর নীচে নামেনি, গায়ে আধময়লা ফতুয়া। ওরা সামনে যেতেই হুঁকোটা নামিয়ে রাখলো। হাত জোড় করে বললে—গরীবের আস্তানা বাবু—

গরীবের আস্তানা হলেও বেশ ছিমছাম ব্যবস্থা। লোকটি ওদের ঘরের ভেতর নিয়ে গেল—দাওয়ায় বৃষ্টির ছাট আসছিল।

ঘরে আসবাবের মধ্যে একখানি চৌকি, সস্তা কাঠের একটা ছোট টেবিল আর তু'খানি চেয়ার। বাঁশের বেড়ায় একটা র‍্যাকেট ঝুলছে—জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখা হয়েছে। নিপুণ হাতের স্পর্শ আছে ঘরখানিতে।

চেয়ার এগিয়ে দিয়ে লোকটি চৌকির উপর গিয়ে বসলো। বসেই কথা সুরু করলে। চাষ-আবাদের কথা। একাই বলে যেতে লাগলো। এসব কথায় অনুপের কোন উৎসাহই নেই।

বৃষ্টিটা ধরে এলে পাশের আর একখানি ঘর থেকে গৃহিণী বেরিয়ে এলেন—বাটিতে মুড়ি আর নারকেলের নাড়ু নিয়ে। বাড়ীতে অতিথি এসেছে, বৃষ্টির মধ্যেও কিভাবে যেন টের পেয়ে গেছেন তিনি।

যৌবন পেরিয়ে গেলেও গৃহিণীর লজ্জা যায়নি। অনুপকে দেখে ঘোমটা টানলেন কপাল অবধি।

মুড়ির বাটি টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে তিনি বাণীকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হল।

মুড়ি নারকেলের নাড়ু খাইয়েই গৃহিণী রেহাই দিলেন না বাণীকে। বসে বসে ওকে তাঁর ঘর-সংসারের গল্প শুনতে হল।...

মহিলার কথা শুনে বাণী অবাক। আটটি ছেলে-মেয়ে ওঁর!

দুঃখ, মেয়েরাই বড়।…বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু স্বামীর ঘর করে না। জামাই নাকি ওঁর মেয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে।…অতি আপনজনের কাছে মানুষ যেমন বলে থাকে, বাণীর কাছেও তিনি তেমনি মন খুলে নিজের সংসারের কথা বলে গেলেন।

গ্রাম্য সরলতার সঙ্গে গ্রাম্য ঔৎসুক্যের অভাব ছিল না। মহিলার পুলিসী জেরার চোটে বাণী অস্থির হয়ে উঠেছিল, অনুপই বাঁচিয়ে দিল। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে ডাক দিলে—এবার চল।

আকাশ তখন অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে দু'চারটে তারা উঁকিঝুঁকি মারছে।

গৃহস্থকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমে এল দুজনে। অন্ধকারে পথ হাতড়ে এগিয়ে চললো।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই অবিনাশবাবুর আস্তানায় পৌঁছে গেল।

ওদের দেখে সবাই দারুণ খুশি—ছাড়তেই চায় না।

অরবিন্দর ঘরে ঢুকলে সেও একেবারে লাফিয়ে উঠলো আনন্দে—কত যুগ যেন দেখা হয়নি।

কিন্তু বেশীক্ষণ বসা গেল না। খাওয়ার জন্য দেরী করলে লাস্ট ট্রেনও মিস করতো। রাত্রে না ফিরলে বাণীর বাবার হয়ত ঘুমই হবে না। মুখে অবশ্য স্বীকার করেন না। কিন্তু রাত্রে ওকে সময়মত ফিরতে না দেখলে তিনি এখনও চিন্তিত হয়ে পড়েন।…

মাস চারেক আগে একদিন ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল বাণীর। অনিমাদের বাড়ী গিয়ে বৃষ্টিতে আটকা পড়েছিল। বৃষ্টি বলে বৃষ্টি! থামতেই চায় না! রাস্তায় জল জমে গেল শেষপর্যন্ত। রিক্সা করে রাত বারটায় বাড়ী ফিরেছিল বাণী। ওর বাবা তখনও ঠায় বসে চুরুট টেনে চলেছেন। বাণীর জন্যেই তিনি ঐভাবে বসেছিলেন, ব্যাপারটা এত স্পষ্ট যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি।…

যাবার জন্যে উঠে পড়লো ওরা। ব্যারাকপুর নয়, পলতা স্টেশন থেকেই ট্রেন ধরবে।

অরবিন্দর হঠাৎ কি খেয়াল হল, বললে—চল, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে—গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।…কলকাতায় আমার একটু কাজও আছে।

অরবিন্দর মত একজন সঙ্গী পেয়ে বাণী খুশিই হল, কিন্তু অনুপ অমন গম্ভীর হয়ে পড়লো কেন? দিব্যি হাসিখুশি ছিল, হঠাৎ কি হল ওর!

ট্রেনের কামরা বলতে গেলে একরকম ফাঁকাই ছিল।

জানলার ধারে পাশাপাশি দু'খানি বেঞ্চি অধিকার করে ওরা বসে পড়লো। উলটো দিকের বেঞ্চিতে একজন মাত্র লোক—সে-ও চোখ-বুজে পড়ে আছে। ঘোলাটে আকাশে এরই মধ্যে এক টুকরো চাঁদ উঠেছে—মরা জ্যোৎস্না।

দমকা হাওয়া অনুপের মাথার কোঁকড়া চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে গেল। হাত দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে সে বললে—আজকের যাত্রাটাই খারাপ।

—খারাপের কি দেখলে?—বাণী হেসে বললেঃ কেমন নতুন একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেল।

—অমন অভিজ্ঞতার অল্পও ভালো।—অনুপ প্রতিবাদ করে উঠলো। একটু থেমে অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বললে—চাষী রমণীর ঘর-সংসার দেখে সব ভুলে গেল—

অবিনাশবাবুর বাড়ীতে গিয়েই চাষী-পরিবারটির গল্প করেছিল বাণী।

অসমাপ্ত কথার জের টেনে অনুপ বললে—আমাকে একলা বসিয়ে রেখে সেই যে উধাও হল, আর দেখা নেই!

—একলাটা কোথায় শুনি?—বিস্মিত হয়ে বাণী প্রশ্ন করলেঃ জলজ্যান্ত অমন একটা জোয়ান মানুষ তোমার সামনে বসে—।

অরবিন্দর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বাণীর দিকে চেয়ে বললে—সত্যি কথা কি জান? ভদ্রলোকেরা হল জমিদারের জাত, চাষীদের তারা মানুষ মনে করে না।

অনুপ মৃদু আপত্তি তুললো। বললে—মানুষ হলেও ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব !—

—চলে না।—অনুপের কথার পাদপূরণ করলো অরবিন্দ! একটু চুপ করে থেকে বললে—ভদ্রলোকের বন্ধুত্বে ওরাও আজকাল আর বিশ্বাস করে না।…শ্রেণীগত সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠা—ডি-ক্লাস্‌ড্‌ হওয়া কি সহজ কথা!

অরবিন্দকে কেমন গম্ভীর দেখায় যেন।

অনুপও চুপ করে যায়।

স্টেশনে ট্রেন থামলেই অরবিন্দ আবার ছটফটিয়ে উঠলো জানলার ধারে গিয়ে সে-ই তো চা কিনলো।

বাণী বললে—শুধু চায়ে কুলোবে না, বেশ খিদে পেয়ে গেছে।

দরজার সামনে এগিয়ে বাণীই খাবার কিনে নিয়ে এলো। বেশি কিছু নয়, গরম কচুরি, সঙ্গে আলুর দম। শালপাতায় তিনজনের খাবার ভাগ করে নিলে সে।

খেতে খেতে অরবিন্দ বাণীকে লক্ষ্য করে মুচকি হেসে বললে—তোমার নতুন অভিজ্ঞতার কথাটা এবার শুনিয়ে দাও।

চাষী গৃহিণীর গল্প বলতে সুরু করলো বাণী। মুড়ি নারকেলের নাড়ু খাওয়া থেকে সুরু করে তাঁর সংসারের অনেক কথাই বলে ফেললো।

গৃহিণীর একটা প্রশ্ন মনে পড়ে গেল হঠাৎ। বিরক্তির ঝোঁকে বাণী বলে উঠলো—গ্রাম্য মেয়েদের আশ্চর্য ঔৎসুক্য!

—কেন, আপত্তিজনক কিছু জিজ্ঞেস করেছিল বুঝি?—মৃদু হেসে অরবিন্দ প্রশ্ন করলে।

বাণী মাথা নেড়ে সায় দিলে। ঠাট্টার হাসি হেসে বললে—জিজ্ঞেস করছিল, অনুপ আমার কে?

—কি বললে? দুটি উৎসুক জ্বলজ্বলে চোখ বাণীর মুখের উপর রেখে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলে।

—কি আর বলবো ! বললাম, কেউ নয়, পথের চেনা।

কৌতুকে অরবিন্দর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বাণীর চোখে চোখ রেখে বললে—আশ্চর্য ব্যাপার,—আর কিছু বলতে পারলে না ?

—কি আর বলবো বল ? ছেলে-মেয়েদের বন্ধুত্বে যে ওরা বিশ্বাস করে না !—একটু থেমে বাণী বললে—বাপ, ভাই কিংবা স্বামী—এ তিনটের একটা হওয়া চাই।

অরবিন্দ হেসে উঠলো—তার চিরঅভ্যস্ত প্রাণখোলা হাসি।

অনুপ হাসতে পারলো না···মুখ কালো করে বসে রইল—কোথায় যেন একটা বড় রকমের আঘাত পেয়েছে সে।

সন্তান মনের মত না হলে বাপ-মায়ের দুঃখ হয় সত্যি। কিন্তু তাই বলে তো আর তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা চলে না। নিজের হাতের আঙ্গুল কেউ কি কেটে ফেলতে পারে ?

হিন্দুর ছেলে হয়ে সমীর বিধবা বিয়ে করে বসেছে।

করেছে অবশ্য দায়ে পড়েই। প্রেম করলেও ওকে বিয়ে করার কথা সমীর ভাবেনি প্রথমটা। ভেবেছিল, এইভাবেই বুঝি চলতে পারবে। তা পারে কখনো ? ঐ বয়েসের ছেলেমেয়ে ? বয়েসেরও তো একটা ধর্ম আছে !

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সমীর ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল, তা যূথীই রাজী হল না। যূথীর আত্মীয়েরাও মারমুখো হয়ে উঠলেন।—

না, বিয়ে না করলে ওর আত্মীয়েরা কিছুতেই রেহাই দিতেন না সমীরকে।

ঘটনাটা ললিতার পক্ষেও মর্মান্তিক। কিন্তু জীবনে কত মর্মান্তিক ঘটনাকেই তো মানুষ মেনে নেয় !

ললিতার কোন যুক্তি-তর্কই শুনতে চায় না ভূপেশ। মুখের উপর

স্পষ্ট বলে দিয়েছে—এবাড়ীতে তোমার ছেলের আর কোনদিনও স্থান হবে না—

স্থান না হোক বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে তো আসতে পারে। ...সমীরের এক বন্ধুর কাছ থেকেই ঠিকানাটা যোগাড় করেছিল ললিতা। ভূপেশকে লুকিয়েই ছেলের কাছে চিঠি লিখেছিল।

সমীর এল না তবু। উত্তর অবশ্য দিয়েছে।...

বাপের ওপরই ওর যত রাগ। ভূপেশের সম্বন্ধে যা-খুশি লিখেছে।...

আর চিঠিটা এসে পড়লো কিনা ভূপেশেরই হাতে! বৈঠকখানায় ঢুকে পিয়ন তাঁর হাতেই দিয়ে গেল চিঠিখানা।

সমীরের হস্তাক্ষর দেখেই চিঠিটা খুলে ফেলেছিল ভূপেশ। পড়ে আগুন।...

—ওর কাছে তুমি আবার চিঠি লিখতে গেছ!—ললিতাকেই এখন সে দায়ী করছে সবকিছুর জন্যে : তোমার জন্যেই আজ ওর এই অবস্থা হয়েছে।

সকালবেলা এই নিয়ে ভূপেশের সঙ্গে ললিতার বেশ খানিকটা চটাচটি হয়ে গেছে। রাগ করে ললিতা তাই অন্নজল স্পর্শ করে নি সারাদিন।

রাগ হলেও ভূপেশ কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ঠিক মতই করেছে। কোর্টেও গেছে।

বিকেলে বাড়ী ফিরেও রাগ পড়লো না। দোতলায় শোবার ঘরে ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল। ললিতা নিজের হাতে চা-খাবার নিয়ে এলেও কথা বললে না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে আবার শুয়ে পড়লো। বারীনকে দেখেই না উঠে বসলো।

—শরীর খারাপ?—বারীনের গলায় উদ্বেগের সুর।

—না, বোস।

ভূপেশের সামনে চেয়ারে বসে পড়লো বারীন।

—ছেলে চিঠি লিখেছে।—দুঃখের হাসি হাসলো ভূপেশ।

জামার পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে এগিয়ে দিলে বারীনের হাতে।

মুখ তখনও থমথম করছে ভূপেশের। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই বললে না।

ললিতাও চুপ করে বসে ছিল খানিক দূরে।

চিঠি পড়া তখন শেষ হয়েছে। চিঠিটা ভূপেশের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বারীন সিগারেট ধরালো ধীরে-সুস্থে। এক মনে সিগারেট টেনে চললো।

সবাই চুপ করে ছিল। ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা নীরবতা। সেই নীরবতা ভেঙ্গে ভূপেশ হঠাৎ বলে উঠল—

এমন স্বার্থপর ও হল কি করে?—বারীনের দিকে একটা জ্বালাভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সে।

বারীন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ম্লান হেসে বললে—বর্তমান সভ্যতা মানুষকে যে স্বার্থপর হতেই শিক্ষা দেয়।…বেন্‌থাম্ মিল-ই হলেন এযুগের আদর্শ দার্শনিক।

ভূপেশ অসহায়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বারীনের দিকে।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ললিতাকে লক্ষ্য করে বারীন আচমকা বলে ওঠে—কি, চা হবে না?

ললিতা উঠে পড়লো। অনেক আগেই ওঁকে চা দেওয়া উচিত ছিল।

ললিতা ব্যস্ত হয়ে নীচে নেমে এলো। চা তৈরী হতে না হতে ওরা তুজনেও নেমে এল একতলায়। এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসে-ছিলেন ভূপেশের সঙ্গে। বারীন একা একা উপরে বসে করবে কি?

একতলায় নেমে ভূপেশ সোজা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলো। আর বারীন এসে বসলো ড্রয়িংরুমে।

সোফায় গা এলিয়ে বসে ছিলো বারীন। বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে ললিতা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে উঠে বসলো।

টিপয়ে চা নামিয়ে দিয়েই বেয়ারা বেরিয়ে গেল। বারীনের হাতে

চায়ের কাপ এগিয়ে দিলে ললিতা। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো হঠাৎ।

ললিতার দিকে তাকিয়ে বারীন কি ভাবলো একটু। চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—এতটা মুষড়ে পড়ার কি হয়েছে, আমি সত্যি বুঝতে পারছি না। ছেলেকে বিয়ে না দিয়ে তো থাকতে পারতেন না।

—একে আবার বিয়ে বলে!

বারীন যেন আশ্চর্য হয়ে যায়। বলে—পার্থক্যটা কি? কুমারী মেয়ের বদলে বিধবা মেয়ে, এই তো ব্যাপার। কুমারী, বিধবা কারুরই তো স্বামী নেই। আপত্তিটা তাহলে কোথায় বলুন?

এতখানি উদারতার সঙ্গে ললিতা গ্রহণ করতে পারে না ব্যাপারটাকে। মেলামেশা করতে চায় করুক, তাই বলে বিয়ে করা—সমাজ বলে তো একটা বস্তু আছে।

বারীনের কথার প্রতিবাদ না করে থাকতে পারলো না ললিতা।—কিন্তু ওকে নিয়ে আমি ঘর করবো কি ভাবে?

—ঘর না-ই বা করলেন।…ছেলের বউ নিয়ে ঘর করার রেওয়াজ তো আজকাল উঠেই যাচ্ছে—

কথাটা শুনেই বুকের ভেতর যেন কেমন করে উঠল ললিতার। একমাত্র ছেলে, তার বউ নিয়ে—

দৃষ্টিটা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এলো চোখের জলে। গালের উপর কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল, মুছে ফেলার ইচ্ছে পর্যন্ত হল না।

ললিতার চোখে জল দেখে বারীন কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়লো যেন। বললে—না, আপনারা সত্যি বড় সেন্টিমেণ্টাল্।—

একটু চুপ করে থেকে বললে—বাণীর জ্বর, সকালে তাই খাওয়া জোটে নি ভাল করে। ভেবেছিলাম, আপনার এখানে এসে কিছু অন্ততঃ জুটবে।

ললিতা লজ্জা পেয়ে গেল। বিকেলে বারীন জলখাবার না খেয়েই চলে এসেছে! চোখের জল মুছে ললিতা বললে—এতক্ষণ বলেন নি কেন?

—বলার সুযোগ পেলাম কোথায় ?—বলেই বারীন হাসলো একটু। ললিতা সোজা রান্নাঘরে এসে ঢুকলো। খানিক বাদে কফি, অম্‌লেট্‌ আর টোস্ট্‌ নিয়ে এলো। মিষ্টি পদার্থ বারীন তেমন পছন্দ করে না।

বারীনের সামনে কফির কাপ এগিয়ে দিতেই বারীন বলে উঠলো —খাবারটা ছুটো ডিসে ভাগ করে ফেলুন—অভুক্ত মানুষকে সামনে বসিয়ে রেখে খেলে খাবার হজম হয় না।

ললিতার এবার অবাক হবার পালা। ও না খেয়ে আছে, বারীন জানলো কি করে ?

ভূপেশও তো জানে না।

আশ্চর্য হয়ে ললিতা বললে—না খেয়ে আছি, কে বললে ?

—আমাকে এত বোকা ভাবছেন কেন ?···আপনি না খেয়ে আছেন, মুখ দেখলেই তো বোঝা যায়।

ছুঃখে-আনন্দে বুকের ভেতরটা কেমন টনটন করে উঠল ললিতার। মায়ের মৃত্যুর পর এমন সহানুভূতি সে আর কার কাছে পেয়েছে ?··· ললিতার দাদা-বৌদিরা ললিতাকে যত্নআত্তি করেন যথেষ্ট। কিন্তু মুখ দেখে খিদের কথা ধরতে পারবেন কি !···ভূপেশও কি পেরেছে ? পারবে কি করে ? সারাদিনের ভেতর ললিতার মুখের দিকে সে একবার ভাল করে চেয়েও দেখে নি।···

—কই, নিন।—বারীন তাড়া দিলে।

—আপনি খেয়ে নিন, আমি পরে খাবো।

বারীনের যেন জেদ চেপে গেল। ছুটো ডিসে নিজেই খাবারটা ভাগ করে ফেললো।

একটা ডিস ললিতার দিকে এগিয়ে দিলে সে।

খাওয়ানোর জন্যে বারীন কাউকে এমন পীড়াপীড়ি করতে পারে, ললিতা ভাবতেই পারে নি। অথচ কথাবার্তায় কিরকম কাটখোট্টা মানুষ।

খাওয়া হয়ে গেলেই বারীন চলে গেল।

যাবেই তো, বাড়ীতে মেয়ের অসুখ। সেবা করতে না পারলেও কাছে তো বসে থাকতে পারবে।···আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে মানুষটির। চুপ করে কাছে বসে থাকলেও মনে কেমন জোর পাওয়া যায়!

পৌষের প্রথম থেকেই হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছে।

শীতে অবশ্য কাবু করতে পারে না ললিতাকে। খাওয়া বল, বেড়ানো বল, সব কিছুর পক্ষে এই সময়টাই তো ভালো।···কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় বাইরে বেরিয়ে সুখ নেই। সারা শহরের উনুনের কালি পঙ্গপালের মতই ভিড় করে থাকে মাথার উপর—চোখের সামনে। তাকালে চোখ জ্বালা করে দস্তুরমতো।

কি দরকার রোজ রোজ বাইরে বেরুনোর? বেড়াতে এখন আর তেমন ইচ্ছেও করে না ললিতার। তার চেয়ে ঘরে বসে গল্প করা অনেক ভালো।

কিন্তু গল্প করার লোক কোথায়? সন্ধ্যেবেলায় বেশির ভাগ দিন ভূপেশ অবশ্য আজকাল বাড়ীতেই থাকে। কিন্তু কথা সে খুব কমই বলে। আর বললেও সেই সমীরের কথা। মনটা তাতে আরো খারাপ হয়ে যায়।···বাইরের কেউ যদি এই সময়ে বেড়াতে আসে!

কিন্তু বাইরের লোক কার এমন দায় পড়েছে রোজ রোজ আসতে?

আসতে একজন অবশ্য রোজই রাজী। বললেই গাড়ী নিয়ে হাজির হবে নলিনাক্ষ। বেড়াতে, সিনেমা দেখতে, এমনকি হোটেলে ঢুকে ওর সঙ্গে ডিনার খেতেও আপত্তি নেই ললিতার। বাড়ীর এই একঘেয়েমির হাত থেকে তো কিছুক্ষণের জন্যে বাঁচা যায়।···

বিকেলে চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে কোনদিন ভালো লাগতো না ললিতার। বিয়ের আগে, ছেলে, মেয়ে—সবার সঙ্গেই সে সমানভাবে হৈ-হৈ করে বেড়াত।···নির্দোষ আমোদ। তবে ছেলেগুলো সত্যিই বড় হ্যাংলা, একটু মিশলেই মনে করে মেয়েরা তাদের ভালবাসায় পড়ে

গেছে।...ওকে নিয়ে দস্তুরমতো কম্‌পিটিশন্‌! আগের কাল হলে হয়তো ডুয়েল লড়তেই আহ্বান করতো।

ভূপেশ একেবারে অন্য ধাঁচের মানুষ। ফিরেও তাকাতো না ওর দিকে। আর সেইজন্যেই হয়তো ললিতার অমন ঝোঁক চেপে গেছল ওর সম্বন্ধে—যাক্‌ গে, ওসব পুরানো কথা।

এক যুগ বাদে নলিনাক্ষের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে, কে ভেবেছিল? দেখে খুশিই হয়েছিল ললিতা, শত হলেও অনেক দিনের চেনাজানা।

হ্যাঁ, ভূপেশের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হবার আগে ওর সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল বইকি! তা ওরকম এক-আধটু ফ্লারটেশন্‌ কোন্‌ ছেলে-মেয়ে না করে বিয়ের আগে?...

সপ্তাহ খানেক আগে। বিকেলবেলায় মনটা ভালো লাগছিল না বলেই ওকে টেলিফোন করেছিল ললিতা। বাইরের হাওয়ায় খানিকটা ঘুরে এলে যদি—।...ভূপেশের তো সময়ই নেই বেড়াতে নিয়ে যাবার।

টেলিফোন পেয়েই নলিনাক্ষ চলে এল গাড়ী নিয়ে। এসে বললে —চল বেড়িয়ে আসা যাক।

কাপড়-জামা বদলে তৈরী হয়েই ছিল ললিতা। নিছক বেড়িয়ে আসার জন্যেই যাওয়া। ফেরার পথে সে যে ঐরকম একটা কাণ্ড করবে, কে ভাবতে পেরেছিল!...

গাড়ীতে পাশাপাশি বসে ছিল দু'জনে—সে-তো আগেও কতদিন বসেছে। কাঁধের উপর হাতটা রেখেছিল, ললিতা তাতেও আপত্তি করে নি। কিন্তু হঠাৎ ওকে ঐভাবে—

ললিতা কষে ধমক লাগিয়েছিল।—বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ—

বাড়াবাড়ি নয় তো কি! বিয়ে করেছে, বউ বছর বছর ছেলে বিয়োচ্ছে—ললিতাকে কি ভেবেছে ও?

ধমক খেয়ে ঘাবড়ে গেল নলিনাক্ষ। বললে—ক্ষমা কর—

বাড়ির দোরগোড়ায় গাড়ীটা এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা নেমে পড়েছিল—কোন কথা বলে নি।

উত্তেজনায় তখনও কান-মাথা গরম হয়ে ছিল ললিতার। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বারীন এসে সামনে দাঁড়াল—ভূপেশের সঙ্গে গল্প করে বাড়ি ফিরছে।

গাড়ী নিয়ে নলিনাক্ষ ততক্ষণে চলে গেছে।

বারীন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ললিতার দিকে। বিস্ময়-বিদ্রূপ মিশ্রিত আশ্চর্য দৃষ্টি! সেই দৃষ্টিটা এখনও যেন চোখে ভাসছে ওর।

খানিক বাদেই হালকা পরিহাসের ছলে বারীন বলে উঠেছিল—মেম সাহেবের সান্ধ্যভ্রমণ সারা হল?

কথাটা চাবুকের মতই এসে গায়ে লেগেছিল যেন। ললিতা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে বলেছিল—এখুনি চলে যাচ্ছেন?

একটু হেসে বারীন উত্তর দিয়েছিল—হ্যাঁ, রাত হয়েছে বইকি!...

তারপর নলিনাক্ষ আর আসে নি ওদের বাড়িতে। আসতে সাহস পায় নি হয়ত।

আসার মধ্যে এখন ঐ একজন—বারীন। তা সে-ই বা রোজ আসে কোথায়। সময়ের তাঁরও অভাব আজকাল।...এলেও ললিতার সঙ্গে সে ক'টা কথা বলে?

পয়লা জানুয়ারী, উনিশ শো তেপান্ন সাল!

'নিউ ইয়ারস্ ডে'—বছরের প্রথম দিনেও বারীন যে একবার ওদের বাড়িতে ঘুরে যাবে না, ললিতা ভাবতেই পারে নি। সমীরের কথা ভুলতে না পারলেও সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করেছিল সে। সামনে বসিয়ে ছেলেকে খাওয়াতে পারলো না—ভজুয়ার হাতে সে তাই চুপিচুপি সমীরের ওখানে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে টিফিন ক্যারিয়ার ক'রে। তা'ছাড়া, মানসী অনুপও তো আছে।...বছরকার দিনে কিছু

ভালো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন না করলে ঠাকুর-চাকরগুলোই বা খুশি থাকবে কেন ?…বারীনের জন্যেও কি আলাদা করে খাবারের ব্যবস্থা করে নি সে ?

করেছিল। আর পাঁচজনের মত সে মিষ্টি পছন্দ করে না বলেই তো ললিতা দোপেয়াজী আর মোগলাই পরোটা করে রেখেছিল।… দোপেয়াজী বারীনের অতি প্রিয় খাদ্য। বহুদিন আগেকার সেই ঘটনাটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে ওর…মানসীর তখনও জন্ম হয় নি। এই দোপেয়াজী নিয়ে কি হাসাহাসি-ই না করলো দুই বন্ধুতে।…

দোপেয়াজীর প্লেটখানি বারীনের সামনে এগিয়ে দিয়ে ললিতা জিজ্ঞেস করেছিল—নিজে রেঁধেছি, কেমন হয়েছে বলুন।

চামচে দিয়ে মাংসের টুকরো মুখে পুরে বারীন ওর দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে কি যেন ভাবলো একটু। তারপর খাবারের প্লেটখানি আচমকা ললিতার সামনে এগিয়ে ধরে বললে—একটু কথা বলুন—ত্রুটিটা তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।

কি বলতে চাইছে ? ললিতা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে ছিল।

বারীন মুচকি হেসে বলে উঠেছিল—ঝালটা কম হয়েছে কিনা—

ভূপেশ হো হো করে হেসে উঠেছিল, হাসতে হাসতে প্রায় বিষম খাচ্ছিল আর কি !

কি আনন্দেই না কেটেছে সেই দিনগুলো।…

রাত দশটা অবধি ওরা বারীনের জন্যে অপেক্ষা করেছে, কিন্তু বারীন এল না।

দোসরা জানুয়ারী। সন্ধ্যার পর এসে হাজির হল হঠাৎ। একটু আগেই ভূপেশ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। কি একটা জরুরী কাজে।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে বারীন বলার আগেই সোফায় বসে পড়লো—তারপর কেমন আছেন ?—ললিতাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে।

—আমাদের খবরে আর দরকার কি ?—ললিতা গম্ভীর মুখে উত্তর দিলে : দুঃখের দিনে বন্ধু-বান্ধবও মানুষকে ভুলে যায়।

বারীন হাসলো একটু। সিগারেট ধরিয়ে বললে—ভূপেশ কোথায় ?

—বাড়ী নেই।

ললিতা উঠে গিয়ে চা নিয়ে এলো।

চা খেয়েই চলে গেল বারীন। পাঁচ মিনিটও বসলো না! আসার তবে দরকার ছিল কি? ভূপেশ বাড়ীতে থাকলে এত শীগগির চলে যেত না নিশ্চয়।...

একা একা সময় কাটে না ললিতার। সর্বক্ষণ ঘর-সংসারের কাজ নিয়ে থাকতেই বা কার ভাল লাগে? আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়েও এখন কোনো শান্তি নেই। ললিতাকে অপদস্থ করার জন্মেই যেন তাঁরা সমীরের কথা তোলেন। সব জেনেও না জানার ভান করেন।...

মুখ টিপে হাসি চেপে সেদিন ওর ছোটবৌদি ওর মুখের উপরই জিজ্ঞেস করলেন—ছেলের খবর কি?—ললিতা যেন কিছুই বোঝে না। আত্মীয়স্বজনের বাড়ী যাওয়া তাই এখন ছেড়ে দিয়েছে সে।

কিন্তু একলা থাকলে ঐ ছেলেটার কথাই যে আবার ঘুরে ফিরে মনে আসে। একলা না থেকে উপায়ও নেই। মানসী বাড়ীতে থাকা, না-থাকা সমান।

বি.এ. পাস করার আগেই তার পাখ্‌না গজিয়েছে—ধরাকে সে এখন সরা জ্ঞান করে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই সে নাকি চাকরিতে ঢুকবে। বড় বড় বুলি কপচায়—অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা চাই।

স্বাধীনতা! স্বাধীনতার নামে যত সব ওঁছা ছেলের সঙ্গে বাঁদরামি করে বেড়ানো। আর ঐ অরবিন্দ ছোকরাটারই বা কি সাহস! ছু'বেলা যার খাবার সংস্থান নেই—

কিন্তু মানসীর হঠাৎ ওর উপর অত ঝোঁকই বা এল কেন? পছন্দ করতে হলে কি ভাল ছেলের অভাব?

মেয়ের জন্যে তাই উদ্বেগের সীমা নেই ললিতার। বিয়েটা হয়ে গেলে যেন বেঁচে যায় সে।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে মানসী এখানে ওখানে এরই মধ্যে দরখাস্ত ছাড়তে আরম্ভ করেছে, চাকরির জন্যে। ললিতা নিজের চোখে ওর টেবিলের উপর সেদিন একখানা দরখাস্ত দেখেছে।

ভূপেশের কাছে এসব আলোচনা তুলে কোনো লাভ নেই।.... মেয়ের সম্পর্কে দারুণ দুর্বল সে। যত তম্বি ঐ ছেলের উপর।

বড়দার সঙ্গেই না হয় একবার গিয়ে আলোচনা করবে সে।

অনেক ভেবে-চিন্তে পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় বড়দার কাছে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে ললিতা। ওঁদের ওখানে যাবার সময় ভালো পোশাকেই যেতে হয়, আই. সি. এস. মানুষ। যাবার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডার-পাফটা বুলিয়ে নিচ্ছে, এমন সময় গলা খাঁকারি দিয়ে বারীন ঘরে ঢুকলো।

ঢুকেই সেই বিচিত্র হাসি। ললিতার বেশভূষা লক্ষ্য করে বললে—বেরুচ্ছেন বুঝি ?

থতমত খেয়ে ললিতা একটা মিথ্যে কথা বলে ফেললো—হ্যাঁ, দোকানে কিছু কেনা-কাটার দরকার ছিল। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠল না—আকাশে মেঘের আভাষ দেখে মতটা পালটে ফেললো। জামা-কাপড় বদলে খানিকবাদে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো আবার।

দোতলায় ওর ঘরে বসেই ভূপেশের সঙ্গে গল্প করছিল বারীন। ললিতাকে যেন দেখতেই পেল না। অন্য কাজ না পেয়ে ললিতা উল বুনতে বসলো—খাটের উপর।

ভূপেশকে লক্ষ্য করে বারীন পুরানো কথার খেই ধরে বললে—খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, এখন সমাজতন্ত্রেও তোমরা ভেজাল মেশাতে চাও ?...কিন্তু দেশের লোককে এত বোকা ভেব না। তারাও এখন ভাবতে শিখেছে।

তুমি কি বলতে চাইছো বুঝতে পারছি না।—ভুপেশ বললে।

—না বোঝার কিছু নেই।—শ্লেষের স্বরে বারীন উত্তর দিলে : সোশিয়ালিষ্ট ইকনমি ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই—

উদগ্রীব হয়ে বারীনের কথা শুনছিল ভূপেশ।

হ্যাঁ, বারীন একাই বলে চলেছিল। মিক্স্‌ড্‌ ইকনমির বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়লো একচোট।

ইচ্ছে থাকলেও প্রতিবাদ করার সুযোগ পেল না ভূপেশ। দু'দণ্ড সুস্থ হয়ে বসে কথা বলার উপায় আছে ওর? কলিং বেলের আওয়াজ শুনেই নীচে নেমে গেল। কে আবার এল এমন অসময়ে?

ভূপেশ চলে গেলে বারীন দিয়াশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালো। একাগ্র হয়ে সিগারেট টেনে চললো। ঘরে যে আর একটা মানুষ আছে, একথা যেন সে ভুলেই গেছে।

ললিতা নিজে যেচেই কথা তুললো। মেয়ের কথা।—মানসীর কাণ্ড শুনেছেন?

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বারীন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ললিতার দিকে।

ললিতা বললে—ও নাকি এখন চাকরি করবে।

বারীন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সিগারেটের ধোঁয়া বুকে টেনে নিয়ে বললে—চাকরি করতে চায়, সে তো ভালো কথা, এতে আপত্তির কি আছে?

ললিতা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, বারীন তার আগেই হেসে বলে উঠল—

জানেনই তো আমি স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।

স্বাধীনতায় কে না বিশ্বাস করে! কিন্তু তার সঙ্গে চাকরির কি সম্পর্ক আছে? ললিতা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—কিন্তু ওর বিয়ে যে ঠিক হয়ে আছে।···বিয়েটা তাহলে ভেঙ্গে দিতে বলেন?

বারীন চুপ করে কি যেন ভাবলো একটু। তারপর বললে—আমি কি বলবো বলুন? আপনার মেয়েকেই বরং জিজ্ঞেস করুন।

ললিতা নির্বাক হয়েই রইল। নীরবতা ভেঙ্গে বারীন বললে— যার বিয়ে তার মতটাই আগে নেওয়া দরকার নয় কি ?—

বারীনকে জিজ্ঞেস করতে যাওয়াই ভুল হয়েছে ললিতার। ওঁকে আপন লোক মনে করে বলেই না—। অন্তরে আঘাত দিয়ে কথা বলাই যেন ওঁর স্বভাব।

দুঃখ হলেও ললিতা সেটা প্রকাশ করলে না, গম্ভীর হয়ে রইল শুধু।

বারীন লক্ষ্যও করলে না!—চলি।

আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেল। একতলায় বৈঠকখানায় গিয়ে এখন ভূপেশের সঙ্গে নিশ্চয়ই গল্পে বসবে।

খাট থেকে নেমে ললিতা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ওকি, বারীন এখুনি চলে যাচ্ছে ? লনের পাশ দিয়ে সোজা সদর দরজার দিকে চলে গেল !

জানলার গরাদ ধরে বারীনের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল ললিতা। উপেক্ষিত, সংসারে সবার উপক্ষিত সে।

অভিমানে চোখে জল এল তার। কার উপর অভিমান ? ছেলে ? মেয়ে ? স্বামী ?···

ললিতার গাল বেয়ে চোখের নোনা জল গড়িয়ে পড়লো ফোঁটায় ফোঁটায়।

শীতের ম্লান সন্ধ্যা। গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে বৈঠকখানায় বসে ছিলো ভূপেশ। কোর্ট থেকে ফিরে সুস্থ হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করারও উপায় নেই। কেউ না কেউ এসে হাজির হবে। আধ ঘণ্টার উপর বকবক করে তবে উঠে গেলেন ভদ্রলোক।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভূপেশ ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলে।

করিডোরে পায়ের শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।—আমার কাছে কেউ এসেছিল ?—মানসী কাকে যেন জিজ্ঞেস করছে, চাপা গলায়।

সন্ধ্যার আগে মেয়ে আজকাল বাড়ী ফেরেন না।···দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে। মেয়েকে অনেক আদর, অনেক স্বাধীনতা দিয়েছে ভূপেশ। কিন্তু আর না, আর দেরী করা চলে না। যত শীঘ্র সম্ভব ওকে পাত্রস্থ করা দরকার। যা দিনকাল, যা তা একটা কিছু করে বসতে কতক্ষণ।

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে ভূপেশ দোতলায় উঠে এল।

শোবার ঘরে এসে ঢুকলো, ললিতার সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার। নিজে থেকেই মেয়ের বিয়ের কথা তুললো ভূপেশ।

মুখ নাড়া দিয়ে ললিতা অমনি বলে উঠলো—তবু যা হক, এতদিনে বাপের চৈতন্য হল! কথায় বলে, গরীবের কথা বাসী হলে কাজে লাগে।

ভূপেশ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো।

ললিতা বললে—মেয়ে যে মাষ্টারী করতে আরম্ভ করেছে, সে-খবর রাখ?

—মাষ্টারী করছে! মানসী?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তোমার আদরিণী মেয়ে গানের স্কুলে মাষ্টারী করছে।

ললিতা ব্যাপারটা খুলে বললো ভূপেশকে।···

সন্ধ্যার কিছু আগে মানসীর এক বন্ধু নাকি বেড়াতে এসেছিল। মানসী তখনও বাড়ীতে ফিরে আসে নি। বন্ধুকে না পেয়ে বন্ধুর মায়ের সঙ্গেই গল্প জুড়ে দিয়েছিল···খানিক অপেক্ষা করলেই মানসী এসে পড়বে, এই আশায়।

মেয়েটির মুখে খবরটা শুনে ললিতা প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারে নি। কথাটা বলে ফেলে মেয়েটি তো একেবারে অপ্রস্তুত! বাপ-মাকে না জানিয়েই মানসী চাকরি করছে, খবরটা জানা ছিল না তার। জানলে হয়ত সাবধান হয়েই কথা বলতো।···

মানসী বাড়ী ফেরার আগেই সে চলে গেছে।

—মানসীকে জিজ্ঞেস করেছিলে?—ভূপেশ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো।

—না, জিজ্ঞেস করে কি হবে?···উলটো পাঁচ কথা শুনিয়ে দেবে।

মেজাজ গরম হয়ে উঠলো ভূপেশের। চেঁচিয়ে ডাক দিলে মানসীকে। ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হল সে।

—তুমি নাকি চাকরি করছো?

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল মানসী। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে—কিছু অন্যায় করিনি তো বাবা—

কথাটা শুনেই ধাঁ করে রক্ত মাথায় চড়ে গেল ভূপেশের। কঠিন স্বরে বললে—না, আমার বাড়ীতে থেকে তোমার মাষ্টারী করা চলবে না।

কাঁচুমাচু মুখ করে মানসী হাতের নখ খুঁটতে লাগলো।

ভূপেশের কেমন মায়া লাগলো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। স্বর খানিকটা নামিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে—কত টাকার দরকার তোমার শুনি?

মানসী যেন দ্বিধায় পড়ে গেল।—শুধু টাকার জন্যেই কি—

—টাকার জন্যে নয়!—ভূপেশ অবাক হয়ে যায়: তবে কিসের জন্যে চাকরি করতে গেছ?

মানসী এবার দ্বিধাহীন ভাবেই বললে—তুমি এত রাগ করছো কেন বাবা?···মেয়েরা সবাই তো আজকাল নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়! ভূপেশ রাগে কথা হারিয়ে ফেললো।

ললিতা কিন্তু ঝাঁঝিয়ে উঠলো—হ্যাঁ, সারা জীবন চাকরি করেই খেতে হবে তোমাকে—।

ভূপেশের দিকে চেয়ে বললে—কি ছিরি করেছে চেহারার, দেখেছ? —এমন উড়নচণ্ডী চেহারা দেখলে ভদ্র ঘরের কোনো ছেলে কি—

কথাটা শেষ করলো না ললিতা।

মানসী মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ওকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ললিতা আরো খেপে গেল। মেয়েকে লক্ষ্য করে বললে—আমিও বলে রাখছি, সারা জীবন আই-বুড়ো করে ঘরে রাখলেও ঐ ভবঘুরে ছোকরার সঙ্গে কিছুতেই তোর—

দোরগোড়ায় বাণীকে দেখে আচমকা থেমে গেল সে।

মানসীও অমনি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আশ্চর্য জেদী মেয়ে! এতটুকু দমলো না বকুনি খেয়ে। বাপ-মায়ের কথা অগ্রাহ্য করেই স্কুল করতে লাগলো। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘণ্টা দুয়েক বাদেই অবশ্য ফিরে আসে—কতকটা টুইশনির মতন। এ নিয়ে চেঁচামেচি করে লাভ নেই। ···নিজের ভাল যদি নিজে না বোঝে—

ভূপেশ কত দিক সামলাবে?

শান্তিনগরের জমাজমি নিয়ে কিছুদিন থেকেই ভাবনায় পড়েছে সে। রিফিউজীদের সাহস যে রকম বেড়ে উঠছে, ভূপেশের জমি কখন দখল করে বসে কে জানে!

রবিবার বলেই আজ দুপুরে গাড়ী নিয়ে শান্তিনগরে গিয়েছিল সে। নিজে উপস্থিত না হলে পাওনা আদায় করা যায় না। সুবিধা পেলে সবাই ফাঁকি দেয়। ভূপেশ নিজে তো আর লাঙ্গল ধরতে পারবে না!

বাড়ী থেকে বেরুতেই দুটো বেজে গেছল। সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ী ফেরার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু কাজটা তাড়াতাড়ি চুকে যাওয়ায় নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ফিরে এল ভূপেশ।

গেট খুলে বাগানের পাশ দিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছিল সে।

মাটির গুণে ঝাউগাছটা ডালপালা ছড়িয়ে এরই মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে।···সন্ধ্যার আবছা আলোয় ঝাউগাছটার পাশে অমন ঘনিষ্ঠ-ভাবে কারা বসে আছে? মানসী! মানসীর পাশে কে ও? অরবিন্দ?

মশগুল হয়ে দুজনে গল্প করছে। এত মশগুল যে ভূপেশকে তারা লক্ষ্যও করলে না।

ঘরে না ঢুকে মানসীকে নিয়ে ছোকরা এখানে এই ঠাণ্ডায় বসে আছে কেন? অরবিন্দর দুষ্ট অভিসন্ধি সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না ভূপেশের মনে।...স্পর্ধার কোন সীমা নেই ছোকরার।

রাগে, অপমানে ভূপেশ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ভজুয়ার লাঠির আওয়াজে চমক ভাঙ্গলো।

হ্যাঁ, লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ভজুয়া তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

ভূপেশ আর দাঁড়াল না—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বৈঠকখানার দিকে।

ললিতা নীচে নেই। না-ই বা থাকলো। ভূপেশের উপরে যেতে ইচ্ছে হল না। বৈঠকখানাতেই বসে রইল চুপচাপ।

খানিক বাদে মানসীকে ওর ঘরের সামনে দিয়ে যেতে দেখে ডাক দিলে। না ডাকলে মানসী এখন আর বাপের কাছে আসে না।

ঘরে ঢুকে সে দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে। কি ভাবছিল যেন। হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—আমাকে কিছু বলবে?

—হ্যাঁ, বলার জন্যেই তো ডেকেছি।—চেয়ার থেকে উঠে ভূপেশ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো।

পায়চারি করতে করতেই বললে—তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ঐ বকাটে ছোকরাটার সঙ্গে মেলামেশা একদম বন্ধ করে দাও।

মানসী হঠাৎ যেন বেপরোয়া হয়ে উঠলো। স্থির দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় উত্তর দিলে—আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে বাবা, কার সঙ্গে মিশবো, না মিশবো সে আমি নিজেই ভালো বুঝবো।

—তুমি নিজেই ভালো বুঝবে?—ভূপেশ আর কোন কথা খুঁজে পেল না।

মেজাজের ভঙ্গিতেই মানসী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বিপন্ন হয়ে ভূপেশ আবার চেয়ারে বসে পড়লো। মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো।...মেয়েকে নিয়ে এখন কি উপায় করবে সে!

আর বারীনও তখুনি এসে উপস্থিত হল। ওকে দেখলেই দুঃখ, রাগ, উত্তেজনা সব যেন বেড়ে যায় ভূপেশের—চেপে রাখতে পারে না।

চেয়ারে বসে বারীন খবরের কাগজ দেখছিল, তাকে লক্ষ্য করে ভূপেশ বললে—অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিত।···ওদের লেখাপড়া শিখতে দেওয়াই ভুল।

বারীন ওকে আমলই দিলে না। ঠোঁটের কোনে একটু হেসে মন্তব্য করলে—নতুন কিছু বলতে পারলে না।···কথাটা অনেক পুরানো, মনুসংহিতার যুগের।

—পুরানো হলেও খাঁটি।—ভূপেশ পালটা জবাব দিলে : নতুন কথা বলার মোহে মানুষ বেশির ভাগ সময় বাজে কথাই বলে থাকে।

কথাগুলো বারীনের মনের উপর এতটুকু রেখাপাত করলো বলে মনে হল না। ভূপেশের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ঐভাবে হাসছিল কেন?

সারাদিন দারুণ পরিশ্রম গেছে অরবিন্দর।

বিকেলবেলায় বাড়ী ফিরেই মানসীর চিঠি পেল। দু'দিন আগেই কলকাতা থেকে ঘুরে এসেছে সে, এর মধ্যেই আবার চিঠি! জরুরী তলব : চিঠি পেয়েই আমার সঙ্গে দেখা করবে। বিশেষ দরকারী কথা আছে।—

অরবিন্দ চিন্তিত হয়ে পড়লো। মা-বাবার সঙ্গে কিছুদিন থেকেই মানসীর বনিবনা হচ্ছে না। বিশেষ করে চাকরিটা নেবার পর থেকে তাঁরা ভীষণ চটে আছেন ওর উপর। অথচ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের যে স্বাধীন সত্ত্বাবোধই লোপ পেয়ে যায়!···মানসীকে সে নিজেই তো একদিন উপদেশ দিয়েছিল।—জীবনে কারো ছায়া হয়ে থাকবার চেষ্টা কোর না।···সামাজিক শ্রমে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে মেয়েদের—

বিপদে পড়েই হয়তো মানসী ডেকে পাঠিয়েছে ওকে।···

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চটপট পোশাক বদলে অরবিন্দ রওনা হল

কলকাতায়। 'পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্র' বইখানির এক কপি সঙ্গে নিলে সে। সদ্য প্রকাশিত এই বইখানির প্রকাশক অরবিন্দর বন্ধু-মানুষ—খানকতক বই দিয়েছিল বিক্রির জন্যে। মানসীকে একখানি গছিয়ে দিয়ে আসবে সে।

ট্রেন আর বাসের ভিড় ঠেলে অরবিন্দ যখন বালিগঞ্জে মানসীদের বাড়িতে এসে পৌঁছুল, সন্ধ্যার আকাশ তখন ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

বাড়ীর সামনের দিকে বারান্দায় উঠেই জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো অরবিন্দ—সকাল থেকে আজ এক মুহূর্তও বিশ্রাম পায় নি সে।

বৈঠকখানার পাশ দিয়ে অনুপের ঘরের দিকে যাবে, এমন সময়ে ভূপেশবাবু হঠাৎ এগিয়ে এলেন ওর সামনে। অরবিন্দর মুখের দিকে একটা কঠিন দৃষ্টি রেখে গম্ভীর গলায় বললেন—তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

আশ্চর্য হলেও অরবিন্দ সে-ভাবটা সামলে নিলে। সহজ গলায় বললে—বলুন।

—এখানে নয়, ঘরে চল।—দস্তুরমতো হুকুমের সুর।

মনে মনে লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলে না অরবিন্দ।

ভূপেশের সঙ্গে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলো সে। অরবিন্দকে বসতেও বললেন না তিনি। রাগে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল অরবিন্দর।

চেয়ারে বসে অরবিন্দর হাতের বইটার দিকে একটা ব্যগ্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ভূপেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কি বই ওটা?

কথা না বলে বইটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলে অরবিন্দ।

'পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্র'!—অসীম বিরক্তি ফুটে উঠলো ভূপেশের মুখে। ভুরু কুঁচকে বইখানির পাতা উলটে চললেন তিনি। একটা পাতায় দৃষ্টিটা থমকে গেল তার। বিড়বিড় করে পড়ে চললেন—"এ স্পেক্‌-টার্‌ ইজ্‌ হনটিং য়ুরোপ—দি স্পেক্‌টার্‌ অব কম্যুনিজম।" একশ বছর আগে ইওরোপের রাজনীতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে মার্কস বলেছিলেন,

"ভূতের ভয়ের মতই কম্যুনিজমের আতঙ্ক আজ ইওরোপের জমিদার'ও ধনিকগোষ্ঠীকে পেয়ে বসেছে।......"

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বইটা বন্ধ করে অরবিন্দর দিকে বিরক্তিভরা চোখে তাকিয়ে ভূপেশবাবু বললেন—এ বই যোগাড় করলে কোত্থেকে ?

কথাটা শুনেই মেজাজ গরম হয়ে উঠেছিল অরবিন্দর। গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে উত্তর দিলে—বইয়ের দোকান থেকে।

আগুনে যেন ঘি পড়লো। দপ করে জ্বলে উঠলেন ভূপেশ। ধমকের সুরে বললেন—এসব বাজে বই নিয়ে এবাড়ীতে আসার মানে ?

অরবিন্দর রোখ চেপে গেল। বললে—মানেটা খুবই সোজা—এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের এই সব বই পড়া উচিত।

ভূপেশবাবু কেমন হকচকিয়ে গেলেন উত্তরটা শুনে। কিন্তু তা একটু সময়ের জন্যেই।

প্রসঙ্গ বদলে তিনি তখন সোজা অরবিন্দকে নিয়ে পড়লেন।... অরবিন্দর বিরুদ্ধেই তাঁর যত অভিযোগ! অভিযোগ, মানসীর সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে। কথাগুলো এমনই অসম্মানজনক যে শোনার পর মানসীর সঙ্গে আর দেখা করতে ইচ্ছে হল না।

ভূপেশের বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ সোজা রাস্তায় এসে নামলো। একটিবারের জন্যেও পিছন ফিরে তাকালো না। তাকালে হয়তো দেখতো, মানসী জানলার ধারে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

না, মানসীর কথা ভেবেও সে পিছন ফিরে তাকায় নি। আত্ম-সম্মানের কাছে স্নেহ-ভালবাসাও তুচ্ছ হয়ে যায়।

একটি সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। তবু মানসী আর খবর নিলে না অরবিন্দর। অভিমান করেও তো একখানা চিঠি দিতে পারতো! বাপের উপদেশ শুনে হয়তো এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।... ভালোই হয়েছে—জীবনে সুখী হতে পারবে।

মাঘ মাস। শীতটা এবার বেশ জাঁকিয়েই এসেছে। রাত্রে

বাইরে বেরুতে গেলে হাত-পা যেন জমে আসে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে অনুপকে নিয়ে বাণী এসে উপস্থিত হল। রাত্রে ওরা আজ আর কোলকাতায় ফিরছে না, অবিনাশবাবুর বাড়ীতেই থাকবে।

খাওয়া—দাওয়ার পর অরবিন্দর ঘরে এসে বসলো দু'জনে।

দু'চার কথার পরেই মানসীর কথা তুললো বাণী। বললে—মানসীকে নিয়ে এলে বেশ হত।

মাথা নেড়ে অনুপ আপত্তি জানালো—না বাবা, ওকে এনে কাজ নেই, কাকীমা তাহলে আমাকে—

কথা শেষ না করেই থেমে গেল অনুপ।

অরবিন্দ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেললো—মানসীর খবর কী? চাকরি করছে?

বাণীর চোখে দুষ্টুমির হাসি খেলে যায়। বলে—চাকরি করলেও তোমার কোন আশা নেই।...একটা ভবঘুরে ছেলের সঙ্গে কাকীমা মেয়ের বিয়ে দেবেন মনে করেছো?

অরবিন্দ হেসে ফেললো—আমাকেই বা হঠাৎ এমন বিয়ে-পাগলা বলে ঠিক করলে কেন?

মাথা দুলিয়ে বাণী হাসতে থাকে।

অনুপ কি যেন ভাবছিল নিজের মনে। বাণীকে লক্ষ্য করে হঠাৎ প্রশ্ন করলে—প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের চেয়ে 'ভবঘুরেরা'ই বেশি ইণ্টারেসটিং নয় কি?

অরবিন্দ সায় দেয় ওর কথায়।—ঠিক বলেছ, এ সমাজে ভবঘুরেরাই অনেক বেশি ইণ্টারেস্টিং।—বর্তমান সভ্যতাকে অস্বীকার না করে মানুষ আজ আর এক পা-ও এগুতে পারছে না।

বাণী বলে—শরৎবাবু—সেইজন্যেই তো তাঁর বইয়ে ভবঘুরেদের নায়কের আসনে বসিয়েছেন।...অসাধারণ দরদী লেখক!

—কিন্তু ভবিষ্যতের কোন নির্দেশ দিতে পারেন নি তিনি।—অরবিন্দ মন্তব্য করে: এইখানেই হল তাঁর সাহিত্যের ট্র্যাজেডি।

শরৎ-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানসীর কথা ভুলে গিয়েছিল অরবিন্দ। মনে করিয়ে দিলে অনুপ।

ওর কাপড়ের থলি থেকে দু'খানি বই বের করে অরবিন্দর টেবিলে রাখলো। বই দু'খানি মানসী ফেরত দিয়েছে।

কোমল হাসি হেসে অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে অনুপ বললে—তোমার উপর ভীষণ রেগে আছে, তোমার কাছ থেকে আর বই নিতে নিষেধ করে দিয়েছে আমাকে।

—ভালো কথা—অরবিন্দ হালকা সুরেই বললে ঃ মেয়েদের রাগের চেয়ে অনুরাগকেই আমি বেশি ভয় করি।—

আসল ব্যাপারটা অরবিন্দ বেমালুম গোপন করে গেল ওদের কাছে। কি লাভ শুধু শুধু ওদের উত্তেজিত করে?

ছাব্বিশে জানুয়ারী। দুপুরবেলা। ছুটির দিন বলেই বাণী দু' চার পদ ভাল রান্নার আয়োজন করেছিল। অনুপ:কেও খেতে বলেছে।

রান্না অনেক আগেই সারা হয়েছে। বাণীর বাবা খেয়ে নিয়েছেন, খেয়েই বইপত্র নিয়ে বসে গেছেন। নতুন একখানি বই লিখছেন, ইতিহাসের। ডাকাত পড়লেও এখন ওঁর হুঁশ হবে না।

অনুপের জন্যেই অপেক্ষা করছিল বাণী।

অনুপ একা নয়, তার সঙ্গে অরবিন্দও এসে উপস্থিত হল। ট্রাম স্টপের কাছেই দু'জনের দেখা হয়ে গেছে।

—দেখলে তো, ঠিক এসে হাজির হয়েছি।—বাণীকে লক্ষ্য করে হেসে বললে অরবিন্দ।

বাণী খুশিই হল। বললে—ভাল দিনেই এসে পড়েছ, মেনুটা আজ তোমার পছন্দসই, চিকেন-কারী আর ফ্রাইড-রাইস্।

স্মিত হেসে অরবিন্দ বললে—ভাগ্য যেদিন সুপ্রসন্ন হয়, সেদিন এমনিই হয়। না হলে তোমার এখানে আসা দূরে থাক, আজ বাড়ী থেকেই বেরুনোর ইচ্ছে ছিল না।

—বাড়ীর উপর হঠাৎ এমন আকর্ষণের হেতু ?

—গায়ের তেল হয়তো একটু কমে এসেছে।—বলেই সশব্দে হেসে উঠলো অরবিন্দ।

ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তেই বাণী ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লো। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

খাবার টেবিলে নিজেই খাবারগুলি সাজিয়ে ফেললো। রামলাল তাড়াতাড়ি কোন কাজ করতে পারে না। তাড়া দিলে থতমত খেয়ে খাবার হয়তো মাটিতেই ফেলে দেবে।

টেবিলে অরবিন্দ আর অনুপের মুখোমুখি হয়ে বসলো বাণী।

আশ্চর্য সরল স্বভাব অরবিন্দর! খাবার দেখে দারুণ খুশি।···

বাণীর অংশ থেকে আরো খানিকটা মাংস ওর প্লেটে তুলে দিতে গেলে আপত্তি তো করলোই না—বরং খুশিই হলো। আরো দেবে ? —একমুখ হাসি নিয়ে বললে। এই সরলতাটুকুই অরবিন্দর বৈশিষ্ট্য। অরবিন্দকে খাইয়ে সত্যি সুখ আছে।

অনুপের কাছে খাওয়াটা দ্বিতীয় পর্যায়ের বস্তু। বাণী উঠে গেলেই সুস্বাদু খাবারগুলি ওর কাছে এখুনি বিস্বাদ হয়ে উঠবে। অন্য মেয়েরা হয়তো এতে খুশিই হতো, বাণী মোটেই খুশি হয় না। এতটা পর-নির্ভর হবে কেন মানুষ!

খাওয়া-দাওয়ার পরেও খানিকটা সময় কাটলো হাসি-গল্পের মধ্যে দিয়ে। অনুপের হয়তো আরো কিছুক্ষণ বসবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অরবিন্দই বসতে দিলে না। বললে—কি, উঠবে না ?···আমি তাহলে চলি, মিটিং আছে।

মিটিং সেরে শান্তিনগরে ফিরে যাবারই তো কথা ছিল অরবিন্দর। কিন্তু ফিরতে পারলো না।

রাত দশটার সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার।

খেয়ে-দেয়ে বাণীর বাবা তাঁর ঘরে লেখা-পড়া করছেন। বিছানায়

শুয়ে বাণীও বই পড়ছিল। পড়তে পড়তে হয়তো বা একটু তন্দ্রা এসেছিল, বাবার ডাক শুনে জেগে গেল। কি হল হঠাৎ ?

ব্যস্ত হয়ে বাবার ঘরে ছুটে এলো বাণী। এসে অবাক। খাটের উপর অরবিন্দ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, চোখ বুজে। খাটের পাশেই চেয়ারে বাণীর বাবা বসে আছেন উৎকণ্ঠিত মুখে।

—কি হয়েছে ? বাণী ভয়ে ভয়ে জিগ্গেস করে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বারীন বলেন—জ্বরটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে—মাথাটা একবার ধুইয়ে দেওয়া দরকার।

ধুইয়ে দিলে বইকি !

অরবিন্দর মাথা বাণীই ধুয়ে, মুছিয়ে দিলে। মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি অসীম সহানুভূতি থাকলেও বাণীর বাবা কখনো নিজের হাতে কারুর সেবাযত্ন করেন নি। করতে পারেনও না। অসুখ দেখলে কেমন নারভাস্ হয়ে পড়েন।

ম্যালিগন্যান্ট্ ম্যালেরিয়া—ডাক্তারের মুখে অসুখের নাম শুনে মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ইনজেক্শন পড়লো। সারা রাত দু'জনে বসে রইলো অরবিন্দর বিছানার পাশে। যা'হক বুদ্ধির কাজ করেছিল অরবিন্দ—অতখানি জ্বর নিয়ে শান্তিনগরে যাবার যে চেষ্টা করে নি।

অসুখটা এলোও যেমন আচমকা, গেলও তেমনি ভাবে। তিন-চার দিনের মধ্যেই বিছানার উপর উঠে বসলো অরবিন্দ। বাণীর বাবার ঘরেই ওর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাবা বইপত্র নিয়ে চলে এসেছেন পাশের ঘরে।

দু'দিনের জ্বর, কিন্তু তাতেই পালোয়ান অরবিন্দকে একেবারে কাহিল করে ফেলেছে। ডাক্তারবাবু বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নাড়া-চাড়া করতে নিষেধ করে গেছেন। কিন্তু চুপচাপ শুয়ে থাকা কি ওর ধাতে পোষায় ! অনুমতি পেলে এখনই উঠে সে ময়দানে একটা মিটিং

করে আসতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাণীর বাবা ওকে ছাড়পত্র দিচ্ছেন কোথায় ?

আপিসের পর সন্ধ্যেবেলায় অনুপ আজকাল রোজই আসে বাণীদের বাড়ীতে। আসবেই তো, বন্ধু বিছানায় পড়ে আছে।

শুধু কি তাই ?···বাণীর সঙ্গে দু'দিন দেখা না হলেই ওর মেজাজ বিগড়ে যায়। সন্ধ্যার পর একদিন এসে বাড়ীতে না পেলেই তার অভিযোগের অন্ত থাকে না।···পাওয়া যখন হাতের মুঠোয় এসে যায়, মালিকানা-বোধ তখন মানুষকে হয়তো এমনি জুলুমপ্রবণ করে তোলে।

অরবিন্দর অসুখের জন্যেই বাণীকে আপিস কামাই করতে হচ্ছে। দু'দিন আগে জয়েন করার কথা থাকলেও যাওয়া হয় নি। অরবিন্দ সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কাজে বেরুনো সম্ভব নয়।

দুপুর গড়িয়ে সবে বিকেল হয়েছে। নিজের শোবার ঘরে বসে চুল বাঁধছিল বাণী, পাশের ঘর থেকে হঠাৎ অনুপের গলা শোনা গেল। কি ব্যাপার ! এত শীগগির আপিস ছুটি হয়ে গেল ?

বিনুনীটা জড়িয়ে খোপা করে বেরিয়ে এলো বাণী। অরবিন্দর ঘরে এসে ঢুকলো নিঃশব্দে।

বালিসে হেলান দিয়ে সে তখন খাটের উপর উঠে বসেছে—অনুপের সঙ্গে কথা বলছে। চেয়ারটা ওর খাটের সামনে এগিয়ে নিয়ে বসেছে অনুপ—দরজার দিকে পিছন ফিরে। বাণীকে সে দেখতে পায় নি প্রথমে।

অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে অনুপ বললে—এখনও বিছানা ছাড় নি ?

—ছাড়তে দিলে তো।—বাণীকে লক্ষ্য করে হো-হো করে হেসে উঠল অরবিন্দ।

অরবিন্দর দৃষ্টি অনুসরণ করে অনুপ অমনি ফিরে তাকাল বাণীর দিকে। মৃদু হেসে অরবিন্দ বললে—যা হক, ক'টা দিন খুব আদর-যত্ন খেয়ে নেওয়া গেল—অসুখটা হয়েছিল বলেই না—একেই বলে, 'মেঘের গায়ে রূপোলী রেখা'।

বাণীও হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বললে—তুমিও আবার কবিতা লিখতে সুরু করেছ নাকি?

অনুপের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল সে। এত গম্ভীর হয়ে আছে কেন ও?

—এত শীগগির ছুটি হয়ে গেল?—বাণী জিজ্ঞেস করলে অনুপকে।

—ছুটি হয় নি, ছুটি নিয়েছি।—বিস্মিত দৃষ্টিতে বাণীর মুখের দিকে চেয়ে অনুপ বললে—কিন্তু তুমি যে বড় বাড়িতে বসে আছ?

কথাটা শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।—বাড়ীতে থাকবো না তো কি?—গম্ভীর মুখে উত্তর দিলে বাণীঃ অসুস্থ মানুষকে একলা ফেলে বেরিয়ে যাবো?···বুদ্ধির বলিহারি!

মুখটা হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল অনুপের। তার মুখের উপর একটা চঞ্চল দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বাণীকে লক্ষ্য করে অরবিন্দ ঠাট্টার সুরে বলে উঠলো—বুদ্ধি নিয়ে কথা বলা ভারী অন্যায়। এতবড় অপমান কোন লোকই সহ্য করে না।

অনুপ জোর করেই হাসলো যেন।

মুচকি হেসে অরবিন্দ বললে—মানুষের চরম দুর্বল জায়গা ওটা—এ্যাকিলিস্ স্পট্। বিশ্বসংসারে সবকিছু উড়িয়ে দিলেও বুদ্ধির বড়াই মানুষ না করে পারে না। চিন্তার ক্ষমতা আছে বলেই না আমার অস্তিত্ব আছে—'আই থিঙ্ক্, দেয়ারফোর অ্যাই অ্যাম্।'—ডেকার্টের মত অমন পণ্ডিত লোকও শেষ পর্যন্ত কি একটা সিলি কথা বলে বসলেন!

অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে বাণী টিপ্পনী কাটলো।—এসব কথা শুনলে দর্শনের অধ্যাপকেরা কখনই তোমাকে ক্লাসে ঢুকতে দিতেন না।—বি.এ. ক্লাসে অরবিন্দরও ফিলজফি ছিল।

বাণীর কথা শুনে হেসে উঠলো অনুপ। কিন্তু পরক্ষণেই আবার কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়লো। আগের মত মন খুলে ও যেন আজকাল আর হাসতে পারে না!

অনুপকে হাসাবার জন্যেই বাণী তার পোশাকের পারিপাট্য লক্ষ্য

করে রসিকতা করার চেষ্টা করলো—ব্যাপার কি বল তো?···দস্তুরমত জামাই সেজে বেরিয়েছ দেখছি।

অনুপ লজ্জা পেয়ে গেল—কান দুটো হঠাৎ লালচে হয়ে উঠলো তার!

অনুপের হয়ে উত্তরটা দিলে অরবিন্দ।—কেন, সন্ন্যাসীর বেশ করে ঘুরে বেড়াতে হবে নাকি?···আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, বৈরাগ্যে নয়।

—তাও তো বটে।—ঠাট্টার ভাবে বাণী বললে: চালচলনে শ্রমিক নেতারা সেই জন্যেই তো আজকাল সবাইকে টেক্কা দিতে চলেছেন।··· দামী স্যুট্ আর গ্র্যাণ্ড হোটেলের খানা ছাড়া তাঁরা চলতে পারেন না।

বাণীর কথাগুলো যেন কানেই ঢুকলো না অনুপের—বড্ড অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ওকে।

অমন জরুরী চিঠিটা পেয়েও অরবিন্দ দেখা করতে এলো না। রাগে-অভিমানে দিশেহারা হয়ে গেল মানসী।

পরের দিন, সকালে অনুপের কাছে গিয়েই সে রাগটা ঝাড়লো।···

ছুটির দিন, আপিস কলেজ নেই। অনুপ টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে খবরের কাগজ দেখছিল।

অরবিন্দর দেওয়া বই দুটো টেবিলের উপর রেখে মানসী বললে—তোমার বন্ধুকে ফেরত দিও, তার কাছ থেকে আর বই আনার প্রয়োজন নেই।

অনুপের চোখে কৌতুক খেলে গেল। হালকা হেসে বললে—বন্ধুর অপরাধটা কি শুনি?

—শুনে লাভ?···যাদের কথার কোন ঠিক নেই!

হ্যাঁ, মানসীকে অরবিন্দ কথা দিয়েছিল বইকি! বলেছিল—তোমার চিঠি পেলেই দেখ, ঠিক এসে হাজির হবো—সব কাজ ফেলে।···

কিন্তু এলো কোথায়?···

—বোস।—অনুপ হাসিমুখে ওর দিকে তাকিয়ে বললেঃ বন্ধুর হয়ে জামিন রইলাম আমি, ভবিষ্যতে যাতে কথার খেলাপ না করে—

—তোমাদের কোন কথাই আমি আর বিশ্বাস করি না।—চেয়ারে বসে মানসী বললেঃ প্রতিজ্ঞা করতেও তোমাদের সময় লাগে না, ভাঙ্গতেও—

খিলখিল হাসির শব্দে থেমে গেল মানসী। পিছন ফিরে তাকালো। বাণী!

হাসিটা সামলে নিয়ে বাণী টিপ্পনী কাটলো—আমার মতে প্রতিজ্ঞা. পণ এসবের মধ্যে বেশি না ঢোকাই ভালো। প্রতিজ্ঞা রাখতে গেলে একপক্ষ, আর ভাঙ্গতে গেলে অন্যপক্ষ কষ্ট পায়।···মোটের উপর ওতে কোন একপক্ষ কষ্ট পাবেই।—

বলেই আবার হেসে উঠলো, সঙ্গে অনুপও।

মানসী যোগ দিলে না ওদের হাসিতে—চুপ করেই রইলো। সর্বক্ষণ হাসি-ঠাট্টা ভাল লাগে না ওর।···

মানসী মন স্থির করে ফেললো। অরবিন্দর সঙ্গে তার কোন রকম সম্পর্ক রাখবে না সে।

কিন্তু শনিবার বিকেলে মনটা হঠাৎ অমন চঞ্চল হয়ে উঠলো কেন? শনিবার বিকেলেই সাধারণতঃ অরবিন্দ কলকাতায় বেড়াতে আসে।

সন্ধ্যে উতরে গেল, তবু অরবিন্দ এলো না। অনুপকেই শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে ফেললো।—তোমার বন্ধুর খবর কি?

নিরুৎসুক কণ্ঠে অনুপ উত্তর দিলে—ভালই আছে, কাজের চাপে আসতে সময় পায় না।

কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যেও কি ওর একবার আসবার সময় হল না? এতদিন কলকাতায় না এসে ও থাকতে পারে? কলকাতায় এসে মানসীর সঙ্গে সে দেখা করবে না, এ-ও কি সম্ভব?

সম্ভব। পৃথিবীতে সবই সম্ভব।

বাণীর মুখে খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেল মানসী।···বেশ কিছু-

দিন বাদেই বাণী বেড়াতে এলো। মানসীরও অনেকদিন যাওয়া হয়ে ওঠে নি ওদের বাড়ীতে। টেস্ট্ পরীক্ষা নিয়েই ব্যস্ত ছিল সে।

অরবিন্দর কথা জিজ্ঞেস করলে বাণী বললে—হ্যাঁ, এখন তো ভালই আছে, যা ভয় দেখিয়েছিল—

অরবিন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল! বাণীদের ওখানেই ছিলো। অনুপ রোজই গেছে ওদের বাড়ীতে, অথচ মানসীকে জানায় নি। আশ্চর্য ব্যাপার!

অনুপ বাড়ী ফিরলেই মানসী গিয়ে অভিযোগ করলো—আচ্ছা লোক তো, বন্ধুর এমন অসুখ করেছিল, খবরটা পর্যন্ত জানাও নি—

অনুপ যেন মনে করতে পারে না ঘটনাটা—অসুখ—ও, অরবিন্দর কথা বলছো?

মানসীর রাগ ধরে গেল।

ওর মুখ দেখেই ভাবটা বুঝে নিল অনুপ। আপসের সুরে বললে —আমার কি দোষ বল? অরবিন্দই তো নিষেধ করেছিল তোমাকে জানাতে।—

নিষেধ করেছিল মানসীকে জানাতে?······আশ্চর্য লোক!

শনিবারের সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা উত্তরে গেলেও দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল মানসী। অসুখ ভাল হয়ে যাবার পর অরবিন্দ শান্তিনগরে চলে গেছে। চলে গেলেও কি বেড়াতে আসতে পারে না? কিন্তু আসার সময় তো পেরিয়ে গেল!

হঠাৎ একটা আশঙ্কা মনের মধ্যে উঁকি দিলে মানসীর। ওখানে গিয়ে আবার অসুখে পড়েনি তো?···না, ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। শান্তিনগরে গিয়ে নিজের চোখে সে দেখে আসবে।

ঠিক আছে—কাল সকালেই যাওয়া যাবে—অনুপের সঙ্গে। ওর অফিস তো কাল ছুটিই আছে। ছুটি থাকলে সে দিদির কাছে না

গিয়ে থাকে না বড় একটা। কিন্তু কথাটা আজকেই অনুপকে বলে রাখা দরকার।

মানসী একতলায় নেমে অনুপের ঘরে এসে ঢুকলো।

অনুপ ঘরে ছিলো না। না থাকলেও এখুনি হয়তো এসে যাবে। টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে পড়লো মানসী।

টেবিলের উপর কয়েকখানা বই। মাণিকবাবুর নাম দেখেই বইখানা টেনে নিলে মানসী। বইটা অনুপের নয়, অরবিন্দর। খুলতেই একটা চিঠি বেরিয়ে পড়লো। খোলা চিঠি, এক সপ্তাহ আগের। বাণীর লেখা, লিখেছে অরবিন্দকেই ঃ

কমরেড অরবিন্দ,

রবিবার সকালে নিশ্চয়ই আসবে। দুপুরে এখানেই খাবে। বেশি বেলা কোর না। জানই তো অনেক বেলা অবধি না খেয়ে বসে থাকতে আমার বেশ কষ্ট হয়।...সেদিন আর কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রেখো না কিন্তু।...তোমার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া একটা বিশ্রি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।—বাণী।

পুনশ্চ ঃ আসার সময় গৌরীদেবীর কাছ থেকে কিছু তিলের নাড়ু আদায় করে এনো—ভারি ভালো লেগেছিল সেদিন।—

পড়া উচিত নয় তবু চিঠিখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো মানসী।

চিঠিটা কখন আবার বইয়ের ভেতর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, সিঁড়ি ভেঙ্গে কি ভাবে সে উপরে উঠলো মানসীর খেয়ালই হল না—স্বপ্নাবিষ্টের মতই নিজের ঘরে এসে ঢুকলো।

আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজের মধ্যে আবার ফিরে এলো সে।...অরবিন্দ বাণীদের ওখানেই তাহলে আড্ডা দেয়। মানসীকে সে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলেছে!...চেয়ারে বসে দু'হাতে চেয়ারের হাতল চেপে ধরলো মানসী।

কাজের বহর বারীনেরও বোধহয় বেড়ে গেছে আজকাল। সুলেখা দেবীর স্বামী বম্বে যাবার পর থেকে তিনি তো ভূপেশের বাড়ীতে আসা একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। সন্ধ্যেটা ওদের ওখানেই কাটান। …ভদ্রলোকই বা কেমন? স্ত্রী-পুত্রকে কলকাতায় একলা ফেলেই চলে গেলেন! গেছেন অবশ্য অফিসের কাজেই।

ভূপেশ ডেকে না পাঠালে বারীন এখন আর ওদের বাড়ীতে আসে না। ডাকতে গিয়েও কোন কোন দিন ফিরে আসতে হয় ভজুয়াকে। এসে বলে—বাবু বাড়ীতে নেই—

ইতিহাসের নতুন বই লিখছে বারীন। লেখার ব্যাপারে সুলেখা নাকি ওকে অনেক সাহায্য করছে। ভূপেশের কাছে বারীন সেদিন নিজের মুখেই বলে গেছে কথাটা।

কিন্তু লেখায় সাহায্য করছে বলে রোজ সন্ধ্যেবেলায় ওদের বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকতে হবে! পাড়ার লোকজন এর মধ্যেই ওদের দু'জনকে নিয়ে নানারকম কানাঘুষা আরম্ভ করেছে।…লোকের আর দোষ কি! রোজ ওদের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা দিলে লোকে নানা রকম কথা বলবেই—বিশেষ করে, মহিলার স্বামী যখন অনুপস্থিত।…

ললিতার মাসতুতো বোন কমলা ঐ পাড়াতেই থাকে। সে এসে কতগুলো কথা বলে গেল। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল ললিতার। শত হলেও ভূপেশের অনেক কালের বন্ধু বারীন। এমন বুদ্ধিমান লোক হয়ে এই সাধারণ কথাটা বোঝেন না?…

পড়াশুনা সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে বারীনের। আর ভদ্রমহিলা পড়াশুনা করেছেন বইকি! নিজের সাব্‌জেক্ট ছাড়াও নাকি অনেক পড়াশুনা করেছেন।…কন্টিনেণ্টাল সাহিত্য সবই নাকি পড়ে ফেলেছেন! কিন্তু বাংলা-সাহিত্য?…বাংলা-সাহিত্যের হয়তো কোন খবরই রাখেন না।…

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে বারীন তো সাহিত্য বলেই স্বীকার করে না।…

ললিতাকে সেদিন নতুন একখানি বাংলা উপন্যাস পড়তে দেখে মুখের উপরই বলে বসলো— এসব বই পড়ে সময় নষ্ট করেন কেন বুঝি না।…আধুনিক বাংলা-সাহিত্য আধুনিক গানের মতই সিকেনিং লাগে আমার কাছে।

—খারাপ লাগার কারণটা বলবেন তো ?—ললিতা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল।

ললিতার দিকে একটা অন্যমনস্ক দৃষ্টি রেখে বারীন উত্তর দিয়েছিল—সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে অধিকাংশই লেখাপড়া জানেন না।…যাঁরা পড়েন, তাঁরা লেখেন না। আর যাঁরা লেখেন, তাঁরা পড়েন না। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের এই হল ট্র্যাজেডি।…

আশ্চর্য অহঙ্কার ভদ্রলোকের, না পড়েই দিব্যি রায় দিয়ে বসলেন। বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু, আর শরৎবাবু ছাড়া বাংলাদেশের কোন সাহিত্যিকের নাম উনি শুনেছেন কিনা সন্দেহ।

মৃত্থ হেসে ললিতা তাই প্রশ্ন করেছিল—বাংলা ভাষায় হালে যে সব মনস্তত্ত্বমূলক বই বের হয়েছে, সেগুলি দেখেছেন ?

—এক আধখানা দেখেছি বইকি ?…পড়া যায় না, পড়তে গেলে গা ঘিনঘিন করে।—একটু থেমে বারীন বলেছে ঃ মনস্তত্ত্বের নামে কোন কোন সাহিত্যিক শুধু যৌন সাহিত্যই সৃষ্টি করে চলেছেন।

—কিন্তু বাস্তবতাকে তো অস্বীকার করতে পারেন না !—ললিতা উত্তর দিয়েছিল।

এখানেই তো মস্ত ভুল করছেন—ওকে বাস্তবতা বলে না।—সাহিত্য নিয়ে সেদিন বারীন একচোট বক্তৃতা ঝেড়েছিল ললিতার উপর।…

দিন পনেরর মধ্যে বারীনের দেখা পাওয়া যায় নি। রবিবার সকালের দিকে কি মনে করে হঠাৎ বেড়াতে এলো। ড্রয়িং রুমে ওকে ঢুকতে দেখেই ললিতা চায়ের কথা বলতে গেল রান্না ঘরে। সকালবেলা বেড়াতে এসেছে, শুধু চা তো দেওয়া চলবে না। আর

কিছু না হক, টোস্ট আর অম্‌লেট তো চাই-ই। চা-খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো ললিতা। আশ্চর্য ব্যাপার, বারীন এর মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে যাবার জন্যে !

—একি, চলে যাচ্ছেন ?—ললিতা বলে উঠল।

—না, এখুনি যাই কি করে ?—বারীন হালকা হেসে আবার বসে পড়ল ঃ এমন চা-খাবার ফেলে যাওয়া যায় ?

খাওয়া হয়ে গেলেই উঠে পড়লো, ললিতাকে লক্ষ্য করে বললে —আর একদিন এসে বসা যাবে।—বলেই ভূপেশের দিকে ফিরে তাকালো।—বইগুলো দাও।

ভূপেশের সঙ্গে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলো বারীন। বই নিতেই তাহলে এসেছে সে !

'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটেনিকা'র দু'টি ভলিউম বগলদাবা করে খানিকবাদেই বেরিয়ে এলো বারীন, সঙ্গে ভূপেশও।

ভূপেশের দিকে চেয়ে বললে—বইগুলো পেয়ে ভারী উপকার হল, না হলে এর জন্যে সুলেখাকে আবার লাইব্রেরিতে ছুটতে হত।

ভূপেশ খুশিই হল কথাটা শুনে। কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বললে —তবু যা হক, বইগুলো কাজে লাগলো।

ভূপেশ খুশি হলেও এই ধরনের আধিক্যেতা সহ্য করতে পারে না ললিতা। ব্যবসা জীবনের প্রারম্ভে সংসার খরচ ছেঁটেকেটে ভূপেশ বইগুলি কিনে ফেলেছিল একসময়, কিনেছিল অবিশ্যি বারীনের উৎসাহেই। ললিতা যত্ন করে রেখেছে বলেই না এতকাল টিকে আছে ! পাঁচ হাত হলে কি আর আস্ত থাকবে ? তা-ও যদি বারীনের নিজের প্রয়োজনে লাগতো। বই সে নিয়ে গেল নিজের জন্যে নয়, সুলেখার জন্যে। দরদ থাকে নিজের পয়সার বই কিনে যত খুশি উপহার দেও না, ললিতার আপত্তি নেই—ভূপেশের বই নিয়ে টানা-টানি কেন ?

কি আশ্চর্য! কথাটা শুনে বারীন এতটুকু লজ্জিত হল না। বরং ললিতার উপরই চটে গেল। অন্যদিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললে —এমন সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে কেউ সীন্ করতে পারে, আমার ধারনা ছিল না।

ললিতা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল বারীনের মুখের দিকে—রাগ ও বিরক্তি ছাড়া সেখানে আর কিছু দেখতে পেল না সে।

বারীনকে কত আপনই না মনে করেছিল ওরা! বুকের ভেতর একটা দুর্জয় অভিমান গুমরে উঠলো ললিতার।

বারীন বুঝতেও পারলো না। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরমুখে বললে—বই কালই পাঠিয়ে দেব। চলি।

হঠাৎ ভীষণ কান্না পেয়ে গেল ললিতার। দাঁতে ঠোঁট চেপে কান্না সামলাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পেরে উঠলো না।

ললিতাকে কাঁদতে দেখেও এতটুকু নরম হল না বারীন! বিরক্তির সুরেই বলে উঠলো—আপনাদের এখানে আসাই বন্ধ করে দিতে হবে দেখছি।

আসা বন্ধ করে দেবে! অভিমানে স্তব্ধ হয়ে গেল ললিতা। চোখের জল মুছে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সে, বারীন আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার আগে একটা কথা পর্যন্ত বলে গেল না!

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দুর্বলতা কেটে গেল ললিতার। যাক, চলে যাক, অমন লোকের চলে যাওয়াই তো ভাল। এ বাড়ীতে আসার আর দরকার নেই ওর। না এলে কিছু এসে যাবে না ললিতার। স্বামী, পুত্র, কন্যা, বাড়ী-গাড়ী, দাস-দাসী কি নেই ওর?

কথাগুলো চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করে বারীনকে।

অনুপকে বাণী ভালবাসে—ব্যাপারটা সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দিনের আলোর মত! অরবিন্দ পর্যন্ত এই নিয়ে কত ঠাট্টা করেছে বাণীকে।

সন্ধ্যেবেলায় বাণীদের বাড়ীতে বসেই সেদিন তিনজনে গল্প করছিল। পিয়ন একখানি বিয়ের চিঠি দিয়ে গেল। বাণীর এক বন্ধুর বিয়ে—মেয়ে বন্ধু। ভালবেসে বিয়ে করছে। বিয়েতে বাপ মায়ের নাকি মত নেই। অমতের কারণ যুবকটি বেকার, সাহিত্য-চর্চা করেই সময় কাটায়।

খবরটা শুনেই বাণীর দিকে চেয়ে অরবিন্দ মুচকি হাসল। বললে, "সাবধান, ভালবাসায় পড়ার ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ ছোঁয়াচে।" আড় চোখে অনুপের দিকে চেয়ে বললে, "বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে মেয়েদের একেবারেই ইম্যুনিটী নেই।"

—ছোঁয়াচে হলেও ডিপ্রেসিং নয় নিশ্চয়ই।—বাণী হেসে উত্তর দিয়েছিল।

হাসির ছলে বললেও কথাটা সত্যি। ভালবাসাই মানুষের জীবনে অমৃতের স্বাদ এনে দেয়।

বাণী অনুপকে ভালবাসে। ইচ্ছে হলে অনায়াসেই সে বিয়ে করতে পারে ওকে। অসবর্ণ বিয়েতে তো ওর বাবার কোনো আপত্তিই নেই। অনুপের মা বেঁচে থাকলে অবশ্য একটু অসুবিধা ছিল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনুপ একদিন ওর কাছে কথাটা তুলেছিল বইকি।

জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যায় ওদের ছাদে দুজনে পায়চারি করছিল সেদিন। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিল। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছিল চারদিকে। বাণীর শাড়ীর অবাধ্য আঁচলটা এসে স্পর্শ করেছিল অনুপকে।···কেমন একটা প্রশ্রয়ের ভাব ছিল ওর ব্যবহারে। চলতে চলতে অনুপ ওর কাঁধে হাত রাখলেও কোন আপত্তি জানায় নি।

খুশি হয়ে অনুপ বলেছিল—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, রাগ করবে না তো?

—বল।—বাণী আস্তে ওর হাতটা টেনে নিয়েছিল কাঁধ থেকে।

সামান্য ইতস্ততঃ করে অনুপ বলেছিল—আমার মত জামাই পেলে তোমার বাবা খুশি হবেন কি ?

—সে কথা বাবাই জানেন।—মৃদু হেসে বাণী উত্তর দিয়েছিল। একটু থেমে ঠাট্টার ভাবে বলেছিল—কিন্তু বাবার ভাগ্যে এমন কার্তিকের মতন জামাই জুটবে কি ?

কথাটা আর এগুতে পারলো না। রামলাল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বাণীকে পাকড়াও করে নীচে নিয়ে গেল। বাণীর মাসিমা বেড়াতে এসেছিলেন।

বাধ্য হয়ে অনুপকে চলে আসতে হল।

তারপর কথাটা আর তোলার সুযোগ পায়নি অনুপ। বাণীও তোলেনি। ইচ্ছে করেই তোলেনি হয়তো। হাসি-খুশি ঐ মেয়েটির চারদিকে যেন একটা নীরব অথচ নির্মম নিষেধের বেড়া।

কিন্তু বাণীর ভালবাসা সম্বন্ধে কি কখনো সন্দেহ জেগেছে অনুপের মনে ? জাগেনি।

অরবিন্দ অসুস্থ হয়ে ওদের বাড়ীতে আসার আগে সন্দেহ জাগেনি কখনো।....কি সেবাটাই না করেছে অরবিন্দর। অসুস্থ মানুষকে সেবা করবে, এতে বলার কিছুই নেই।...কিন্তু দু'জনে একত্র হয়ে ওকে নিয়ে অমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা —।

ওকে নিয়ে দু'জনে একসঙ্গে যখন হেসে উঠেছে, অনুপের সমস্ত অন্তর কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে—ইচ্ছে হয়েছে, তখুনি ছুটে চলে আসতে। কিন্তু আসতে পারেনি।

সুস্থ হয়েই অরবিন্দ অবশ্য আবার শান্তিনগরে চলে গেছে। তবে কলকাতায় আসে বই কি ! আসে, কিন্তু ভুলেও সে এখন আর অনুপদের বাড়ীতে ঢোকে না। আসতে বললেও কাজের ছুঁতো করে এড়িয়ে যায়।

বাণীর ওখানে যাবার সময় কিন্তু কাজ থাকে না। বাণীও ওকে ছুটি-ছাঁটায় নেমন্তন্ন করতে ভোলে না। নেমন্তন্ন অবশ্য অনুপকেও করে সে। অনুপের মারফত চিঠি দিয়ে পর্যন্ত অরবিন্দকে নেমন্তন্ন করে

পাঠিয়েছে। তা করুক, অনুপের তাতেও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওর সম্বন্ধে বাণী এমন উদাসীন কেন? দেখা করার জন্যে যেন কোন আগ্রহই নেই আজকাল।……

সুলেখা দেবীর ছেলের অসুখ শুনেই তাদের বাড়ীতে চলে গেল। অসুখ ভাল না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। কিন্তু যাবার আগে অনুপকে একবার খবর দিয়ে গেলে এমন কি দোষ হত! আপিস থেকে ফিরেই সেদিন সাত তাড়াতাড়ি তাহলে আর ওদের বাড়ীর দিকে ছুটতো না সে। নিজের উপরই এখন রাগ হয় অনুপের। যে চায় না, তার জন্যে কেন এত ভেবে মরে সে? রাগ করেই অনুপ আর খবর নেয়নি বাণীর।

বাণীও কি নিয়েছে? নেয়নি। অনুপের জন্মতিথিতে পর্যন্ত সে আসতে ভুলে গেল! তারিখটা আর কারো মনে না থাকলেও বাণীর তো উচিত ছিল মনে রাখা! গেল বছর ঐদিনটিতে—অনুপের মা তখন বেঁচে ছিলেন—বাণী ওকে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' প্রেজেণ্ট করেছিল, সঙ্গে দু'টি লাল গোলাপ।

সঙ্কোচ ত্যাগ করেই অনুপ সন্ধ্যার দিকে সুলেখা দেবীর বাড়ীতে বেড়াতে গেল।

গিয়ে দেখা পেল না বাণীর।

দেখা না পেলেও খবর পেল। অরবিন্দর সঙ্গে নাকি বেড়াতে বেরিয়েছে সে।

ধাঁ করে রক্ত মাথায় চড়ে গেল। অরবিন্দ এখানেও আসে? রোজই ঐরকম বেড়াতে যায় নিশ্চয়। অনুপের সঙ্গে বাণী তাহ'লে আর সম্পর্ক রাখতে চায় না!

কিন্তু স্পষ্ট করে জানতে হবে ওর মনের কথা। পরের দিন সন্ধ্যার দিকে সে তাই গিয়ে উপস্থিত হল বাণীদের ওখানে—ওর বাড়ী ফেরার কথা আগের দিনই শুনে এসেছিল। অভিমানটা প্রকাশ না করাই ছিল ভালো। কেন, কেন সে প্রকাশ করতে গেল নিজের দুর্বলতা!

কিছুই যেন হয়নি, এই রকম ভাব করে চলে আসাই তো ঠিক ছিল। ডিগনিটির দিক থেকে তাই হয়তো উচিত ছিল। তবে একপক্ষে ভালোই হল, ইল্যুসন্‌টা কেটে গেছে—মিথ্যে আশা নিয়ে আর বসে থাকবে না অনুপ।

অনুপের মুখের উপর বাণী তো স্পষ্ট বলে দিয়েছে—অরবিন্দকেই সে ভালবাসে।

কানের পর্দায় বাজতে থাকে বাণীর কথাগুলো—বুঝতেই যখন পেরেছ, তখন আর জিজ্ঞেস করছো কেন ?—

দাবির মাত্রা কমিয়ে ফেলতে উপদেশ দিয়েছে বাণী। দাবির কোন প্রশ্নই তো ওঠে না এখন ! ভালবাসা যেখানে নেই, সেখানে আবার দাবি কিসের ?……

বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে নিশীথ রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে অনুপ। নিজের অজান্তেই চোখ দুটো জলে ভরে আসে —চোখের জলে বালিস ভিজে যায়।....অনেকদিন পরে মায়ের কথা মনে পড়ে—মায়ের মৃত্যুশোক আবার যেন নতুন করে অনুভব করে সে।

সারারাত চোখে ঘুম এলো না অনুপের।

শেষরাতে বিছানা ছেড়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল সে। আকাশে শুকতারা কিন্তু অন্য দিনের মতই জ্বলজ্বল করছিল। ওর দিকে তাকিয়ে যেন হাসলো একটু। ঠাট্টার হাসি—অনেকটা বাণীর হাসির মতই।

•

ফাল্গুনের শেষাশেষি। ভাবগতিক কিন্তু শীতকালের মতই। তবে শীতবোধ বাণীর বাবার খুবই কম। সকালে ঘুম থেকে উঠে ফতুয়া গায়েই খাতাপত্র নিয়ে বসে গেছেন। লিখতে বসলে ওঁর শীত-গ্রীষ্ম জ্ঞান থাকে না। একগাদা বইপত্রের মধ্যে ডুবেছিলেন, এমন সময় গাড়ী থেকে ভূপেশ এসে নামলেন। বারীনের ঘরে ঢুকে বসে পড়লেন তক্তাপোশের উপর। চিন্তিত মুখ।

খবরটা শুনে হাঁ হয়ে গেল বাণী। অনুপ নাকি বাড়ী থেকে উধাও হয়েছে। কলকাতা থেকে চলে গেছে! যাবার আগে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে তা জানায়নি।

খবরটা শুনে বাণীর বাবাও অবাক হয়ে গেলেন. চুপ করেই ছিলেন।

নীরবতা ভেঙ্গে ভূপেশ বলে উঠলেন—কালেরই দোষ।

—কালের নয়, বয়সের।—বারীনের মুখে তাঁর চির-অভ্যস্ত দার্শনিকের হাসি। এই বয়সে খেয়ালটাই সব থেকে বড় কিনা।

খেয়াল ছাড়া কি! তবু মনটা খারাপ হয়ে যায় বাণীর। বারীনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে সে চুপচাপ বসে থাকে।···

কি এমন অন্যায় কথাটা বলেছিল বাণী যে রাগ করে চলে যেতে হবে!

দিন সাতেক আগের ঘটনা। তারপর অনুপের সঙ্গে আর দেখা হয়নি—ইচ্ছে করেই বাণী দেখা করেনি। ভেবেছিল, রাগ পড়ে গেলে অনুপ নিজেই আবার এসে দেখা করবে।···

আগের দিন রাত্রে সুলেখা মাসীর ওখান থেকে চলে এসেছে সে। মাসীমাই জোর করে পাঠিয়ে দিলেন, রামলাল দেশে গেছে, বাণীর বাবার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছিল।

সন্ধ্যেবেলা। বাণী একলাই ছিলো তার ঘরে। বই পড়ছিল, এমন সময়ে অনুপ এলো—উদভ্রান্তের মত চেহারা।

অনুপের দিকে তাকিয়ে বাণী আশ্চর্য হয়ে বলে উঠেছিল—একি চেহারা করেছো?

অনুপ যেন শুনতেই পেল না কথাটা।

নির্বাক হয়ে রইলো। রাগ করেছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

ওর রাগ ভাঙ্গাবার জন্যেই বাণী হেসে বলেছিল—ও, রাগ করেছো বুঝি?

একটু যেন নরম হল অনুপ। অভিমানভরা চোখ দুটো বাণীর মুখের দিকে তুলে বললে—দু'সপ্তাহ পরে তোমার দেখা পেলাম।

—'সপ্তাহ' কেন? শতাব্দি বল। —বাণী হাসতে হাসতে বলেছিল ঃ তুমি এখনও খাঁটি কবি হতে পারনি—কবিদের কাছে মুহূর্তের অদর্শন শতবর্ষের বিরহ, তা-ও জান না?

অনুপের মুখে তবু হাসি ফুটলো না।

ওকে খুশি করার জন্যই বাণী বললে—সত্যি বড্ড আট্‌কা ছিলাম এ' কদিন, একটুও সময় পাইনি।—

—জানি। —মুখ হঠাৎ কেমন থমথমে হয়ে উঠলো অনুপের। রাগের ভঙ্গিতেই মন্তব্য করলে—সময় না পাওয়াই স্বাভাবিক,—এত যার বন্ধুবান্ধব—

কি বলতে চায় ও?···বাণীর মেজাজটাও খারাপ হয়ে গেল। বিরক্ত হয়েই সে বললে—তুমি কি বলতে চাইছো, বুঝতে পারলাম না।···আর একটু স্পষ্ট করে বল।

অনুপ মোটেই ঘাবড়ালো না ওর মেজাজ দেখে। উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলো একটু, বেপরোয়া হাসি।

বাণীর রাগ তাতে আরো চড়ে গেল। অনুপ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই অভিযোগের সুরে বললে—দুজনে কাল সন্ধ্যেবেলায় কোন রাজকার্যে বেরিয়েছিলে শুনি?···গিয়েও দেখা পেলাম না!

আগের দিনের একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে যায় বাণীর।···

সন্ধ্যেবেলায় টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কেনার জন্যে বাড়ী থেকে বের হচ্ছিল, এমন সময়ে অরবিন্দ হাজির হ'ল। বাড়ীতে ওকে না পেয়ে সোজা চলে এসেছে। এসেছিল কাজের তাগিদেই। প্যাম্‌ফ্লেট্‌ লিখে দিতে হবে।

কথা বলতে বলতে দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ী থেকে। দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাজের কথা শেষ করে অরবিন্দ চলে গেছল।···বাণীর থাকলেও অরবিন্দের সময় ছিলো না গল্প করার!

সওদা নিয়ে খানিক বাদেই ফিরে এসেছিল বাণী। কিন্তু অনুপ তার আগেই চলে গেছে। আর একটু অপেক্ষা করতে দোষ ছিল কি!···

বাণীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল অনুপ।—কি মনে করতে পারছো না? অনুপ সেই বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো আবার। সারা চোখে ভর্ৎসনার রুক্ষদৃষ্টি।—আমাকে বোকা পেয়ে ঠকাতে চাইছো?—সেই দৃষ্টিটা বলেছিল—কিন্তু পারবে না, আমি সবই ধরে ফেলেছি।

ছেলেমানুষি ভাবটা একেবারেই অন্তর্হিত হয়েছে—হঠাৎ কেমন প্রবীণ মনে হল অনুপকে। কাঙাল, বেপরোয়া, প্রবীণ অনুপের দিকে তাকিয়ে মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল বাণীর। রাগের মাথায় সে উত্তর দিলে—তোমার কাছে আমি কোন কৈফিয়ত দিতে রাজী নই। তুমি কেন, আমার বাবার কাছেও নয়।

মুহূর্তে অনুপের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, বললে—আমি বুঝতে পেরেছি। অরবিন্দকেই তুমি ভালবাস।

বাণীর জিদ চেপে গেল। বললে—বুঝতে যখন পেরেছ, তখন আর জিজ্ঞেস করছো কেন?

চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো অনুপের—আচমকা কোন প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছে যেন।

অপ্রকৃতিস্থের মত দেয়ালের গায়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলো সে। হঠাৎ ঠোঁট কেঁপে উঠলো। কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বলতে পারলো না। ছলছল চোখ দুটো বাণীর মুখের দিকে তুলেই আবার নামিয়ে নিলে—কান্না রোধ করার চেষ্টা করছিল।

মন নরম হয়ে এলো বাণীর। তবু চুপ করেই ছিলো সে। কথা বললো অনুপ নিজেই—আমাকে তুমি ভালবাস না, স্পষ্ট করে বলে দিলেই তো পারতে।

বাণী উত্তর খুঁজে পেল না হঠাৎ। খানিক চুপ করে থেকে বললে—সব কথা কি স্পষ্ট করে বলা যায়?···জীবন তো অঙ্কশাস্ত্র নয়।

অনুপের রাগ এতেও পড়লো না। মুখ কালো করে বসে রইলো।

বাণী ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল শেষ পর্যন্ত। ভর্ৎসনার সুরেই বলেছিল কথাগুলো—জীবনে যদি সুখী হতে চাও, দাবির মাত্রাটা একটু কমিয়ে ফেল—

অনুপ ওর কথার জবাব দেয়নি, দেবার সুযোগও পায় নি। হন্তদন্ত হয়ে ঠিক সেই সময়েই অরবিন্দ এসে ঘরে ঢুকেছিল।

সে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় উঠে চলে গেল অনুপ। যাবার আগে একটা কথা পর্যন্ত বলে গেল না অরবিন্দের সঙ্গে!...

রাগ হলে সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলবে!...অদ্ভুত দাবি, ওকে পছন্দ করে বলে আর কাউকে পছন্দ করা চলবে না। মনের উপর এই ধরনের জুলুম সহ্য করা সম্ভব কি?

মাথাটা আজ বিকেল থেকেই আগুন হয়ে আছে অরবিন্দর। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরও রক্তটা নামলো না মাথা থেকে।

অনেক চেষ্টা করেও যখন ঘুমোতে পারলো না, অরবিন্দ তখন ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এসে বসলো। খোলা হাওয়া লাগালে যদি—

রাত দুপুরে ওকে এইভাবে অন্ধকারে বসে থাকতে দেখলে লোকে পাগল বলবে। পাগল ওকে এমনিতেও বলে অনেকে। পাগল না হলে কলকাতা শহর ছেড়ে মরতে এই পাড়াগাঁয়ে এসে পড়ে থাকবে কেন?

কিন্তু এসে তো কিছু খারাপ ছিল না।...

মাসের প্রথমে সামান্য কটি টাকা গৌরীদেবীর হাতে তুলে দিয়েই খালাস। টাকা নিতে অবিশ্যি তিনি অনেক আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন—দিদিকে আবার কেউ টাকা দেয় নাকি খাওয়ার জন্যে?—

মাকে অরবিন্দ হারিয়েছে অল্প বয়সেই। গৌরী দেবী মায়ের চেয়ে কম যত্ন করেন না ওকে। নিজে না পারলে রমাকে পাঠিয়ে দেন।

গৌরী দেবীর বিধবা ননদ রমা। একুশ-বাইশ বছরের শ্যামাঙ্গী-স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। সুশ্রীও বটে। বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই নাকি ওর

স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, বিধবা হয়ে দাদার সংসারে এসেই আশ্রয় নিয়েছে আবার।···সম্পূর্ণ নিরাভরণা, পরনে সাদা থান, সাদা ব্লাউজ। যৌবনের প্রত্যুষেই ও যেন সন্ন্যাস নিয়েছে।

অরবিন্দর মাটির ঘরখানাকে রমা লেপে পুঁছে তকতকে করে তুলেছে। জামা-কাপড়, বইপত্র এতটুকু অগোছাল করার উপায় নেই। এত গোছগাছ অরবিন্দর ধাতে পোষায় না। ঘরে ঢুকে দু'মিনিটের মধ্যে সে সব তছনছ করে ফেলে।

সকালে চা দিতে এসে রমা একচোট বকুনি দেয়।—বাবা, এ ঘরে মানুষ থাকে!

অরবিন্দ হেসে বলে—এটা বাস্তুহারা সমিতির আপিস, ভুলে যাচ্ছো কেন?

ভুলে সত্যিই যায় নি রমা। ভুলবার উপায় আছে? পোষ্টার, প্যাম্‌ফ্লেটের বহর দেখলেই তো—।···শান্তিনগরের ঘরে ঘরে অশান্তির মেঘ ঘনিয়ে এসেছে—ঝড়ের পূর্বলক্ষণ আকাশে।

বাস্তুহারাদের আবার ভিটে থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র চলেছে। কিন্তু পোড়-খাওয়া মানুষ ওরা। হাতের পেশী ওদের লোহার মতই শক্ত—নতুন করে আবার বাস্তুত্যাগী হতে রাজী নয় কিছুতেই লড়াই করে মরতে হলে মরবে, তবু দখলী জমি ছেড়ে দেবে না ওরা। লড়াইয়ের সঙ্কল্প নিয়ে গোটা গ্রাম দেখতে দেখতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সঙ্ঘবদ্ধ না হলে গরীবলোক বাঁচবে কি করে?

এসব কাজে রমার উৎসাহও কম নয়। পোস্টার লেখার ভার অরবিন্দ তার উপরই তো ছেড়ে দিয়েছে।···কিন্তু ওদের দুজনকে জড়িয়ে গ্রামে হঠাৎ এমন বিশ্রি আলোচনা উঠলো কেন? ওসব বাজে আলোচনায় অরবিন্দ অবিশ্যি কান দেয় না। গায়ের চামড়া একটু পুরু না হলে কি রাজনীতি করা চলে?

কিন্তু গ্রামের মানুষের কি খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই পরের আলোচনা ছাড়া? কাজ যাদের আছে তারা কখনো ওসব ব্যাপার

নিয়ে মাথা ঘামায় না। এত সময় কোথায় তাদের! অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয় সেই গরীব মানুষগুলোকে। কিন্তু তারা ছাড়াও তো লোক আছে গাঁয়ে। উচ্চ মধ্যবিত্ত কয়েক ঘরও এখন এসে বসেছেন এখানে। আধুনিক বাংলো প্যাটার্নের কোঠা বাড়ী, গাড়ীও আছে তাঁদের। অরবিন্দকে তারা ভয় করেন।…ভয় করেন বলেই না এই চক্রান্ত—একটা নিরপরাধ মেয়ের নামে কুৎসা রটানো।… সুনাম, দুর্নামের পেছনে অনেক সময়েই কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে না— "রেপুটেশন্ ইজ এ্যান্ আইড্‌ল্ এ্যান্ড্ মোস্ট্ ফল্‌স্ ইম্‌পোজিশন্: অফট্ গট্ উইদাউট্ মেরিট্, এ্যান্ড্ লস্ট্ উইদাউট্ ডিজারভিং।"

রমা আর অরবিন্দকে নিয়ে কানাঘুষা চললেও মুখের উপর— উমেশবাবুর মত কথাটা এমন স্পষ্ট করে আর কেউ বলতে সাহস পায়নি

কাজ সেরে বিকেলবেলায় ঘরে ফিরছিল অরবিন্দ, পথে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

অরবিন্দর সামনে এগিয়ে এসে মুচকি হেসে বললেন—কেমন চলছে ভায়া?

—চলে যাচ্ছে।—বলেই কেটে পড়ার চেষ্টা করেছিল অরবিন্দ, কিন্তু পারা গেল না।

ভদ্রলোক রসিকতার ছলে বলে উঠলেন—কি ব্যাপার, তুমি নাকি বিধবা বিয়ে করছো?

শুনেই মেজাজ গরম হয়ে উঠলো অরবিন্দর। চট করে উত্তর দিলে —করলে দেখতেই পাবেন, বউ তো আর সিন্দুকে লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়।

—তা যা বলেছ।

চটে গেলেও ভদ্রলোক রাগটা প্রকাশ করলেন না। সরে পড়লেন তাড়াতাড়ি।

রমার কথা ভাবলে সত্যিই দুঃখ হয় অরবিন্দর। এখনও একাদশী, অম্বুবাচীর উপোস করতে হয় ওকে। গৌরীদেবীর সব কিছুতেই বাড়া-

বাড়ি। বিংশ শতাব্দিতেও বিধবাদের নাকি এই সব নিয়ম মেনে চলতে হবে! না মানলে লোকে নিন্দে করবে। লোকনিন্দার ভয় মানুষের মৃত্যু ভয়ের চেয়েও যেন বেশি।…কিন্তু বিয়ের কোন স্বাদই যে মেয়ে পেল না—। রমা রাজি হলে অরবিন্দ অনায়াসে ওকে বিয়ে করতে পারে।

আকাশে দৃষ্টিটা প্রসারিত করে দিলে অরবিন্দ। শুক্লা দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রকলা অনেক আগেই অস্ত গেছে। অন্ধকার থমথম করছে গ্রামের বুকে। চারিদিক নিঝুম—নিঃশব্দ। রাত্রির স্তব্ধ সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল অরবিন্দ। সাদা কাপড় পরা একটি নারীমূর্তি সামনে এগিয়ে আসতেই চমকে উঠলো—কে?

—আমি, রমা।

অন্ধকারে ওর মুখ দেখা যায় নি।

—এত রাতে?—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে অরবিন্দ।

রমা আরো কাছে এগিয়ে এলো।—একটা কথা বলতে এলাম।—গলাটা কেমন কেঁপে উঠলো তার। একটু থেমে বললে—তুমি আমাদের এখানে আর থেক না।—রমার গলায় অনুনয়ের সুর।

—অপরাধ?—অরবিন্দ প্রশ্ন করলে। রমা সে কথায় উত্তর না দিয়ে আবার বলে উঠলো—সত্যি বলছি, তুমি চলে যাও।—রমা একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেললো কি? একটু থেমে বললে—তুমি না গেলে আমাকে শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।

—রমা! অরবিন্দ হাতটা ধরতে যাবে, কিন্তু কোথায় রমা। চক্ষের পলকে সে ছুটে চলে গেল—নিজেদের ঘরের দিকে।

মনটা গ্লানিতে ভরে গেল অরবিন্দর। ঐ নোংরা কথাগুলো ওর কানেও গিয়ে পৌঁছেছে!

আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো অরবিন্দ।…আকাশ থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়লো একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র, রাত্রির অতলান্ত অন্ধকারে হারিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

হ্যাঁ, চলে যেতে হবে অরবিন্দকে। অবিনাশবাবুর বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে। রমা ওকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না। সমাজের চোখে খাটো হতে কিছুতেই রাজী নয় সে—স্নেহ-ভালবাসার জন্যেও নয়।

সন্ধ্যেবেলায় নিজের ঘরে জানলার ধারে চুপচাপ বসে ছিলো মানসী। ছুটি, এখন অফুরন্ত ছুটি ওর।

বি. এ. পরীক্ষা সারা হয়ে গেছে। পরীক্ষাটা শেষ হয়ে গিয়ে কেমন খালি খালি লাগছে যেন—নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।…জীবনে মানসী ক্রমশ যেন একলা হয়ে পড়ছে। বাড়ীর সবাই বা এমন বিরূপ কেন ওর উপর ?…বাবা ? হ্যাঁ, বাবাও যেন অনেক দূরের লোক হয়ে গেছেন, ভাবলে বড় খারাপ লাগে মানসীর—আগের মত তিনি আর ডেকে ওর সঙ্গে কথা বলেন না। কি করেছে সে ? চাকরি করছে ? চাকরি করার ক্ষমতা থাকলে কোনো মেয়ে আজকাল ঘরে বসে থাকে ? থাকা উচিতও নয়।…অরবিন্দর কথা মনে পড়ে যায়। চাকরির ব্যাপারে সেই তো মানসীকে উৎসাহিত করেছিল। বলেছিল—আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও—বিয়ের কথা পরে ভাবা যাবে।—

হ্যাঁ, ওর সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যেই তো বাবা বিরক্ত হয়ে আছেন। ওর জন্যে মানসী তার বাবার কথা পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছে।…

চিন্তার স্রোতে বাঁধা পড়লো হঠাৎ।—দিদিমনি, কর্তাবাবু তোমাকে ডাকছেন।—ঘরে ঢুকে মোক্ষদা বলে উঠল।

—বাবা ডাকছেন !—ব্যস্ত হয়ে মানসী নীচে নেমে এলো।

ড্রয়িংরুমেই বসে ছিলেন ভূপেশ। মানসী তাঁর সামনে এসে জিজ্ঞেস করলে—আমাকে ডেকেছো বাবা ?

—হ্যাঁ, বোস। গম্ভীর সস্নেহ গলায় ভূপেশ বললেন।

লম্বা সোফায় ভূপেশের পাশেই বসে পড়লো মানসী।

দু'চার কথার পরেই ভূপেশ বিয়ের কথা তুললেন—তোমার মা তো ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তোমার বিয়ের জন্যে !

মানসী নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলো মেঝের দিকে। সামান্য ইতস্ততঃ করে ভূপেশ বললেন, আমাদের ইচ্ছে আর দেরী না করেই—

একটু থেমে বললেন—সুবোধই বা আর কতদিন অপেক্ষা করবে?

এই ভয়ই করেছিল মানসী। ভয় পেয়েই যেন মানসী মাথা নেড়ে বলে উঠলো—সে হয় না বাবা, কিছুতেই হয় না।

ভূপেশ গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর গম্ভীর মুখে বললেন—ওখানে আপত্তি থাকলে অন্য ছেলেও তো আছে।

অন্য ছেলে থাকলে কি হয়েছে!···মানসী চুপ করে রইলো।

—লক্ষ্মী মা, অমত কোর না।—মানসীর পিঠে হাত রাখলেন ভূপেশ: তোমার ভালোর জন্যেই—

মানসীর কি যে হল হঠাৎ—কথাটা শুনেই কান্না ঠেলে উঠলো বুকের ভেতর থেকে।

কান্না ধরা গলায় বললে—থাক, আমার আর ভালর দরকার—

ভূপেশের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা আটকে গেল।

অসহায়ের দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে ছিলেন মানসীর দিকে, মুখখানাও বড় ফ্যাকাশে মনে হল।

মানসী মাথা নীচু করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললে—আমাকে একটু ভাববার সময় দাও বাবা।

মেয়ে ভাববার সময় নিয়েছে শুনেই ললিতা উৎসাহে নেচে উঠলো।

—ভেবে দেখার মানেই তো—।—এক গাল হেসে বললে: এবার পাঁজি দেখে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেল।

ভূপেশ কোন উৎসাহ দেখায় না। বলে—পাত্র আগে ঠিক হোক।

—পাত্র তো ঠিক হয়েই আছে!—ললিতা আশ্চর্য হয়ে যায়।

ভূপেশ সায় দিতে পারে না—আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে থাকে।

ভূরু কুঁচকে ললিতা বলে ওঠে—সুবোধের মত উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাবে শুনি?···রূপে-গুণে—

উপযুক্ত পাত্র সন্দেহ নেই।···কিন্তু বারীন ওর উপর অমন চটা কেন? ললিতার কথাটা মনে পড়ে যায়। বড়লোক বলেই নাকি বারীন অপচ্ছন্দ করে সুবোধকে। কিন্তু বড়লোক হওয়াই কি একটা অপরাধ? চুরি-ডাকাতি করে সে তো আর পয়সা করে নি!···অসম্ভব পরিশ্রমী ছেলে সুবোধ,—বুদ্ধিও রাখে যথেষ্ট। প্রাইভেট্ সেক্টারের স্বপক্ষে সেদিন যে যুক্তিগুলি দেখালো, সেগুলো একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না!···

পুরোপুরি স্বীকার করতে না পারলেও সুবোধের কথাগুলি সেদিন ভাবিয়ে তুলেছিল ভূপেশকে।···অমন বুদ্ধিমান ছেলে সচরাচর চোখে পড়ে না।···কিন্তু মানসী যে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না—

ভূপেশকে নিরুত্তর দেখে ললিতা অধৈর্য হয়ে উঠলো শেষপর্যন্ত। —চুপ করে রইলে যে? যা হয় একটা কিছু ঠিক করবে তো?

—মেয়েকে আগে রাজী কর।

—রাজী হতে কি বাকী?···অমত থাকলে স্পষ্ট না বলে দিত—নিজের মেয়েকে নিজে চেন না?

ভূপেশ হেসে ফেললো এবার—কি করে চিনবো বল? মেয়ে যে তার মায়ের মতই খামখেয়ালী!

ললিতা মুখ টিপে হাসলো।—ঠিক আছে, গয়নার ফর্দটা করে ফেলতে দোষ কি!

খুশি মনে মেয়ের গয়নার ফর্দ করতে বসলো ললিতা।

গয়নার ফর্দ করলেও পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেনি ললিতা। সুবোধকে সে তাই নিজেই খবর দিয়ে বাড়ীতে ডেকে এনেছে। ছুটির দিন চায়ে নেমতন্ন করে। কিন্তু মানসী পাশ কাটিয়েই চলে সুবোধকে।···আগের সেই হাসিখুশি ভাবটা কেন যেন আর নেই ওর। অনুপ চলে যাওয়ায় হয়তো একলা বোধ করছে—ছেলেটাকে ও নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসতো।

অনুপের অভাব ভূপেশও কি ভুলতে পেরেছে? বৌদির জায়গাটা সে যেন ভরে রেখেছিল।···ছেলেটা হঠাৎ অমন ভাবে চলে গেল কেন? গিয়ে অবধি একটা চিঠি পর্যন্ত দিলে না! কোথায় গেল! ···ওর বন্ধু, সেই অরবিন্দ ছোকরা সেদিন ভূপেশের কাছে গালাগালি খাওয়ার পর আর এ বাড়ীমুখো হয়নি। হবে কোন সাহসে?

তবে সাহসের সীমা নেই ওর!···

অরবিন্দর সম্বন্ধে নানারকম অভিযোগ কিছুদিন থেকেই কানে আসছে ভূপেশের। ওরই জন্যে শান্তিনগরে সুবোধের একশ বিঘা জমি হাতছাড়া হতে বসেছে। কারখানার জন্যে পড়েছিল ঐ অতিরিক্ত জমিটা।···চাষীদের অরবিন্দই নাকি ক্ষেপিয়ে তুলেছে সেখানে। বাস্তু হারিয়েও লোকগুলোর গায়ের তেল ফুরোয় নি। ···অবিনাশই বা ওদের সমর্থন করছে কেন?···সংসারে কারো ভালো করতে নেই।

বুদ্ধিটা ললিতাই দিলে। বললে—যাও না, নিজের চোখেই একদিন গিয়ে দেখে এসো না। এ তো ভাল কথা নয়! নিজের লোক হয়ে অবিনাশ আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে?

সরজমিন তদন্ত করা চাই।

ছুটির দিন দেখে ভূপেশ তাই তার গাড়ী নিয়ে শান্তিনগরে গিয়ে উপস্থিত হল।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। প্রখর রৌদ্র চারিদিকের মাঠে-প্রান্তরে। ঘামে নেয়ে উঠেছিল ভূপেশ। পথেই দেখা হয়ে গেল শ্যামাপদবাবুর সঙ্গে। বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি। গ্রামের ডাকশেটে তালুকদার। তিনিও ভয় পেয়ে গেছেন ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখে!

বাস্তুহারা সম্মেলন থেকে সুরু করে শ্যামাপদবাবু তাঁর কাছারি ঘেরাও করা অবধি সমস্ত ঘটনা একে একে বলে গেলেন ভূপেশের কাছে।

তাঁরও অভিযোগ অরবিন্দর বিরুদ্ধে। অরবিন্দই নাকি ওদের রিং-লিডার। অবিনাশ? না, অবিনাশের বিরুদ্ধে তেমন কিছু বললেন

না শ্যামাপদবাবু। বললেন, তার ভগ্নীর বিরুদ্ধে। অরবিন্দ নাকি ঐ মেয়েটার সঙ্গেও ফষ্টিনষ্টি আরম্ভ করেছিল। রাগ করে গৌরী নাকি তাই বাড়ী থেকে হাঁকিয়ে দিয়েছে ওকে।

গাড়ী নিয়ে গৌরীর বাড়ীতে চলে এল ভূপেশ। এসে দেখা পেল না অবিনাশের।

খানিক চিন্তা করে হারানকে ডেকে পাঠালো। হারান মণ্ডল। দেশে থাকতে এই হারান মণ্ডল-ই ওদের জমিতে হাল-চাষ করতো—দেশ বিভাগের পরে এই গ্রামে এসে ঘর বেঁধেছে। শান্তিনগরে সেই এখন চাষীদের মোড়ল।···অরবিন্দ ওর বাড়ীতে গিয়েই নাকি এখন ঘাঁটি করেছে।

খবর পেয়েই চলে এলো হারান। অনুগত বিনয়ে ভূপেশের সামনে এসে প্রণাম ঠুকলো পায়ে।

ভূপেশ বললে—এসব কি শুনছি হারান, তোমরা নাকি জমি নিয়ে লড়াই সুরু করে দিয়েছ?

মাথা হেঁট করে হারান কি যেন ভাবলো খানিক। তারপর ধীরে আস্তে উত্তর দিলে—লড়াই কি কেউ সাধে করে হুজুর?···খেতে না পেলে মানুষ কতদিন আর মুখ বুজে থাকবে!

রাগে গা জ্বলে উঠলো ভূপেশের।—যেতে পার। হারানকে তক্ষুণি বিদায় করে দিলো সে।

গ্রামের আরো দু'চার-জন মাতব্বরের সঙ্গে দেখা করে বাড়ীর দিকে রওনা হল ভূপেশ।

গাড়ী করে ব্যারাকপুর স্টেশনের দিকে চলেছিল সে, লেভেল-ক্রসিং-এ গেট বন্ধ থাকায় গাড়ীটাকে থামাতে হল কিছুক্ষণের জন্যে।

রেল লাইনের পাশেই বিস্তৃত মাঠ, শস্যহীন রিক্ততায় খাঁ খাঁ করছে। মাঠের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতেই প্রথম নজরে পড়লো যাদের দিকে, তারা দুজনেই পরিচিত ভূপেশের। হারান আর অরবিন্দ। ওদের কাছাকাছি আরো জন দশেক লোক দাঁড়িয়ে একটা ষড়যন্ত্রের

ভাবে কি যেন আলোচনা করছিল। লোকগুলো সবই চাষী-মজুর শ্রেণীর।

অভিনন্দন জানাবার ভঙ্গিতে হারানের হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে অরবিন্দ কি যেন বলে উঠলো।

নিজেকে হঠাৎ কেমন দুর্বল মনে হল ভূপেশের।...বড় শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে ছোকরা!

বিরক্ত হয়েই ভূপেশ অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। লোকগুলোর উদ্ধত দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যেতে পারলেই যেন সে বেঁচে যায়।

গেট খুলে গেল একটু বাদেই।

পিচঢালা মসৃণ 'ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড' ধরে গাড়ীটা ছুটে চললো কলকাতার দিকে। হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে হারানের কথাগুলো কানে বাজছিল তখনও—লড়াই কি কেউ সাধে করে হুজুর?...

কথাগুলো হারানের নয়, অরবিন্দর।

বারীন ঐ ছোকরাটাকে এত আশকারা দেয় কেন?...ওর বিরুদ্ধে একটি কথা বলার উপায় নেই।...

শান্তিনগর থেকে ফিরে মেজাজটা গরম হয়েই ছিলো। পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় বারীন বেড়াতে এলে সে তাই রাগের মাথায় বলে ফেললো—ঐ অরবিন্দ ছোকরাটাকে আর বাড়ীতে ঢুকতে দিও না।

—অপরাধ?—বারীন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর মৃদু হেসে বললেঃ ওর সম্বন্ধে তোমার দেখছি একটা এলার্জি গ্রো করেছে।

ভূপেশ চটে যায় ওর কথায়—থাক, ঐ ছোকরার সম্বন্ধে আমি কিছু শুনতে চাই না—শান্তিনগরে উদ্বাস্তু চাষীদের কে ক্ষেপিয়ে তুলেছে জান?

বারীন উচ্চস্বরে হেসে উঠলো—এই অভিযোগ।—একটু থেমে বললে—তুমি ভয় পেয়ে গেছ দেখছি।

ভয় পেয়ে গেছি?— ভূপেশ প্রতিবাদ করে উঠলো: বাজে কথা।

সিগারেট বের করে বারীন সিগারেট ধরালো। সিগারেটে একটা টান দিয়ে হালকা হেসে বললে—হ্যাঁ, ভয় পেয়েছ বইকি!…ভদ্রলোকেরা চাষাভুষোকে শুধু ঘেন্নাই করে না, ভয়ও করে।—

বারীন আরো কিছু হয়তো বলে যেত। কিন্তু বলতে সুযোগ পেল না।

সেকরাকে সঙ্গে নিয়ে ললিতা ঘরে ঢুকলো। সেকরা মানসীর নেক্‌লেসের ডেলিভারী দিতে এসেছিল। যেখানেই হোক মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে। গয়নাগুলো তাই ধীরে সুস্থে তৈরী করে রাখছে ললিতা।

লকেটে হীরে বসানো জড়োয়ার নেক্‌লেস্‌টা দেখে বারীনের চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠলো। প্রশংসার দৃষ্টিতে নেক্‌লেস্‌টার দিকে তাকিয়ে বললে—বেড়ে জিনিস হয়েছে তো!

কথাটা শুনে ললিতা খুশিই হল। খুশির ঝোঁকে বলে উঠলো— এ আর কি দেখলেন, আমার বাবা আমাকে বিয়েতে যে সব গয়না দিয়েছেন, তা দেখলে আপনি তো –।

বারীন মনে মনে হাসলো যেন। হাসি চেপে ললিতার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে—দয়া করে দেখাবেন একদিন?

ললিতা গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। বারীনের কথায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে হয়ত। ওর কথা বলার ভঙ্গিটাই এমন যে শুনলে মনে হয় যেন বিদ্রূপ করছে।

ছুটির দিন। বিকেলবেলায় ইচ্ছে করলেই বাণী বেড়াতে যেতে পারতো। অন্য দিন তাই তো যায়। কিন্তু আজ আর বেরুতে মন চাইলো না। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতেই ইচ্ছে করছে।

মনটা ওর সকাল থেকেই খারাপ। ছুটি বলেই আজ সকালে

সে ঘরগুছোতে বসেছিল, আলমারিটা গুছোতে গিয়েই না ঐ ছবিখানা বেরিয়ে পড়লো।

আর কারো নয়, বাণীর নিজেরই ছবি। তুলেছিল অনুপ। কি হাসি-খুশিই না তখন ছিল সে!...

বিকেল হতে না হতেই সেদিন হাজির হয়েছিল ক্যামেরা নিয়ে। নিজের হাতে সে বাণীর ছবি তুলবে।...বাড়ীতে তোলা চলবে না, ভালো ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড চাই।

বাণীকে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেল সে। বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে লেকের ধারে চলে এলো। একটা গাছের পাশে বাণীকে দাঁড় করিয়ে ছবি তুললো—অনেকগুলো সট নিয়েছিল। ভালো উঠেছিল কিন্তু ঐ একখানাই।

ছবি তোলা হয়ে গেলেও উত্তেজনা কমলো না অনুপের। বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে—দারুণ একটা কাণ্ড করে ফেললাম, ছবিটা এখন ঠিকমত উঠলে হয়।

জীবনে এর আগে কোনদিন নাকি ও ছবি তোলেনি।

কিছুটা ঘোরাঘুরি করেই বাণী বাড়ী ফেরার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল—এবার ফেরা যাক্। কথাটা শুনেই অনুপ বলে উঠেছিল—এখুনি বাড়ী ফিরে কি করবে?

করার তো কত কিছুই ছিল। বাড়ী ফিরে দু'জনে চা খেতে খেতে গল্প করতে পারতো। অনুপ চলে গেলেও কি কাজের অভাব হতো বাণীর? আর কিছু না হক, গল্পের বই নিয়ে খাটে চিত হয়ে পড়তে তো বাধা ছিল না।

কিন্তু আসা হল না। লেকের ধারে একটা গাছের তলায় নির্জন এক-খানি বেঞ্চি দেখে এগিয়ে গেল অনুপ। পকেট থেকে রুমাল বার করে বেঞ্চিটা ঝেড়ে নিয়ে বললে—বসো। দুজনে বসে পড়ল পাশাপাশি।

আকাশে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠলো—কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার। জ্যোৎস্না-ধোয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে অনুপ বলেছিল—জান, তোমাকে

নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি।—আমাকে নিয়ে, কবিতা?...বল কি? —বাণী আশ্চর্য হয়ে বলে উঠেছিল।

—তোমাকে নিয়েই তো আমার কবিতা।—খুশির মেজাজে অনুপ বলেছিল।

বাণী হেসে উত্তর দিয়েছিল—আমাকে নিয়ে কেউ কবিতা লিখতে পারে— তুমি সত্যি অবাক করলে।

অনুপ কেমন আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। বলেছিল—আমার সব কিছুই তো তোমার কাছ থেকে পাওয়া—নিজস্ব বলতে কিছু নেই!...অনেকটা ঐ চাঁদের আলোর মতই—পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোক পৃথিবীকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া।

—আমাকেও কবি বানিয়ে ফেলবে দেখছি।—বাণী ওর হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল।

হু হু হাওয়া দিচ্ছিল চরিদিকে। হাওয়ায় গাছের ডালপালা থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছিল ঝুরঝুর করে। পায়ের কাছে অজস্র ঝরা পাতার ভিড়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুপ হঠাৎ বলে উঠেছিল—নিঃসঙ্গ একলা জীবন এই ঝরা পাতার মতই তো নিষ্প্রাণ।

বাণী সায় দিতে পারেনি ওর কথায়। কি করে দেবে? মানুষ তো একলা নিঃসঙ্গ নয়! অদৃশ্য এক বন্ধনে তারা যে সবাই হাতে-হাতে বাঁধা।......

বাণীর উপর রাগ করেই অনুপ কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে। আর কেউ না জানলেও বাণী তো জানে। কিন্তু দূরে গিয়েও কি সে বাণীকে ভুলতে পেরেছে? পারেনি। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ওর মুখের সেই কড়া কথাগুলো মনে করে হয়তো এখনও চোখের জল ফেলে।...বাণীকে কোনদিনও ভুলতে পারবে না সে। যদি আর কাউকে বিয়ে করে? তাহলেও না। এই জন্যেই বাণীর এত চিন্তা ওকে নিয়ে। আর পাঁচ জন লোকের মত সে যদি—

ঘরে ঢুকে বাণীর বাবা আলো জ্বালিয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন যেন:
—কি ব্যাপার, সন্ধ্যেবেলায় তুমি শুয়ে আছ ?

—শরীরটা ভালো নেই।

—তা আলোটা দোষ করলো কি ?—কাছে এগিয়ে এসে বাবা ওর কপালে হাত রাখলেন—না, গা তো দ্রিব্যি ঠাণ্ডা।···মাথা ধরেছে ? বাণী ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলো।—তবে ? চেয়ারে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাণীর মুখের দিকে চেয়ে বারীন মৃদু হেসে বললেন—যখন তখন শুয়ে পড়ার অভ্যাসটা মোটেই ভাল নয়, শরীরের সঙ্গে মনও তাতে নেতিয়ে পড়ে—ঐ পস্চারটারই দোষ।

লজ্জা পেয়ে বাণী উঠে বসলো। হেসে বললে—তুমি ল্যাঙ্-জেমস্ থিওরীতে বিশ্বাস কর দেখছি।

বারীন খুশির হাসি হেসে বাণীর মাথাটা ধরে নেড়ে দিলেন সস্নেহে।

চেয়ারে বসে বললেন—অনেকগুলো বই কিনে ফেললাম, লোভ সামলাতে পারা গেল না।

হ্যাঁ, এই একটা ব্যাপারেই লোভ আছে বাণীর বাবার—বইয়ের লোভ।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিটিং-এ এসে হঠাৎ বাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অরবিন্দর। সভামঞ্চের কাছে এগিয়ে এসে বাণীই ওকে খুঁজে বের করলো।

প্রায় এক যুগ বাদে দেখা। অনুপ কলকাতা থেকে চলে যাবার পর সে বড় একটা আর এদিক মাড়ায়নি। কলকাতায় এলেও তাড়াহুড়ো করে চলে গেছে। বাণীদের বাড়ীতে যাবার সময় পায়নি। শান্তিনগরে বাস্তুহারা-আন্দোলন নিয়েই ব্যস্ত সে। জমির দাবি সেখানে লড়াইয়ের রূপ নিয়েছে এখন—যার ফলে সম্পত্তিবানের দল মারমুখো হয়ে উঠেছেন বিত্তহীনদের বিরুদ্ধে। হওয়াই স্বাভাবিক। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধনসম্পত্তির অধিকার যে মায়ের সম্মানের চেয়েও পবিত্র !

অনেকদিন বাদে বাণীকে দেখে মনটা আপনা থেকেই খুশি হয়ে উঠলো অরবিন্দর। কিন্তু কি আশ্চর্য মেয়ে, কাকাবাবুর অসুখের খবরটা পর্যন্ত জানায়নি।

—চল, কাকাবাবুকে দেখে আসি।—মিটিং-এর পর বাণীর সঙ্গে ওদের বাড়ীতে চলে এলো অরবিন্দ।

যাঁকে দেখতে আসা, এসে কিন্তু তার দেখা পাওয়া গেল না। রাত আটটা বেজে গেছে, তখনও বাড়ী ফেরেননি তিনি।

রামলালকে ডেকে বাণী তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে—বাবা কখন বেরিয়েছেন?

মাথা দুলিয়ে ছোকরা হেসে বললে—বিকেলে চা খেয়েই।—একটু থেমে বললে—ফিরতে দেরি হবে। আপনাকে খেয়ে নিতে বলেছেন।

বাণী ম্লানভাবে হাসলো একটু। বললে—বাবাকে নিয়ে সত্যি আর পারা যায় না।

দু-চার কথার পরেই বাণী কেমন আনমনা হয়ে পড়ে যেন। বাণীর এই ভাবটা কেমন নতুন ঠেকল অরবিন্দর কাছে। অনুপের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

—অনুপের কোন খবর পেয়েছ?—অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলে।

—না।

বাণী আরো গম্ভীর হয়ে গেল যেন।

অরবিন্দ বললে—ছেলেটা তোমার জন্যেই বিবাগী হয়ে গেল!

কথাটা শুনে বাণী মোটেই খুশি হল না। ভুরু কুঁচকে কি যেন একটু ভাবলো। তারপর বললে—বেশি হ্যাংলামি নিয়ে ভালবাসতে গেলে দুঃখই পেতে হয়।

বাণীর স্বর শেষের দিকে কেমন উদাস লাগে, কতকটা নিজের সঙ্গে কথা বলার মত শোনায়। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে—মানসীদের ওখানে শীগগির গিয়েছিলে কি?

—না।—অরবিন্দ আর কথা খুঁজে পায় না।

কথা বাণীই বলে আবার।—ভূপেশকাকা তো মেয়ের বিয়ে প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন,—পাত্র নাকি টাকার কুমীর!

দুঃখেও মানুষের হাসি পায়। হেসেই উত্তর দেয় অরবিন্দ।—

ভূপেশ বাবুর পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক,—বড় গাছে নৌকা বাঁধার চেষ্টা করছেন।

বাণী কান দিল না কথাটায়। নিজের মনে ভাবতে ভাবতে বললে—কিন্তু মানসীর এ বিয়েতে মত আছে বলে মনে হয় না।

—না থাকলেও হতে কতক্ষণ?—অরবিন্দ পরিহাসের ভাবে বললে।

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বাণী চোখ কোঁচকালো। অরবিন্দ বললে—আমাদের দেশের বেশির ভাগ মেয়েই এখন পর্যন্ত হয় বাপ, নয় স্বামীর মেগাফোন। ক'টা মেয়ে আর স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে!

বাণী এবার চটে যায় অরবিন্দর উপর। ভুরু কুঁচকে বলে—মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। বহু মেয়েই এখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছে।…বাপ-মায়ের কথায় যাকে তাকে বিয়ে করতে তারা রাজী নয়।

অরবিন্দ কৌতুক বোধ করে। ওকে চটাবার জন্যেই বলে—বাপ-মা যে 'যাকে তাকে' পাত্র বলে ঠিক করবেন, এটাই বা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন?

বাণী দস্তুরমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে—বাপ-মায়ের ঠিক করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। গৌরীদানের যুগ শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন।…নিজের সঙ্গী নিজেরই তো বেছে নেওয়া উচিত।

অরবিন্দ নির্বাক হয়ে ওর কথা শুনছিল।

একটু থেমে বাণী অভিযোগের সুরে বলে—সত্যি তোমরা ছেলেরা নিজেদের যত উদার মতাবলম্বী বলেই জাহির কর না কেন, একটা ব্যাপারে কিন্তু সবাই এক—মেয়েদের স্বাধীনতা তোমরা বরদাস্ত করতে পার না।

—তাতে যে আমাদের ভীষণ অসুবিধা।—বলেই অরবিন্দ সশব্দে হেসে ওঠে।

হ্যাঁ, বাণীর কাছে তর্কে হেরে গিয়ে সে খুশিই হয়েছে।

দুপুরবেলায় খেয়ালের বশেই ললিতা আজ রমলার হাত-বাক্সটা খুলে দেখতে বসেছিল। কে জানতো, অমন একখানি চিঠি বেরিয়ে পড়বে এতকাল বাদে। চিঠিখানা পড়ে মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।···না, সংসারে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। নিজের স্বামীকেও নয়।

বিকেলবেলায় বারীনকে দেখে কিন্তু ওসব কথা ভুলে গেল সে।

দিন পনর বাদে বারীন আবার বেড়াতে এসেছে। ভূপেশ তখনও ফিরে আসে নি বাড়ীতে।

ললিতা উপরের ঘরেই বসালো ওঁকে। ভীষণ রোগা দেখাচ্ছিল। ললিতা তাই জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলো না—অসুখ করেছিল নাকি?

হালকা হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় বারীন। একটু পরে বলে—হ্যাঁ, একটু ব্রঙ্কাইটিসের মতন হয়েছিল।

—ব্রঙ্কাইটিস্ হয়েছিল!···আমাদের একটা খবর পর্যন্ত দেন নি! —ললিতা অনুযোগের সুরে বলেঃ আশ্চর্য মানুষ আপনি।

অল্প হেসে বারীন বলে—কি লাভটা হতো শুনি?—একটু থেমে বলেঃ ইচ্ছে না হলেও ছুটে যেতে হতো গরীবের আস্তানায়।···শুধু যাওয়া নয়, গিয়ে মুখ ভার করে বসে থাকতে হতো বিছানার পাশে। খবরটা দেইনি বলেই তো এসব হাঙ্গামা থেকে বেঁচে গেলেন। তাই নয় কি?

কথাগুলো শুনে অন্যদিন হলে ললিতা নিশ্চয়ই রেগে যেত। কিন্তু আজ রাগতে পারলো না। বারীনের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন মায়া হল। অভিমানের সুরে বললে—আপনি পৃথিবীতে কাউকেই বোধহয় আপন মনে করেন না?

—আপন মনে করায় যে অনেক বিপদ।—রসিকতার ভঙ্গিতে বারীন উত্তর দিলে।

বারীনের কথা শেষ হতে না হতেই ভূপেশ ঘরে ঢুকলো। বারীনের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলে—একি চেহারা করেছো!

বারীন সেই হালকা হাসি হাসলো।—কেন, খুব খারাপ দেখাচ্ছে?

—অসুখ করেছিল বুঝি?

—হ্যাঁ, একটু ভুগিয়েছে বইকি।

সংক্ষেপে নিজের অসুখের ইতিহাস বলে গেল বারীন।

কথাগুলো শুনে ভূপেশ চিন্তিতমুখে বললে—শক্ত অসুখে পড়েছিলে তাহলে।

বারীন আবার হাসলো একটু। বললে—পেনিসিলিন বের হবার পর থেকে নিউমোনিয়া-ব্রঙ্কাইটিস্‌কে আর লোকে শক্ত অসুখ মনে করে না। ওসব অসুখ এখন ম্যালেরিয়ার মতই আয়ত্তে এসে গেছে।

ললিতা আর বসলো না। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো। চায়ের যোগাড় করতে হবে তো। শুধু চা দেওয়া যাবে না। চায়ের সঙ্গে কিছু ফল, মিষ্টিও দিতে হবে বারীনকে। অসুস্থ মানুষকে আজ আর ভাজাভুজি দেওয়া চলবে না। চা, জলখাবারের ব্যবস্থা করে ললিতা আবার দোতলায় উঠে এলো।

ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। ভূপেশ ঝুঁকে পড়েছে একখানি বইয়ের উপর—মোটা নতুন বই। আর বারীন উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোন কথাই বললো না। তারপর বইটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ভূপেশ উৎসাহিত ভাবে বললে—দারুণ একটা কাণ্ড করে ফেলেছ দেখছি।

ললিতাও অবাক। বারীন লিখেছে এতবড় বই। খবরের কাগজে জড়ানো এই বইখানাই তা'হলে এতক্ষণ হাতে ছিল ওঁর? ললিতাকে আগে দেখালে এমন কি দোষ হতো!

ভূপেশকে লক্ষ্য করে বারীন কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললে—অনেক আগেই বইটা তোমাকে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অসুখে পড়ে গেলাম কিনা—

চা-খাবার ততক্ষণে এসে গেছে।

খাওয়া হয়ে গেলেই ভূপেশ উঠে পড়ল।—তোমরা গল্প কর।—ব্যস্তসমস্ত হয়ে আবার নিচে নেমে গেল সে, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন ওঁর সঙ্গে।

ভূপেশ চলে গেলেই বারীন চুরুট ধরালো। নিজের মনে চুরুট টেনে চললো।

টেবিলের উপর থেকে বারীনের লেখা বইখানা তুলে নিলে ললিতা। বাংলাভাষায় লেখা—"সন্ধানীর চোখে ভারতবর্ষ।" ভারী সুন্দর প্রচ্ছদপট।

বইটা খুলেই প্রথম দিকের একটা পাতায় দৃষ্টিটা আটকে গেল ললিতার। দু'টি মাত্র লাইন। নিজের মনেই লাইন দু'টি পড়ে ফেললো ললিতা।—সেই বন্ধুকেই দিলাম—যার সাহায্য ছাড়া বইখানি লেখাই সম্ভব হতো না।

বন্ধুটি কে! মনের উপর একটা সন্দেহের ছায়া দুলে গেল ললিতার।...শেষ পর্যন্ত বারীনকে সে জিজ্ঞেস করে বসলে—বন্ধুটির নাম জানতে পারি কি?

অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে বারীন যেন হকচকিয়ে গেল। ললিতার দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল। তারপর করুণার হাসি হেসে বললে—সুলেখা!

ললিতার সমস্ত অন্তর ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। কেমন বাহাদুরির ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন বন্ধুত্বের কথা! লজ্জা করলো না!

বিরক্ত হয়ে ললিতা অন্যদিকে তাকিয়ে বসে রইলো। বারীন সেটা লক্ষ্যও করলো না। কতকটা নিজের মনেই বলে গেল—সুলেখার সাহায্য না পেলে বইটা এত শীগগির কিছুতেই বের করা সম্ভব হতো না।

মুখে হাসি টেনে এনে ললিতা বললে—হ্যাঁ, লেখাপড়ায় ওর তো বরাবরই সুনাম আছে।

কথাটা শুনে বারীন যেন কৌতুক বোধ করলো। ঠাট্টার ছলে বললে—তুর্নামটা কোথায় বলতে পারেন ?

ললিতার রাগ ধরে গেল। বললে—ঠাট্টা করলে কি হয় ? পাড়ার লোকেরা মোটেই ওর সুখ্যাতি করে না।

বারীনের মেজাজটা যেন গরম হয়ে ওঠে। ললিতার কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুরুট টেনে চলে।

ভূপেশ ততক্ষণে আবার এসে ঘরে ঢুকেছে। বারীনের পাশে একটা চেয়ার অধিকার করে বসে পড়লো সে।

চুরুটের ছাই ঝেড়ে বারীন তাঁর মুখের দিকে একটা অন্যমনস্ক দৃষ্টি তুলে বললে—প্যাভ্‌লভ্‌বাদীদের গবেষণা সত্ত্বেও কুকুরের স্বভাব কিন্তু আজও বদলায়নি—চাঁদের দিকে তাকিয়ে তারা এখনও ঘেউ ঘেউ করে।—অর্থগভীর দৃষ্টিটা ললিতার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—ইংরাজীতে যাকে বলে 'বারকিং অ্যাট্ দি মুন্'।

ভূপেশ ওর কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারে না। কিন্তু ললিতার কান মাথা আগুন হয়ে ওঠে অপমানে। ভূপেশের সামনে বসে বারীন ওকে এত বড় কথা শুনিয়ে দিলে ! কথাগুলো অবিশ্যি সুলেখা-দেবীর পাড়ার নিন্দুকদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার ঝাঁজ ললিতাকেও এসে স্পর্শ করলো যেন। পাড়ার নিন্দুকেরাই শুধু এ আক্রমণের লক্ষ্য নয়—ললিতা স্পষ্ট অনুভব করলো।

কোন উত্তর না দিয়ে সে সোজা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। অন্ধকার ছাদে এসে বসে রইলো চুপচাপ। এমন অভদ্র লোকের সঙ্গে ললিতা আর কোন রকম সম্পর্ক রাখবে না।

দিব্যি বসে গল্প করছিল, হঠাৎ মুখ গোমড়া করে ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেন ? বারীনের কোন কথায় হয়তো অসন্তুষ্ট হয়েছে।

বারীন কিন্তু খোশমেজাজেই ছিল। দু'চার কথার পরেই মেয়ের বিয়ের কথা তুললো ভূপেশ।—মানসীর বিয়েটা এবার চুকিয়ে ফেলবো ভাবছি।

কথাটা শুনে বারীন গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবলো খানিক। তারপর জিজ্ঞেস করলে—বিয়েতে ওর মত আছে তো?

—আমাদের মত থাকলেই হল।

তোমাদের মতে মেয়ে ডিটো না-ও তো দিতে পারে।—বারীন তার সেই বিশেষ বিদ্রূপের হাসি হাসে: তোমার সমস্ত অ্যাপ্রোচ্‌টাই ভুল।...দিন পালটাচ্ছে, এটা তুমি কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছ না।—

এক চোট উপদেশ ঝেড়ে বারীন চলে গেল।

কিন্তু মেয়েকে বিয়ে না দিয়েই বা কি করবে ভূপেশ। সারা জীবন আইবুড়ো করে ঘরে রাখবে?

রাত্রে ললিতার কাছে কথাটা তুলতেই সে রেগে আগুন হয়ে উঠলো। বললে—হ্যাঁ, উনি তো বলবেনই ঐ কথা—ওঁর কথামত মেয়ের বিয়েটা এখন ভেঙ্গে দাও।—

ভূপেশ চিন্তায় পড়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে—মানসীর মতটা আর একটু ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার।

আর যায় কোথায়!

বারীনকে ছেড়ে রাগটা গিয়ে পড়ল ভূপেশের উপর। রাগে নাসারন্ধ্র কাঁপতে লাগলো। বললে—আমার কথার চেয়ে বন্ধুর কথাই বড় হয়ে গেল!...এই জন্যেই তোমাকে আমি কোনদিনও ভালোবাসতে পারিনি।

ভূপেশ হতভম্ব হয়ে যায়। এসব আবার কি বলছে ললিতা! এতকাল স্বামীর ঘর করে এখন বুড়ো বয়সে বলে কিনা—

পাগলের প্রলাপ মনে করেই কথাগুলো উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো ভূপেশ। বললে—বেশ তো না-ই বা ভালবাসলে—এতদিনই যখন—

ললিতা তবু থামলো না। বললে—সে তো বলবেই—আমার ভালবাসার দরকার কি তোমার?…কোনদিনই তুমি আমাকে দেখতে পার না—বিয়ে করাই তোমার অন্যায় হয়েছে।

ললিতার উগ্র মেজাজ দেখে ভূপেশের মেজাজও গরম হয়ে উঠলো। কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করেই রইলো সে।

ললিতা একাই বলে যেতে লাগলো—শুধু টাকার লোভে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ।—দম নিয়ে বললে—টাকা আর ছেলে-মেয়ে ছাড়া আমার কাছ থেকে আর কিছুই চাওনি তুমি।…যাকে ভালবাসতে তাকেই বিয়ে করলে না কেন?

—কাকে আবার ভালবাসতাম আমি!—ভূপেশ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে।

—একেবারে আকাশ থেকে পড়লে!

ললিতা চেপে রাখতে পারলো না ব্যাপারটা।…ভূপেশের নিজের হাতে লেখা একটি দলিল নাকি ওর হস্তগত হয়েছে। বিয়ের পরে রমলাকে ভূপেশ লিখেছিল এই চিঠিখানা। সান্ত্বনার সম্বন্ধেও দু' একটা কথা ছিল তাতে। তাই দেখেই ক্ষেপে গেছে ললিতা। এতকাল বাদে রমলার হাতবাক্স থেকে চিঠিখানা বেরিয়ে পড়বে, কে ভাবতে পেরেছিল! কিন্তু সান্ত্বনাকে সত্যিই তো ও ভালবাসতো না!

—সান্ত্বনাকে আমারও পছন্দ হয়েছিল—মুখ বেঁকিয়ে ভূপেশের কথাগুলির পুনরুক্তি করে ললিতাঃ পছন্দ হয়েছিল, বিয়ে করলেই পারতে।—একটু চুপ করে থেকে বলে—সত্যি কথা কখনো চাপা থাকে?

অন্যের বিধবা স্ত্রী সান্ত্বনা। তাকে নিয়ে এই ধরনের আলোচনা করতে ভূপেশ প্রস্তুত নয়। বিরক্ত হয়েই তাই সে বলে উঠলো—সান্ত্বনাকে এর মধ্যে টানছো কেন?

—ও, বড় যে দরদ দেখছি।—আহত অভিমানে ললিতা ফুঁসতে থাকে।

ভূপেশ অবাক হয়ে যায়। এত অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে। ললিতাকে খুশি করতে সে তো চেষ্টার ত্রুটি করেনি কোনদিন। কিন্তু কিছুতেই ওকে খুশি করতে পারলো না সে। খুশি হওয়া যেন ওর ধাতে নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ললিতাকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার সঙ্গে আমি কোনদিন অন্যায় ব্যবহার করেছি বলতে পার?

ভুরু কুঁচকে ললিতা চুপ করে রইলো। কি ভাবলো খানিকক্ষণ। তারপর আচমকা বলে উঠলো—আমার পড়াশুনা তোমার জন্যেই তো বন্ধ হয়ে গেল।—

ভূপেশের মুখে কোন কথা যোগায় না। বলবেই বা কি। বিয়ের পর অত তাড়াতাড়ি মা হওয়ার ইচ্ছে ছিল না ললিতার—।...এর জন্যে দায়ী তো ভূপেশই। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে বি. এ., এম. এ. পাস করার চেয়ে সন্তানের মা হওয়া যে অনেক বেশি গৌরবের—এ কথাটা ললিতা বোঝে না কেন? তবু ললিতার অভিযোগ শুনে মন খারাপ হয়ে যায় ভূপেশের—কেমন একটা পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করে।

ভূপেশকে নিরুত্তর দেখে ললিতার রাগ আবার যেন বেড়ে যায়। সেকেলে ঝগড়াটে মেয়েদের মতই মুখ নাড়া দিয়ে বলে—তোমার মত লোকের সঙ্গে বিয়ে না হলে আমিও বি. এ., এম. এ., পাস করতে পারতাম।...লোকে তাহলে আমাকে আর এত হেনস্তা করতে পারতো না।

বুড়ো বয়সে ললিতার হঠাৎ এমন পাস করার শখ দেখা দিল কেন?

নিরুপায় হয়ে ভূপেশ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে—ডিগ্রির কি প্রয়োজন তোমার? পেটের দায়ে তোমাকে তো আর চাকরি করতে হবে না!...লেখাপড়া করার ইচ্ছে থাকলে বাড়ীতে বসেই তো করতে পার।

কথাগুলো বলে কেমন হাঁপিয়ে পড়লো ভূপেশ। বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন মনে হল নিজেকে।

ভোরের দিকে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশটা তবু মেঘলা হয়েই আছে। সকাল থেকে সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। প্রকৃতির সাথে মানুষের মন যেন এক সুরে বাঁধা। গোমড়া মুখো আকাশটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর কেমন হুহু করে উঠলো মানসীর। কি যেন ছিল, কি যেন নেই। কারণ না থাকলেও আজকাল ওর মন এমনি হুহু করে ওঠে যখন তখন।

পরীক্ষার ফল বেরুতে এখনও অনেক দেরী। বাড়ীতে বসে থেকে দিন কাটতে চায় না। অনুপ চলে গিয়ে বাড়ীটা যেন খালি হয়ে গেছে। বলার মত একটি লোকও নেই বাড়ীতে। মায়ের সঙ্গে জন্মে ইস্তক কোনদিনও তার বনিবনা হল না।···বাবার সামনে যেতেও এখন মানসীর ভয় লাগে। দেখা হলে হয়তো আবার বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করে বসবেন।

বেলা দশটা বাজতে চললো। তবু রোদ ওঠেনি।

মেঘ বাদলার মধ্যে কোথাও বেরুনোও চলে না। কিছু ভালো লাগছিল না বলেই মানসী সেতারটা নিয়ে বসলো। গানবাজনার দিকে মন দিলে সব কিছু ভুলে থাকা যায়।

খাটের উপর বসে সেতার বাজাচ্ছিল মানসী। এমন সময়ে ললিতা উপস্থিত হলেন হঠাৎ। মানসী অমনি বাজনা বন্ধ করে দিলে। ললিতার মুখে চিন্তার মেঘ দেখে সে-ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে।

চেয়ারটা টেনে এনে মানসীর একেবারে সামনে এসে বসলেন ললিতা। গম্ভীর উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করলেন—অরবিন্দর সঙ্গে তোর শীগগির দেখা হয়েছে ?

মানসী আশ্চর্য হয়ে যায়।—কোথায় আবার দেখা হল !

—দেখা হয়েছে কিনা তাই বল্।—ললিতার গলায় ধমকের সুর।

—না।—ক্ষুব্ধ স্বরে মানসী উত্তর দিলে।

—না হলেই ভালো।—ভুরু কুঁচকে ললিতা বললেন: ওর সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখিস না—পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!—রুদ্ধ নিশ্বাসে ললিতায় কথাগুলির পুনরুক্তি করে মানসী।—একটু থেমে প্রশ্ন করে—কেন?

প্রশ্ন শুনে ললিতা চটে গেলেন। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে রাগের ভঙ্গিতে বললেন—নেমন্তন্ন করবে বলে।—বলেই গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

অরবিন্দর সম্বন্ধে সমস্ত অভিযোগ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। মানসী স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। দারুণ একটা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠে সে।…কার কাছ থেকে সঠিক খবর পাওয়া যায়!

বাণী, হ্যাঁ, ওর কাছে গেলেই হয়তো সঠিক খবরটা জানা যাবে। রবিবার, সে বাড়ীতে আছে নিশ্চয়।

আর কিছু না ভেবেই মানসী নীচে নেমে এলো। ললিতা কলঘরে স্নান করছেন, ভূপেশ বৈঠকখানায় দলিলপত্র নিয়ে ব্যস্ত—মানসীকে তিনি লক্ষ্যও করলেন না।

বাবার ঘরটাকে পাশ কাটিয়ে ল্যনে এসে পড়লো মানসী। ল্যন পেরিয়ে রাস্তায় নামলো।

হনহন করে এগিয়ে চললো সে। কঠিন একটা দায়িত্বের বোঝা যেন কাঁধে চেপেছে তার—অরবিন্দকে পুলিস খোঁজ করছে, পেলেই অ্যারেস্ট করবে। তাড়াতাড়ি সাবধান করে দেওয়া দরকার, দেরী হলে—

বাসস্টপে এসে বাস ধরলো মানসী। জগুবাবুর বাজারের সামনে বাস থেকে নেমে পড়লো।

বাসস্টপ থেকে খানিকটা হাঁটাপথ। শহরের ছায়া-ছায়া পথে একটা থমথমে ভাব।

জোরে পা চালিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাণীদের বাড়িতে পৌঁছে গেল মানসী।

বাণী তো ওকে দেখে অবাক। যে কাপড়ে ছিল তাই পরেই চলে এসেছে—তাড়াহুড়োয় চুলটা আঁচড়াতে পর্যন্ত ভুলে গেছে মানসী।

ওর মুখের দিকে একটা বিস্মিত দৃষ্টি তুলে বাণী বলে উঠলো—কি ব্যাপার!

সামান্য ইতস্ততঃ করে মায়ের কাছে শোনা খবরটা বলে ফেললো মানসী।

মানসীর কথা শুনে বাণী আশ্চর্য হয়ে যায়। বলে—পুলিস ওঁকে খুঁজছে! যারা ওদের উপর হামলা করলো তাদের না খুঁজে—

কি বলছে বাণী! অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে মানসীর।

ঘটনাটা বাণীর কাছেই শুনলো সে।...

শান্তিনগরে জোর দখলের ব্যাপার নিয়ে জমির মালিকদের সঙ্গে কিছুদিন থেকেই ওদের গোলমাল চলছিল। জমিতে লাঙ্গল দেবার সময় গোলমালটা চরমে উঠলো হঠাৎ। মাঠে ভাড়াটে গুণ্ডা এনে জমির মালিকরা নাকি ওদের উপর হামলা করেছে।

আতঙ্কে মানসীর মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাণী বললে—লাঠির আঘাতটা হাতে পড়েছিল তাই রক্ষে, মাথায় পড়লে অরবিন্দকে আর দেখতে হতো না।

অরবিন্দকে ওরা...। মানসী আর ভাবতে পারে না।

বাণী সব কথাই খুলে বললে একে একে।...

বাঁ-হাতে লাঠির আঘাত লেগে অরবিন্দ নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। চাষী ভাইদের সেবাযত্নে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল, কিন্তু হাতের যন্ত্রণা কমছিল না কিছুতেই। ডাক্তার এক্সরে করতে বললেন। বাধ্য হয়েই ওকে তাই কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে।...হাতের প্লাসটার এখনও নাকি কাটা হয়নি।

—কলকাতাতেই আছে তা হলে?

—মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় বাণী।

কিন্তু কোথায় আছে সে? ভবানীপুরে আগের ঘরটা তো অনেকদিনই ছেড়ে দিয়েছে। খানিক ইতস্ততঃ করে মানসী শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে ফেললো—ওর ঠিকানাটা—

বাণীর কাছ থেকে ঠিকানাটা লিখে নিয়েই মানসী উঠে পড়লো—দেরী করলো না।

সকালবেলায় কার মুখ দেখেই যে উঠেছিল ললিতা। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। ভোরের দিকেও ঘুম এলো না, তাই আকাশ ফর্সা হবার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে সে।

ভূপেশ বরাবর সকালেই ওঠে—না উঠলে সময়ে কুলোতে পারে না। ছুটির দিনও কি ওঁর এক মুহূর্ত বিশ্রাম আছে!

সকালে প্রাতঃরাশের পাট মিটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন বৈঠকখানায়। অবস্থাপন্ন লোক, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

ভদ্রলোককে দেখেছে বইকি ললিতা। জানলায় পরদা ঝুললেও পরদার ফাঁক দিয়েই এক নজরে দেখে নিয়েছে। কথাগুলোও স্পষ্ট কানে এসেছে।

শুনে হা হয়ে গেছে ললিতা।...

শান্তিনগরে ঐ ভদ্রলোকের জমিতেও নাকি রিফিউজী চাষীরা হালচাষ সুরু করে দিয়েছে। কিন্তু অভিযোগ তাঁর ঠিক চাষীদের বিরুদ্ধে নয়, অরবিন্দর বিরুদ্ধে। চাষীরা নাকি অরবিন্দর কথাতেই ওঠে-বসে। চাষীদের সে-ই তো উসকে দিয়ে লড়াইটা বাধালো। মাঠে নাকি রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটে গেছে। তারপরেই গা ঢাকা দিয়েছে অরবিন্দ। পুলিশ ওকে খুঁজে পাচ্ছে না।

ভদ্রলোক চলে যেতে না যেতেই মুহুরীবাবু এসে বসে গেলেন হিসাবপত্র নিয়ে। ভূপেশের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেল না ললিতা।

পুলিশের নাম শুনেই ভয় ধরে গেছল। মেয়েকে আগে থেকে সাবধান করে দেবার জন্যে সে তাই ছুটে গেছল দোতলায়—মানসীর ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

কিন্তু মেয়ে গ্রাহ্যই করলো না ললিতাকে। অরবিন্দর বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই যেন ওর মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। আজ বাদে কাল বিয়ে হয়ে যাবে, ও ছোকরার উপর এত টানই বা কিসের জন্যে? ···মানসীর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল ললিতা।

বিরক্ত হয়েই সে মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা একতলায় নেমে এলো। ভূপেশের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে হয়তো মনটা শান্ত হতো। কিন্তু তার কি উপায় আছে! মুহুরীবাবু ঠায় বসে আছেন, নড়বার নাম নেই। ভূপেশও একগাদা নথিপত্র নিয়ে বসেছে। থাক, ঐ নথিপত্র নিয়েই থাক। স্নান সেরেই ললিতা তার ছোড়দার ওখানে চলে যাবে—সারাদিন সেখানেই থাকবে আজ। বাড়ীতে থাকলেই ওর যত জ্বালা।

স্নানের পর ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, এমন সময়ে মোক্ষদা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো। কাঁদ-কাঁদ গলায় বললে —দিদিমণি দুধ না খেয়েই বেরিয়ে গেলেন মা।

—কোথায় গেল?—বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে ললিতা।

—সে আমি জানবো কি করে?—একটু থেমে তেমনি কান্নার ভাবে বললে—দুধটা খেয়ে যেতে বলেছিলাম—

—যা, আর বকবক করিস না।—রাগটা মোক্ষদার উপরই ঝাড়লো ললিতা।

মোক্ষদা চলে গেল। ললিতার রাগ দেখলে সে আর দাঁড়ায় না ওর সামনে।

কিন্তু এই সাত-সকালে মেয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল কেন? বেশ তো বসে আপন মনে সেতার বাজাচ্ছিল। ললিতা মরতে কেন যে বলতে গেল কথাগুলো।

ছোড়দার বাড়ীতে যাবার সঙ্কল্প ললিতাকে ত্যাগ করতে হল তখনকার মত। মানসী ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও যাওয়া চলে না তার।

রাগের মাথায় ললিতা নীচে নেমে এল। ভূপেশের বৈঠকখানায় ইতিমধ্যে আরো জনকতক ভদ্রলোক এসে আসর জমিয়েছেন। ললিতার এখন সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই। কতক্ষণে আসর ভাঙ্গবে কে জানে! রবিবার, আপিস-কাছারির তাড়া নেই কারুর।

কি হবে নীচে বসে থেকে? ললিতা দোতলায় উঠে এল আবার—মানসীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

টেবিলের উপর বইপত্র নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো সে—অস্বস্তিকর কেমন একটা সন্দেহ মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল তার। টেবিলের উপরেই পড়ে আছে মানসীর স্যুটকেসের চাবি। স্যুটকেসটা একবার খুলে দেখতে দোষ কি!

দ্বিতীয়বার চিন্তা না করেই স্যুটকেসটা খুলে ফেললো ললিতা।

একটার পর একটা জিনিস উলটে পালটে দেখতে লাগলো সে। কাগজের একটা বাণ্ডিল নজরে পড়তেই সেটাকে টেনে বের করলো। কি এটা? বাণ্ডিলটা খুলে ফেললো ললিতা। বক্তৃতার কাটিং—অরবিন্দর। কি যত্ন করেই না ফুলস্ক্যাপ কাগজের উপর এঁটে রেখেছে! কাগজগুলো নাড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো অরবিন্দর একটা ছবি—মিটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছে। খবরের কাগজ থেকে মানসী নিশ্চয় কেটে রেখেছে এই ছবিটা। গ্রুপফটো হলেও অরবিন্দকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হয় না।

রাগে গা-জ্বলে উঠলো ললিতার। যত সব ছাই-ভস্ম বাক্সে জমা করে রেখেছে। ইচ্ছা হয়েছিল, তখুনি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে। কিন্তু ছিঁড়লো না সে। বাণ্ডিলটা নিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো আবার। ভূপেশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে তার মেয়ের কীর্তি।

কিন্তু বৈঠকখানায় তখন জোর আলোচনা চলেছে। রাজনৈতিক আলোচনা। দেশের ভাগ্য নিয়ন্তাদের নিজের ছেলে-মেয়ের কথা ভাববার সময় কোথায়! ইচ্ছে থাকলেও ভূপেশের ঘরে ঢুকতে পারলো না ললিতা।

বারান্দায় বসেই ওদের আলোচনা শুনতে লাগলো। উঃ, কি বকতেই না পারে লোকগুলো! ললিতা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল, সুবোধ এসে পড়ায় যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।—এই যে এসো।

সুবোধকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকলো ললিতা।

ঘরে ঢুকে সুবোধ বলার আগেই সোফায় বসে পড়লো। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। মানসীকেই খুঁজছিল সে। ওকে একবার দেখতে পেলেও যেন সে খুশি!

ললিতা লজ্জিত হয়ে পড়লো। কলেজ নেই—তবু মানসী সকালেই বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে! সুবোধ হঠাৎ যদি জিজ্ঞেস করে ওর কথা? কি বলবে সে?

ললিতা আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—তুমি বোস, আমি চা নিয়ে আসছি!

ললিতা রান্নাঘরে এসে ঢুকলো। ভাবী জামাই, ওকে কি আর শুধু চা দেওয়া যায়! আর কিছু না হক, ফল, মিষ্টি, কিছুটা সঙ্গে রাখতেই হবে।

নিজের হাতে ললিতা সুবোধের জন্যে খাবার সাজাতে বসলো।

মিনিট কয়েক বাদে চা-জলখাবার নিয়ে সে যখন ওর সামনে উপস্থিত হল, সুবোধকে দেখে ওর চক্ষুস্থির।

মুখে যেন আষাঢ়ের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে সুবোধের। রাগে-ক্ষোভে চোখ দুটো চকচক করছে।

চা-খাবার টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতে গিয়েই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কাগজের সেই বাণ্ডিলটা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে টেবিলের উপর। তাড়াতাড়িতে ওটা ফেলেই রান্নাঘরে চলে

গিয়েছিল ললিতা। খবরের কাগজ মনে করেই সুবোধ হয়তো খুলেছিল বাণ্ডিলটা।

সংশোধনের আর পথ ছিল না। ললিতা হতাশভাবে সোফায় বসে পড়লো।

চায়ের কাপ সুবোধ নিজেই হাতে তুলে নিলে। ললিতাকে লক্ষ্য করে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে—এ কাগজগুলো কোথায় পেলেন?

ললিতা হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে গেল। কি উত্তর দেবে? যা মুখে এলো তাই বলে ফেললো—ঐ অরবিন্দ ছোকরার কাণ্ড, সেই ফেলে গেছে নিশ্চয়।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুবোধ নিজের মনে হাসলো একটু। কথাটা কি বিশ্বাস করে নি সে?

বাণীদের বাড়ী থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা হইহই করে উঠলেন—না বলে-কয়ে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

মানসী দাঁড়ালো না মায়ের সামনে। সোজা দোতলায় উঠে এলো। তর্ক করার মত মনের অবস্থা ছিল না তার।

অরবিন্দকে দেখতে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে মনের মধ্যে চেপে রেখেই সে বাড়ীতে ফিরে এসেছে। ঠিকানা তো বাণীর কাছ থেকেই জেনে নিয়েছিল সে। কিন্তু জায়গাটার যা বর্ণনা দিলে তাতে ওর আস্তানা খুঁজে বের করা শক্ত মানসীর পক্ষে। আর দূরত্ব তো কম নয়। গিয়ে ফিরে আসতে অনেক বেলা হয়ে যেত। মানসীর মা ততক্ষণে বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসতেন।···বিকেলের দিকেই যাওয়া যাবে—মা তখন হয়ত বাড়িতে থাকবেন না। সাত-পাঁচ ভেবেই সে অরবিন্দর ওখানে না গিয়ে চলে এসেছে। এসেও শান্তি নেই।

নিজের ঘরে ঢুকে মানসী টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে পড়লো—বড় ক্লান্ত লাগছিল।

টেবিলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বিস্ময়ে চমকে উঠলো সে। বই,

খাতাপত্র সব কে যেন নাড়াচাড়া করেছে! পড়ার টেবিল মানসী নিজের হাতে গুছিয়ে রাখে, একটু এদিক ওদিক হলেই সে টের পেয়ে যায়।···টেবিলের উপর স্যুটকেসের চাবিটা ছিল, সেটাই বা গেল কোথায়?

স্যুটকেসের গায়ে চাবিটা! স্যুটকেসে লাগিয়েই মানসী বেরিয়ে গেছে? এমন ভুল তো ওর হয় না কখনো।···আর স্যুটকেস সে খুললোই বা কখন?

চেয়ার থেকে উঠে মানসী স্যুটকেসটা খুলে ফেললো। রুদ্ধশ্বাসে খুঁজতে লাগলো—

যে ভয় করেছিল সে! কাগজের সেই বাণ্ডিলটা কে যেন চুরি করেছে! কে আবার করবে, মানসীর মা ছাড়া?·· অরবিন্দর একটা ছবিও ছিল—মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে! খবরের কাগজ থেকে ছবিটা কেটে সাদা একখানা খামের মধ্যে রেখে দিয়েছিল মানসী।

তন্নতন্ন করে খুঁজেও যখন জিনিসটা পাওয়া গেল না, রাগে-দুঃখে মানসীর তখন চোখে জল এসে পড়লো। আর সেই মুহূর্তেই ললিতা এসে সামনে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই চোখের জল শুকিয়ে গেল।

মানসীকে লক্ষ্য করে ললিতা রুক্ষ গলায় বলে উঠলেন—খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না? না-কি স্যুটকেস নিয়ে বসে থাকলেই চলবে?

মানসীও রেগে গেল। স্থির দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আমার স্যুটকেসে তুমি কেন হাত দিয়েছ?

—দেবার দরকার মনে করেছি।

—আমার জিনিসগুলো কি করেছ?

—পুড়িয়ে ফেলেছি।

—পুড়িয়ে ফেলেছ?—আতঙ্কিত মানুষের মতই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো মানসী।

মানসীর মুখের উপর একটা জ্বালাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ললিতা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মানসী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। কান পেতে শুনতে লাগলো ললিতার বিলীয়মান চটির শব্দ।···অন্যদিনের তুলনায় অনেক বেশি আওয়াজ করে যেন তিনি নীচে নেমে গেলেন।

খোলা স্যুটকেসটার দিকে তাকাতেই হঠাৎ কেমন কান্না পেয়ে গেল মানসীর। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে—মহামূল্য একটা রত্ন যেন হারিয়ে গেছে তার।

স্নান-খাওয়া কিছুই করলো না সে। দরজা বন্ধ করে বিছানায় পড়ে রইলো। অসহ্য অভিমানে অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল তার—মা কেন নষ্ট করে ফেললেন ঐ ছবিটা—

অরবিন্দর ঐ ছবিটা মানসী এতদিন কিন্তু খুলেও দেখেনি। দেখলে মন আরো খারাপ হয়ে যাবে, এই ভয়ে। বক্তৃতার কাটিংগুলোও তেমনি তাড়া বাঁধা পড়েছিল। অকেজো ঐ কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলতেও মায়া হয়েছে।

মানসী সত্যি সৃষ্টিছাড়া। যাঁর সঙ্গে জীবনে সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেছে, তাঁর স্মৃতির বোঝা এমন করে বয়ে বেড়ানো কেন? ছিঁড়তে গিয়েও মানসী ছিঁড়তে পারে নি কাগজগুলো······আর ললিতা নির্বিকার চিত্তে সব পুড়িয়ে ফেললেন—ছবিখানা পর্যন্ত!

সারাটা দুপুর বিছানায় পড়ে রইল মানসী!

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল।

মানসী বিছানার উপর উঠে বসলো।

এখন তৈরী হয়ে নেওয়া যাক, মা-ও হয়ত এখন বেরিয়ে যাবেন।

দরজায় কে যেন ধাক্কা দিলে। কে আবার এল জ্বালাতন করতে?

আরো জোরে একটা শব্দ হতে মানসী উঠে খুলে দিলে দরজাটা। ললিতা!

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন তিনি। মানসীর দিকে তাকিয়ে

স্থির গম্ভীর গলায় বললেন—যা, হাত মুখ ধুয়ে নে। সুবোধ কখন থেকে এসে বসে আছে।

থাক গে বসে। সুবোধের নামটা শুনেই রাগ ধরে গেল মানসীর।

—তোর সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।—উৎকণ্ঠিত মুখে ললিতা বললেন—সামনের সপ্তাহেই নাকি য়ুরোপ যাচ্ছে।

যাচ্ছে যাক। মানসী বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়লো আবার। বললে—বড্ড মাথা ধরেছে, আমাকে বিরক্ত কোর না।

মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে ললিতা কি যেন ভাবলেন একটু। রাগটা নরম হয়ে এলো যেন। চিন্তিত মুখে বললেন—মাথা ধরেছে ? আমি গিয়ে না হয় তাই বলছি।—ললিতা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেলেন।

মায়ের কাছে মিথ্যে বলে নি মানসী। মাথাটা সত্যিই ধরেছে তার। মানসী চুপচাপ শুয়ে রইলো কিছুক্ষণ। না, আর দেরী করা চলে না। এখন না বেরুলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।……সুবোধ এতক্ষণে নিশ্চয়ই চলে গেছে।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো মানসী—জামা-কাপড় বদলে নীচে নেমে এলো।

ড্রয়িং-রুমের কাছে এসেই পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল তার। সুবোধের গলা নয় ? এখনও যায় নি। মায়ের সঙ্গে কথা বলছে।

অরবিন্দর নামটা শুনেই মানসী উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।—আপনি কিছু ভাববেন না—অরবিন্দর ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে আমি দেখে নেব।

—তুমি কোন গোলমালের মধ্যে যেও না।—ললিতার গলায় উদ্বেগের স্বর।

—আমার যাবার দরকার কি !—বাহাদুরির ভাবে একটু হাসলো সুবোধ : এমন ব্যবস্থা করেছি—

ললিতার তবু ভয় গেল না। বললেন—কিন্তু এত সব হাঙ্গামার

মধ্যে না গেলেই ভালো করতে—কয়েক বিঘে জমির জন্যে শেষকালে—

সুবোধ ললিতাকে কথা শেষ করতে দিলে না। বললে—শুধু তো জমি নয়, ওদের সায়েস্তা করতে না পারলে কারখানা চালানোও সম্ভব হবে না।—একটু থেমে বললে : ওদের আপনি চেনেন না, সাংঘাতিক লোক।···আজ জমি দখল করতে দিলে, কালই ওরা কারখানা ধরে টান দেবে।

ললিতা হয়তো বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আবার বলে উঠলেন—আশ্চর্য সাহস!

—হ্যাঁ, সাহসের ওদের অভাব নেই।—সুবোধ হাসতে হাসতে মন্তব্য করলো। হাসি থামিয়ে গলার স্বর কিছুটা খাদে নামিয়ে বললে—সব থেকে মুশকিল কি জানেন? টাকায় ওরা বশ হয় না।·· অরবিন্দর চেলাদের আমি মোটা টাকার প্রলোভন দেখাতেও কসুর করিনি।

খানিকটা নীরবতা।

ভয়ার্ত স্বরে ললিতা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—শান্তিনগরে তাহলে কি সত্যিই লড়াই সুরু হয়েছে?

—লড়াইয়ের ঠেলা বুঝছে এখন।—সুবোধ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো। একটু চুপ করে থেকে বললে—অরবিন্দকে ধরে আচ্ছা ঠেঙানি দেওয়া হয়েছে—শীগগির আর গোলমাল করার সাহস হবে না।

উঃ, কি সাংঘাতিক কথা!

মানসীর বুক টিপটিপ করতে লাগলো। দোতলায় ছুটে পালিয়ে এলো সে। নিজের ঘরে ঢুকেই দরজায় খিল এঁটে দিলে।

চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগলো সে। সুবোধ, সুবোধই তাহলে ওঁকে—

দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরলো মানসী। এই লোকের সঙ্গেই মা—

রাগে, ক্ষোভে চোখ ফেটে জল এলো মানসীর।

বাড়ী ফিরতে রাত প্রায় দশটা বাজলো।

বিকেল বেলায় ভূপেশকে আজ একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেছল ললিতা। নিজের এবং মেয়ের জন্যে কিছু জামা-কাপড় কিনবে। মেয়েদের জামা-কাপড় মেয়েরাই ভাল বোঝে, ভূপেশের যাবার প্রয়োজন কি? ললিতা তা মানতে চায় না,—ভূপেশকেও যেতে হবে সঙ্গে।

জেদটা ওর বরাবর একটু বেশী। ইদানীং সেটা যেন আরো বেড়ে উঠেছে। অমতে কিছু করলে আর রক্ষে নেই।

আসার পথে গাড়ী থামিয়ে ওর বড়দা-বড়বৌদির সঙ্গে দেখা করে এলো। বড়দার বাড়ীতে না গেলে অবিশ্যি অনেক আগেই ফিরতে পারতো।

একটানা এতখানি পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ললিতা। শরীরে মেদও জমেছে কম নয়। এই বয়সে মেয়েরা অবশ্য একটু মোটা হয়েই থাকে।

দোতলায় উঠবার আগেই কপালের ঘাম মুছে সে বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—দিদিমণিকে খেতে দিয়েছিস তো?

বেয়ারা কোন কথা বললে না—ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

—অমন হাঁ করে তাকিয়ে রইলি যে!

—দিদিমণি তো বাড়ী নেই!

—বাড়ী নেই!—ললিতা আঁতকে উঠলো।

—কোথাও তো দেখতে পেলুম না।—কাঁচুমাচু মুখে বেয়ারা বললে।

—সে কি! এত রাতেও বাড়ী ফেরেনি!—ভূপেশও চিন্তিত হয়ে পড়লো। রাগও হলো। সন্ধ্যের পর মানসীকে একলা বেরুতে অনেকদিন নিষেধ করেছে সে, কোথাও যাবার ইচ্ছে হলে কাউকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই তো হয়, বাড়ীতে ঝি-চাকরের তো অভাব নেই।… বেয়ারাকেও তো নিয়ে যেতে পারতো।

ললিতার সঙ্গে ভূপেশও দোতলায় উঠে এলো। মানসীর ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। অন্ধকারে শূন্য ঘর যেন হাহাকার করছে।

ঘরে ঢুকে সুইচ্ টিপে আলোটা জ্বালিয়ে দিলে ললিতা। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো—বারান্দা-ছাদ অবধি ঘুরে এলো। কিন্তু কোথায় মানসী।

রাত এগারটা বেজে গেলেও মানসী ফিরে এল না। ললিতা অস্থির হয়ে উঠলো। ভূপেশের মুখের দিকে একটা অসহায়ের দৃষ্টি মেলে বললে—এখন কি উপায় করা যায় বল তো?

ভূপেশ কিছুই বললে না। সোজা নীচে নেমে এলো। সঙ্গে ললিতাও। ঠাকুর, ঝি, চাকর সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো ভূপেশ। কিন্তু মানসী কখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে কেউ বলতে পারলো না। লোকগুলো কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল? ভজুয়া সদর দরজার পাশেই থাকে—অনেক জেরা করেও তার কাছ থেকে কোন খবর আদায় করা গেল না।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে ভূপেশ হতাশ হয়ে বসে পড়লো।

ললিতা তার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলো। ঐভাবে বসে থাকতে দেখে সে চটে উঠলো—মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলেই চলবে?

মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে চলবে না, এ ভূপেশও জানে। খদ্দরের চাদরখানা গায়ের উপর ফেলে তখুনি বেরিয়ে পড়লো সে—গাড়ী নিয়ে।

কাছে-পিঠে যে সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব, সব জায়গায় খোঁজ করলো। কিন্তু মানসীর দেখা পাওয়া গেল না। ওর মামাদের বাড়ীতে গিয়েও ঘুরে এলো ভূপেশ, কিন্তু লাভ হলো না।

কোথায় যেতে পারে! বাড়ী ফিরে পর পর অনেকগুলো টেলিফোন করলো ভূপেশ—আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অর্ধপরিচিত লোকের বাড়ীতে। না, মানসী ওদের কারো বাড়ীতে যায় নি।

কোনো অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ করে নি তো ?···হাসপাতালে টেলিফোন করেও ভূপেশ কোনো খবর পেল না।

উৎকণ্ঠায় আর ললিতার কান্নায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সে।

ঘড়িতে বারটা বাজলো, তবু মানসী ফিরে এল না।

ললিতার কান্না আরো বেড়ে গেল। বিছানায় উপুড় হয়ে সে ফোঁপাতে সুরু করলো।

ভূপেশ আর স্থির থাকতে পারলো না।

গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো আবার। সেই ছোকরাটার ওখানে যায় নি তো ? অসম্ভব নয়, আজকালকার ছেলে-মেয়ের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

শান্তিনগরে অবিনাশের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ করলো ভূপেশ। না, তাঁরাও কোন খবর দিতে পারলো না। অরবিন্দর কথা জিজ্ঞেস করলে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলো না। বললে—সে তো অনেক দিন আগেই চলে গেছে এখান থেকে।

অরবিন্দর ঠিকানাটা পর্যন্ত জানে না তারা। ছুটোছুটিই সার হলো শেষ পর্যন্ত।

ক্লান্ত হয়ে ভূপেশ যখন বাড়ী ফিরলো, রাত্রির অন্ধকার তখন পাতলা হয়ে এসেছে।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে সোফায় বসে পড়লো ভূপেশ। অবসন্ন মন, অবসন্ন দেহ। এত অবসন্ন যে উপরে গিয়ে জামা-কাপড়টা পর্যন্ত বদলাতে ইচ্ছে করলো না। চোখের সমস্ত আলো যেন নিবে গেছে তার—খেয়ালের বশে কে যেন বাড়ীর মেইন্‌ সুইচ্‌ অফ্‌ করে দিয়ে গেছে।·······

ললিতা ঘরে ঢুকতেই সম্বিৎ ফিরে এলো।

সোফায় বসে একখানি চিঠি সে এগিয়ে দিলে ভূপেশের হাতে। মানসীর বালিসের-তলা থেকে চিঠিখানি সে আবিষ্কার করেছে খানিক আগে। চিঠিটা ভূপেশকেই লেখা। লিখেছে ঃ বাবা, তোমাদের ছেড়ে

চলে যাচ্ছি। তোমরা দুঃখ পাবে জানি, কিন্তু এছাড়া আমার আর কিছু করার উপায় ছিল না। ক্ষমা করতে চেষ্টা কোর।—মানসী

এই রকম একটা কিছু হবে, ভূপেশ আগেই আশঙ্কা করেছিল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বিমূঢ়ের মত বসে ছিলো ভূপেশ, ললিতার কথায় চমক ভাঙ্গলো।—কি তেজ মেয়ের—গায়েব গয়নাগুলো সব খুলে রেখে গেছে!—

ভূপেশ কোন উত্তর দিলে না। তেমনি নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো।

খানিকপরে ললিতা হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠলো, ভূপেশকে লক্ষ্য করে।—তুমিই দায়ী এর জন্যে, আমার কথামত তখনই যদি—

অসহায় চোখে ভূপেশ তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর মুখের দিকে।

রাগের ভঙ্গীতে ললিতা উঠে বেরিয়ে যায়।

ভূপেশ বসেই থাকে চুপচাপ। জানালা দিয়ে রাত্রি শেষের ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, ভূপেশই দায়ী, সব অপরাধ ভূপেশের, সংসারে সবার কাছেই অপরাধী সে।

ড্রয়িংরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে সুবোধ আর ললিতার আলোচনা শোনার পর রাত্রে সেদিন একেবারেই ঘুমোতো পারে নি মানসী— উত্তেজনায় ছটফট করেছে।

শেষ পর্যন্ত মন স্থির করে ফেললো মানসী। ভোর হতে না হতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল সে।

অত ভোরে ওকে উঠতে দেখে ললিতা তো অবাক।—আজ কোন দিকে সূর্য উঠলো?

মানসী জবাব দেয় নি মায়ের কথার। সোজা স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। স্নান সেরে তবে কলঘর থেকে বেরুলো, মাথাটা যেন আগুন হয়েছিলো তার।

চা ততক্ষণে তৈরী হয়ে গেছে। মা ডাক দিতেই চায়ের টেবিলে গিয়ে বসলো। চায়ের সঙ্গে দুধ, মিষ্টি যা দিলেন, সবটাই খেয়ে নিলে

সে, কোন আপত্তি করে নি। না, মায়ের কোন কথায় আজ সে অবাধ্য হবে না।

ওকে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে দেখে ললিতার দুশ্চিন্তা কেটে গেছল। সারা দুপুর না ঘুমিয়ে তিনি মানসীর ব্লাউজের হাতায় জরির ফুল তুলেছেন। মানসীর ঘরে এসে পর্যন্ত দেখিয়ে গেলেন ব্লাউজটা—দেখ তো, ডিজাইনটা ভালো হয়নি ?

—ভালো।—আবছা গলায় উত্তর দিয়েছিল মানসী। সত্যি কথা বলতে কি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন মায়া লাগলো যেন।

বিকেলে বাবার সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেলেন গাড়ী করে। কোথায় গেলেন কে জানে!

ওঁরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসীও বেরিয়ে পড়লো, আর দেরী করলো না।

ট্রাম-স্টপে এসে টালিগঞ্জের ট্রাম ধরলো। শেষ স্টপে নেমে পড়লো ট্রাম থেকে।

ঠিকানা জানলেও বাড়ী খুঁজে পাওয়া কি সহজ কথা! অপরিচিত গ্রাম্য পরিবেশ। এদিকটায় আগে কখনো আসে নি মানসী। গন্তব্য স্থলে পৌঁছবার আগেই সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এলো। মানসীর ভয়-ভয় করছিল, কিন্তু যেতে যখন হবেই, ভয় পেলে চলবে কেন!

সাহসে ভর করে এগিয়ে চললো সে। জোরে পা চালালো।

হলদে রঙের একখানি বাড়ীর সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো মানসী—নম্বরটা মিলিয়ে দেখলো। হ্যাঁ, এই বাড়ীই।

সামনেই একফালি বারান্দা। বারান্দায় উঠে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অরবিন্দর সঙ্গে দেখা, দরজাটা খোলাই ছিলো।

অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করেই মানসী গিয়ে ঘরে ঢুকলো। বাড়ীটায় ইলেকট্রিক্ আলো নেই।

তক্তাপোশের উপর হ্যারিকেনের সামনে বসে অরবিন্দ বই পড়ছিল।

হাতের প্লাস্টার্ কেটে দেওয়া হয়েছে। দিব্যি সুস্থ-সবল মানুষ, দেখলে কে বলবে যে দুদিন আগে অত বড় একটা—

মানসীকে দেখে বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল অরবিন্দ—তুমি!

ঘরে চেয়ার নেই। তক্তাপোশের কোণে গিয়েই বসে পড়লো মানসী। স্থির চোখে অরবিন্দর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে—না এসে থাকতে পারলাম কৈ?

অরবিন্দ অবাক হয়ে কি যেন ভাবলো একটু। তারপর বললে—এতদিন বাদে হঠাৎ মনে পড়লো? —অভিমানের সুর অরবিন্দর গলায়। খানিকবাদেই দৃষ্টিটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। হেসে বললে—বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছ?

মানসী কোন উত্তর দিলে না। দাঁতে ঠোঁট চেপে মুখ নীচু করে রইলো। কান্না কিছুতেই সামলাতে পারলো না সে। চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

অরবিন্দ বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো ওর কান্না দেখে। বিপন্নমুখে বললে—কি ছেলেমানুষি করছো! কেউ এসে পড়লে কি ভাববে!

মানসী চোখের জল মুছে ফেললো।

আরো কিছুক্ষণ নীরব অস্বস্তির মধ্যে রেখে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলে—রাত হয়ে গেল, একলা যেতে পারবে?

মানসী এতক্ষণে চোখ তুলে তাকালো সোজা অরবিন্দর মুখের দিকে। বললে—না, বাড়ীতে আমি আর ফিরে যাবো না।

—বাড়ী যাবে না, থাকবে কোথায়?—উৎকণ্ঠায় অরবিন্দ যেন হাঁপিয়ে উঠলো।

—তোমার কাছে।

—আমার কাছে!—অরবিন্দ যেন বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা।

অভিমানের ভাবেই মানসী বলে—থাকতে না দেও, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো, তবু বাড়ীতে আমি আর ফিরে যাবো না।

বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গেল অরবিন্দর। নিমেষ-হারা চোখে মানসীর দিকে তাকিয়ে বললে—সত্যি বলছো? আমার কাছে থাকবে? থাকতে পারবে? কষ্ট হবে না।

অরবিন্দর চোখে চোখ রেখে মানসী বললে—ভয় নেই, রাজকন্যার বেশ তো আমি ছেড়েই এসেছি।—

বিস্ময়ে-আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিল অরবিন্দ। কোন কথা না বলে মানসীকে বুকে টেনে নিলে সে।

আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত। বড় বিষণ্ন, বড় নিঃসঙ্গ এ প্রভাত।

কাল বিকেলে ললিতা রাগ করে তার ছোড়দার বাড়ীতে চলে গেছে। রাগটা তার ভূপেশের উপরই। ভূপেশ আশকারা না দিলে মানসী নাকি কখনই এতটা সাহস পেত না।···

ললিতা চলে যাবার পর ভূপেশ আর উপরে ওঠেনি। দোতলার ঘরের দিকে সে তাকাতে পারে না।

ড্রয়িংরুমে সোফাতেই শুয়েছিলো সারা রাত। ভালো ঘুম হয় নি, হিজিবিজি স্বপ্ন দেখেছে।

সকালেও তাই উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। চোখ বুজেছিলো। বারীন এসে ডেকে তুললো—এখনও শুয়ে আছ!

বারীন ফুরসত পেলেই এখন ওর কাছে চলে আসে।

বিয়ের খবরটা বারীনই দিলে ওকে।···

মানসীর নাকি বিয়ে হয়ে গেছে—অরবিন্দর সঙ্গে। রেজিস্টার্ড ম্যারেজ। খবরটা নিজের মেয়ের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছে বারীন।

গুম হয়ে বসে ছিলো ভূপেশ।

বারীন বললে—এবার তো নিশ্চিন্ত হলে!

আশ্চর্য মানুষ!···ভূপেশ চটে গেল বারীনের উপর। বললে—তুমি বলছো কি? নিশ্চিন্ত হবো আমি!···এমন বিয়ের চেয়ে মৃত্যুও যে—

কথাটা শুনেই মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে উঠলো বারীনের।

স্ত্রীর গলায় বললে—মৃত্যুর চেয়ে কোন দুঃখই বড় নয় ভূপেশ।—
একটু চুপ করে থেকে বললেঃ স্নেহের চেয়ে দম্ভটাই আজ বড় হয়ে উঠেছে তোমার কাছে।

রাগ হলেও ভূপেশ কোন উত্তর দিলে না।

কড়া কথা বলে ফেলে বারীন কি লজ্জিত হয়ে পড়লো? দেশলাই-য়ের বাক্সে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে কতকটা যেন নিজের মনেই বলে গেল—বাপ-মায়ের পছন্দ এখন আর ছেলে-মেয়েদের পছন্দ হয় না।... একেই বলে যুগধর্ম—যুগধর্মকে না মেনে উপায় কি!

ভূপেশ তেমনি নির্বাক হয়ে রইলো।

নিজের মনে বারীন খানিকক্ষণ সিগারেট টেনে চললো। সিগারেটের শেষ অংশটুকু ছাইয়ের পাত্রে গুঁজে উঠে পড়লো একসময়। চলি, বিকালে আসবোখন।—বলেই বেরিয়ে গেল।

ভূপেশ একলা বসে রইল।

মিল-মালিক সুবোধ চৌধুরীর টাকা খেয়েই শান্তিনগরে গুণ্ডারা অরবিন্দর উপর হামলা করেছে—খবরটা শুনে বাণী আশ্চর্য হলেও বারীন কিন্তু একটুও আশ্চর্য হয়নি। মালিকের জাত কাজ হাসিল করার জন্যে চিরদিনই গুণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে থাকে।

মানসী অবশ্য কতকটা দায়ী এর জন্যে। সুবোধের 'মিড্‌ল্‌ স্টাম্প্‌' সে-ই ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু পরাজয় মেনে নেওয়ার মত উদারতা নেই সুবোধের চরিত্রে। মানসীকে হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছিল সে—বাধা পেয়ে সেই কামনা আরো উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। অরণ্য-মনের বিশেষত্বই যে এই।

এই লোকের হাতেই মেয়েকে সম্প্রদান করতে যাচ্ছিল ভূপেশ!

ভূপেশের মুখের দিকে তাকালে এখন সত্যি দুঃখ হয় বারীনের।... রাগ করে স্ত্রীও নাকি ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে বসে আছেন। রাগের আর সময় পেলেন না মহিলা।

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরেই ভূপেশকে দেখতে গিয়েছিল বারীন।
ইজি চেয়ারে শুয়ে বিমর্ষ মুখে কি যেন চিন্তা করছিল ভূপেশ।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বারীন বললে—নিজেকে এভাবে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?—সামান্য ইতস্ততঃ করে বললে: মানসীকে একবার আসতে লিখে দাও।

ভূপেশ উঠে বসলো উত্তেজিত হয়ে। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললে—না, না, কাউকে আসতে হবে না, কাউকে চাই না আমি।

বারীন ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল—শত হলেও তোমার মেয়ে—

বারীনকে কথা শেষ করতে দিলে না ভূপেশ। অন্ধ আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বললে—না, না, কেউ আমার মেয়ে নয়। ছেলে, মেয়ে, বউ কেউ নেই আমার। সব—সব মরে গেছে—

কোন উত্তর না দিয়েই বারীন বেরিয়ে এল ভূপেশের ঘর থেকে। বারীন কাছে থাকলে ওর উত্তেজনা বাড়বে বই কমবে না।

সন্ধ্যার আগেই বাড়ীতে ফিরে এসেছে বারীন। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'টিতে এসে ঢুকলো ঘরে—মানসী আর অরবিন্দ।

বাণী ওদের দুজনকে চায়ে নেমন্তন্ন করেছে।

অরবিন্দ সোজা চলে গেল বাণীর ঘরের দিকে। মানসী একলাই এসে বসলো বারীনের কাছে।

মানসীকে দেখে অবাক হয়ে গেল বারীন। বাপের আদুরে মেয়ে মানসী—হঠাৎ যেন অনেকখানি বড় হয়ে উঠেছে।

গায়ে অলঙ্কারের চিহ্নও নেই। ফুটফুটে নিটোল হাতে শুধু দুটি লাল রঙের প্লাস্টিকের চুড়ি। কানের সুন্দর গড়নটুকু আজ আর কানফুলে ঢাকা পড়ে নি। গলা থেকে সোনার হার গাছিও খুলে ফেলেছে। পরনের শাড়ীখানি অতি সাধারণ, সাদা খোলের সুতোর

শাড়ী। সাধারণ পোশাকেই যেন ওকে মানিয়েছে ভালো। আগের থেকে অনেক সুন্দর লাগছিল দেখতে।

—বাবার কাছে যাবে না?—বারীন জিজ্ঞেস করলো।

শান্ত-গম্ভীর গলায় মানসী উত্তর দিলে—কি করে যাই বলুন! বাবা যে ওঁকে—

কথাগুলো বলতে গিয়ে চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো মানসীর।

বারীন কোন উত্তর খুঁজে পেল না, চুপ করে রইলো।

মানসীকে ডেকে নিয়ে গেল বাণী—পাশের ঘরে। বাড়ী যাবার আগে বারীনকে প্রণাম করে মানসী বললে—আপনি আমাদের আশীর্বাদ করবেন তো কাকাবাবু?

মানসীর মাথায় হাত রেখে বারীন একটু হাসলো শুধু। মনে মনে সে অনেক আগেই যে ওদের আশীর্বাদ করেছে!

দু'জনে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। তাদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো বারীন। চৌকাঠ, বারান্দা, রাস্তা পেরিয়ে দৃষ্টিটা মেলে দিলে সুদূর এক দিগন্তের দিকে। দল বেঁধে কারা যেন এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য তাদের স্থির, পদক্ষেপ অবিচলিত।

বারীন কান পেতে শোনে তাদের গর্বিত পদধ্বনি।